وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

" কেবলমাত্র আল্লাহ্র (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যেই মানুষের উপর আল্লাহ্র ঘরে হজ্জ সম্পাদন।"– আল-কোরআন (৩ঃ৯৭)

হাজ্জু বাইতিল্লাহ্–যিয়ারাতু রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

কুতুবুল এরশাদ, মুজাদ্দেদে জামান, মোহাম্মদীয়া তরীকার ইমাম

আলহাজ্জ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান এম.এ. (রাঃ)

পীরে কামেল-মোকাম্মেল, অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল

(পীর সাহেব ভোলা) এর খলিফা

আলহাজ্জ মাওলানা নুর মোহাম্মদ

এম.এম., বি.এ. (অনার্স), এম.এ. কর্তৃক প্রণীত

নুর মঞ্জিল

খানকা শরীফ রোড, হাবিব নগর

কদমতলী, ঢাকা-১৩৬২।

প্রকাশিকা ঃ
আলহাজ্জা রওশন-আরা আঁখি
নুর মঞ্জিল
হাবিব নগর, ঢাকা।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
প্রকাশিকা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ ঃ
রজযান ২৭, ১৮৩২ হিজরী
ভাদ্র ১৩, ১৪১৮ বাংলা
আগস্ট ২৮, ২০১১ ইংরেজী

হাদিয়া ঃ
২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা

মুদ্রণে ঃ
আছিয়া আর্ট প্রেস
৩১বি/৩, শামীবাগ
নারিন্দা, ঢাকা।

প্রাপ্তি স্থান

১। দারুল হাবিব খানকাহ্ শরীফ
ডাকঘর- হাবিব নগর
কদমতলী, ঢাকা-১৩৬২।

২। নুর মঞ্জিল
বাড়ী নং- ০৯, লেন-০৩
খানকা শরীফ প্রধান সড়ক
হাবিব নগর, কদমতলী
ঢাকা-১৩৬২।
ফোন- ৭৫৪৭৯৯৩
০১৭১৮-৫৫৬৫০০

৩। দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ
এস,ই,এল সেন্টার (৩য় তলা)
২৯, বীর উত্তম কাজী নুরউজ্জামান
সড়ক, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা।

৪। দারুল হাবিব খানকাহ্ শরীফ
গ্রাম- খালকুলিয়া
ডাকঘর- দৈবজ্ঞহাটি, বাগেরহাট।

৫। হক লাইব্রেরী
১৮ নং আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান
বাইতুল মোকাররম, ঢাকা।

উৎসর্গ

ছাইয়্যেদুল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরসালীন, ছাইয়্যেদুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, শাফিউল মুজনেবিন, নূরের নবী, মায়ার নবী, উম্মতের কান্ডারী, আকায়ে নামদার, তাজেদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহ্মাদে মুজতাবা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আজওয়াযিহি ওয়া জুররিয়াতিহি ওয়া আহলে বাইতিহী ওয়া আহলে তোয়াতিহী আজমাইন,

আমার মুর্শিদ যুগ শ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামেল মোকাম্মেল, কুতুবুল এরশাদ, কুতুবুল আলম, মুহাম্মদীয়া তরীকার ইমাম, অবসর প্রাপ্ত প্রিন্সিপাল হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান এম,এ, বি, টি (রাঃ),

এবং

আমার মুর্শিদ হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী মোঃ আব্দুল লতিফ (রহঃ)

স্মরণে উৎসর্গ করা হলো।

নিবেদন

আমার মুর্শিদ গদ্দিনশীন পীর সাহেব কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃআঃ) এর রফে দারাজাত, আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বার বিদেহী আত্মার শান্তি, শ্রদ্ধেয় আম্মা, পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের মাগফেরাত কামনায় নিবেদিত।

– নুর মোহাম্মদ

গ্রন্থকার

দোয়াপত্র

কুতুবুল এরশাদ, কুতুবুল আলম, পীরে কামেল মোকাম্মেল

আলহাজ্জ্ব হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃ আঃ)

এম,এস,এস,

কর্মকতা, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়

গদ্দিনশীন পীর সাহেব

দারুল হাবিব খানকাহ্ শরীফ, হাবিব নগর, ঢাকা।

"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

আলহামদুলিল্লাহ্! সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌রই জন্য। কোটি কোটি দরূদ ও সালাম নূর নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাঁর আওলাদ ও আসহাব সকলের উপর। হজ্জ্ব ইসলাম ধর্মের একটি বিশেষ ভিত্তি। এতদুদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া দৌঁড়ান, মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় সম্পাদিত কার্যাবলী মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার আনুগত্যের প্রকাশ। আল্লাহ্ প্রেমিকগণ তাঁর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ সকল অনুষ্ঠান পালনে ব্রত হন। আল্লাহ্‌র মহান দরবারে হজ্জ্ব কবুল হওয়ার জন্য জাহেরী ও বাতেনী কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে, যার জ্ঞান অর্জন করা হজ্জ্ব যাত্রীগণের জন্য একান্তই আবশ্যক। অতীব লক্ষণীয় বিষয় যে, হজ্জ্বের মূল তত্ত্ব সমৃদ্ধ কিতাবের সবিশেষ অভাব। আমার জানা মতে, আমার মুরীদ মাওলানা নুর মোহাম্মদ সাহেব কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা বলে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে গবেষণামূলক "হাজ্জু বাইতিল্লাহ্-যিয়ারাতু রাসূলিল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)" গ্রন্থখানা রচনা করেছেন। এ গ্রন্থটিতে আমি বিশেষভাবে যা লক্ষ্য করেছি তা হলো, পবিত্র হজ্জ্বের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রেম অর্জন করা, যা হলো ইমানের মূল। আমি আশা করি, এ কিতাবখানা প্রেমিকের উক্ত তৃষ্ণা মিটাতে সহায়ক হবে।

লেখক সহজ ও সরল ভাষায় কিতাবখানা হজ্জ্ব ও উমরার আশেকান ভাই-বোনদের খেদমতে পেশ করেছেন। আমি আন্তরিকভাবে দোয়া করি, আল্লাহ্ কিতাবখানা কবুল করুন এবং এর বহুল প্রচার ও পাঠকবৃন্দের নিকট সমাদৃত করুন। আমীন।

আগস্ট ২৮, ২০১১ইং

সূফী অদুদুর রহমান
পীর সাহেবজাদা

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা পরম করুণাময় দয়ার সাগর বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ্‌র যিনি মানব জাতির হেদায়াতের জন্য নিজঘর "বাইতুল্লাহ্ শরীফ" ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর একে কেন্দ্র করে বান্দার প্রতি পবিত্র হজ্জ্ব ফরয করেছেন। পবিত্র হজ্জ্বের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন কা'বা শরীফ, হাজরে আসওয়াদ, মাকামে ইব্রাহীম, সাফা-মারওয়া, মিনা, আরাফাত, মুজদালিফা, কোরবানী, যমযম ইত্যাদি।

লাখো কোটি দরূদ ও সালাম আমাদের নেতা, আমাদের সুপারিশকারী, উম্মতের কান্ডারী, দয়ার নবী, মায়ার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, আছহাব, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং সকল উম্মতের উপর।

পবিত্র হজ্জ্ব ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। এটা হচ্ছে সারা জীবনের ইবাদতের সৌন্দর্য এবং দ্বীনের পরিপূর্ণতা। অধম গোলামদের জন্য মহাপ্রভুর ঘরে উপস্থিত হওয়ার বিনীত প্রচেষ্টা হলো মহাপ্রভুর নৈকট্য লাভেরই অন্তিম আকাঙ্খা। সারা জীবন আল্লাহ্‌র ঘরকে কেবলা করে সেজ্‌দা করেছেন, আজ তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে চোখ অশ্রুসিক্ত হলো, হৃদয় পরিতৃপ্ত হলো, এ সবই মহা প্রভুর নিছক কৃপা সিঞ্চনে।

প্রকৃত হাজী জাহেরী চক্ষু দিয়ে আল্লাহ্‌র ঘর অবলোকন করে আর ক্বলবের বাতেনী চক্ষু দ্বারা গৃহের মালিকের অপরিসীম রূপ দর্শণে রত হয়। একজন হাজী শুধু হজ্জ্ব করেই ক্ষান্ত হন না, অধিকন্তু হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রওজাপাক যিয়ারত করে নবী প্রেম, নবী যিয়ারত এবং নবীর আদর্শ গ্রহণ করে ধন্য হন। ইহাই হজ্জ্বের অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্ব। পরম দয়ালু মহান আল্লাহ্‌র অশেষ করুণায় আমার মুর্শিদ কেবলা দ্বয়ের সঙ্গে একাধিকবার হজ্জ্ব নছিব হয়। ১৯৭৬ সালে প্রথম বার হজ্জ্ব সম্পাদনের পর মুর্শিদ কেবলা আমাকে মক্কা শরীফেই বলেন– "আমি হাতে কলমে আপনাকে হজ্জ্ব শিক্ষা দিলাম।" আমার বিশ্বাস, কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর নেক নজর ও তার কারামতই আমার বার বার হজ্জ্ব-উমরা নছিব হওয়ার অছিলা। প্রাণের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রওজাপাক ও আল্লাহ্‌র ঘরই মানব জাতির শান্তির কেন্দ্রবিন্দু। এর জাহেরী ও বাতেনী স্বাদ বর্ণনার ভাষা মানুষের নেই। এ সম্পর্কে লেখার সাহসও আমার নেই। তবুও এই কিতাবখানা লেখার দুঃসাধ্য সাধনার মূল উৎস আমার মুর্শিদ কেবলার "হজ্জ্ব দর্পন" কিতাবখানা। শুধু হজ্জ্বের হাকিকতই নয় বরং জাহেরী মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কেও অনেক হাজী সাহেবরা পরিপূর্ণ অবগত নয় বিধায় শরীয়ত ও তরীকতের আলোকে হজ্জ্বের কার্যাবলীর প্রয়োজনীয় ধারণা দেওয়ার জন্যই হাজী ভাই বোনদের খেদমতে এ ক্ষুদ্র কিতাবখানা উপস্থিত করতে প্রয়াস পেলাম।

কঠিন ইবাদত যাতে সহজ হয়, সেজন্যে কিতাবখানায় বেশ কিছু বিষয় পুনরাবৃত্তি করেছি। এটা আলোচ্য বিষয়ের পূর্ণতার জন্যই করেছি। কারণ এমন কিছু ধর্মপ্রাণ লোকও হজ্ব করবেন যারা অন্যত্র লিখিত একই বিষয় জেনে-বুঝে আমল করার চিন্তা নাও করতে পারেন। এই প্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তির কারণে অত্র কিতাবের কিছু কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র।

প্রয়োজন অনুযায়ী যথাস্থানে কিছু স্বপ্ন ও কাশ্ফ উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ এমনও কিছু বিষয় রয়েছে যা বাহ্যিক জ্ঞানে সহজবোধ্য নয়। স্বপ্ন ও কাশ্ফের বিষয় উল্লেখ করায় বিষয়গুলো খুবই স্পষ্ট হয়েছে। সত্য স্বপ্ন ও কাশ্ফ মোটেই উপেক্ষণীয় বিষয় নয়, যেমন– আল-কুরআনের আলোকে হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর কোরবানী, হযরত ইউসূফ (আঃ)-কে এগারটি তারকা সেজ্দা করা, মিসরের বাদশাহ্র ৭টি মোটা-তাজা গাভীকে ৭টি কৃষকায় গাভী ভক্ষণ করতে স্বপ্নে দেখা ইত্যাদি সবই বাস্তব।

আমার এই কিতাব লেখার সময় সর্বদা আমার মুর্শিদ কেবলা ও প্রাণের নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তাওয়াজ্জোহ্ এবং পরম বন্ধু আল্লাহ্র অপার করুণা ও দয়ার দিকে খেয়াল রাখতে চেষ্টা করেছি। না হলে এ কিতাবের পরিপূর্ণতা আমার সাধ্যের অতীত ছিল। তাই মহান আল্লাহ্তা'য়ালার দরবারে কোটি-কোটি শুকরিয়া।

আমার জ্ঞানের দীনতা ও সীমাবদ্ধতা সত্বেও হাজী ভাই ও বোনদের সঠিকভাবে হজ্জ সম্পাদনে সহায়তায় আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন কিতাবের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে প্রয়াস পেয়েছি। এ কিতাবের কোথাও কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি বা খেলাফমত দৃষ্ট হলে অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে জানালে বাধিত হব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রাখি। উল্লেখ্য যে, কিতাবখানায় ব্যবহৃত আরবীগুলো সহায়ক গ্রন্থাবলী থেকে স্ক্যান করে সংযুক্ত করার কারণে বাংলার সাথে আরবী লেখার ধরণে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

আমার এই ক্ষুদ্র কাজে অধীর আগ্রহে অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন আমার দপ্তরের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্জ মৌলভী মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেব। মানুষের জীবনে চলার পথে একজন সুচিন্তিত, সুহৃদয়, জ্ঞানী-গুণী, বিচক্ষণ অভিভাবক পাওয়া মহান আল্লাহ্রই বিশেষ করুণা। তিনি দয়া করে আমার কর্মজীবনের শুরুতেই সেই অভিভাবক মিলিয়ে দিলেন, তিনি হলেন, ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. মতিন (অবঃ চীফ ইঞ্জিনিয়ার, পিডিবি) সাহেব। তিনি আমার গোটা জীবনের সর্বকাজে যে যত্ন নিয়েছেন, এর তুলনা নেই। এ কিতাবখানা লেখায় তার আগ্রহ, উদ্দীপনা, সহায়তা ও যত্নের কথা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। তার কাছে আমি চির ঋণী। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ এ,এইচ,এম, জহিরুল হক, ডিজিএম (প্রশাসন ও সেবা) জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, ডিজিএম (মার্কেটিং এন্ড ফাইন্যান্স) জনাব মোঃ

শাহ্জাহান মিয়া তাঁদের সহযোগিতাকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বরণ করছি। বিশেষভাবে সার্বক্ষণিক খেদমত করেছে মোঃ শাহ্ আলাম ও মোঃ দেলোয়ার মিয়া। এছাড়াও অফিসের আরও অনেকের সহযোগিতায় উপকৃত হয়েছি।

বিচক্ষণ কর্মী, ধৈর্য্যশীল যুবক মোঃ আবদুল আউয়াল (মিন্টু) সাহেব পুস্তকখানি কম্পোজ, ভুল সংশোধন করে কিতাব আকারে প্রস্তুত করতে অনেক অনেক শ্রম দিয়েছেন। জনাব মোঃ ছানাউল্লাহ সানী ও জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন মুন্সী পুস্তকখানির প্রুফ দেখা, ছবি সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

তরীকাত জীবনের শুরু থেকেই আমাকে লেখা-লেখির জন্য কত যে তাকিদ করেছেন শ্রদ্ধেয় পীরভাই এ্যাডভোকেট মৌলভী অহিদুল্লাহ্ সাহেব, তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর কাছে আমি ঋণী। এ কাজে বিশেষ আগ্রহ যোগিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, সার্বিক সহযোগিতা করেছেন ইঞ্জিঃ গোলাম মহিউদ্দিন সাহেব ও ইঞ্জিঃ মহিউদ্দিন আনিছ সাহেব। আমার পরিবারের সকলের, বিশেষ করে আমার স্ত্রীর ত্যাগ আল্লাহ্ কবুল করুন। পরম বন্ধু আল্লাহ্তা'য়ালা ও মায়ার নবী হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রেমিক আমার অনেক পীর ভাই-বোনদের নেক দোয়া, সার্বিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভে আমি ধন্য হয়েছি। তাদের এ আন্তরিকতার যথার্থ পুরস্কার আল্লাহ্ দান করুন। আমিন।

ফরিয়াদ মাওলার দরবারে, তোমার অপার করুণায় অধমের এ কিতাবখানা কবুল কর এবং তোমার আশেক বান্দাদের মধ্যে এর বহুল প্রচার করতঃ তোমার এ নগণ্য গোলামের জন্য ছদকায়ে জারিয়া'র পথ উন্মুক্ত করে দাও। ইয়া আল্লাহ্! এ কিতাবখানা আমার এবং এর লেখা ও প্রকাশনার সাথে জড়িত তোমার বান্দা-বান্দীদের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পরলৌকিক নাজাতের উছিলা হিসাবে কবুল কর এবং তোমার বান্দারা যাতে হজ্জের হাকীকত অর্জন করে, তোমার ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রেমে বিভোর থেকে ঈমানের সাথে শেষ বিদায় নিতে পারে, সে তৌফিক দান কর। আমীন।

– নুর মোহাম্মদ
গ্রন্থকার

আল-কোরআনের বাণী

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য যেরূপ মুত্তাকী (আল্লাহ্ প্রেমিক ও তাঁর ভয়ে ভীত) হওয়া উচিত সেরূপ মুক্তাকী হও এবং কামেল (পূর্ণ) মুসলমান না হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করো না।"– কোরআন (৩ঃ১০২)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

"যারা ঈমানদার তাঁরা আল্লাহ্পাককে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসেন।"– কোরআন (২ঃ১৬৫)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

"নবী [হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)] মুমিনদের নিকট তাদের স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় এবং তাঁর বিবিগণ তাদের (মুমিনদের) মাতা।"– কোরআন (৩৩ঃ৬)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব জাতিকে সন্ত্রস্ত করে দিয়েছেন–

إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

"তোমার প্রভুর নিকটে (কিয়ামতের) এক দিন তোমাদের (দুনিয়ার) গণনায় এক হাজার বছরের সমান।"– কোরআন (২২ঃ৪৭)

অর্থাৎ কিয়ামতের একদিন পরিমান সময় দুনিয়ার হিসাবে এক হাজার বছরের সময়। এ পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়ার ৮৩ বছরের জিন্দেগী হাশরের মাঠের মাত্র দুই ঘণ্টা পরিমান সময়। (৩২ঃ৫, ৭০ঃ৪) [তবে মুমিনের জন্য হবে একটি ফরয নামায আদায়ের সময়ের সমান।–(মাজহারী)]

হাদীসের বাণী

হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন– "মৃত্যুর পর মুসলমানের সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কিছু আমল মৃত্যুর পরও জারি থাকে। যথা- ১) এলেম নিজে শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দান করে। ২) নেক সন্তানের দোয়া ৩) কোরআন শরীফ, যা ওয়ারেছদের জন্য রেখে যায় ৪) মসজিদ ৫) সরাইখানা-পথিকদের আস্তানা ৬) নহর (পানির ব্যবস্থা) করে যায়, ৭) সুস্থ অবস্থায় দান করে, যা কখনো বিনষ্ট হয় না।"– ইবনে মাজা

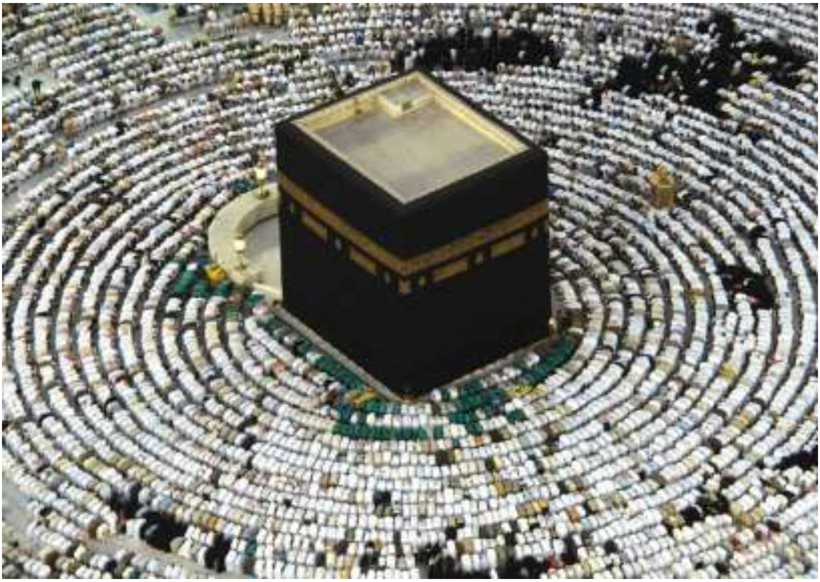

কাবা শরীফ

কাবা শরীফ

রওযা শরীফ

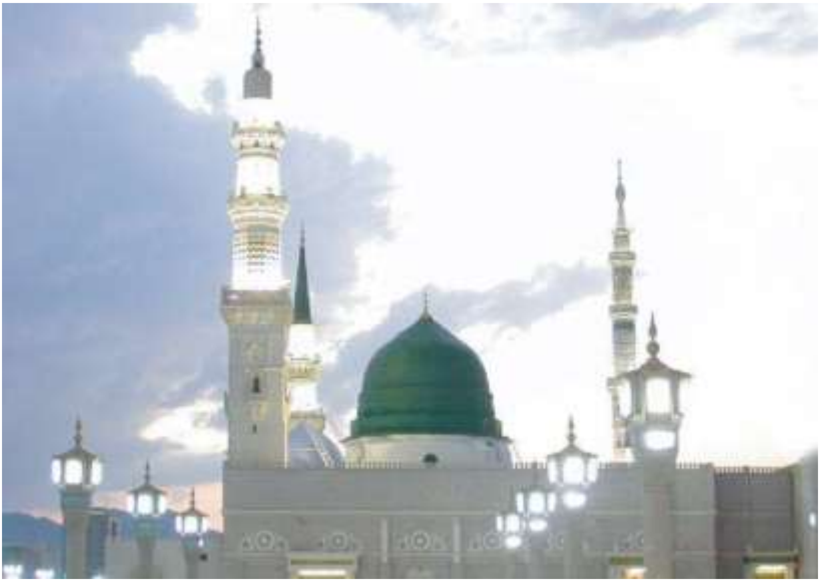

মসজিদ-ই-নববী

হাজরে আস্ওয়াদ

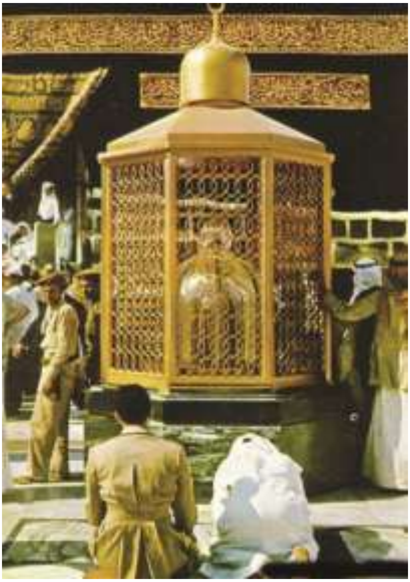

মাকামে ইব্রাহীম

কাবা শরীফের দরজা

রওযা শরীফের দরজা

সাফা-মারওয়া

জাবাল-ই-রহমত

জাবাল-ই-নূর (গারে হেরা)

জাবাল-ই-সুর

আরাফাত ময়দান

মীনা ময়দান

মসজিদ-ই-কোবা

মসজিদ-ই-কেবলাতাঈন

মসজিদ-ই-নামেরা

মসজিদ-ই-আয়েশা

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
হজ্জের ইতিহাস	২৯
হজ্জের বিবরণ	৩২
হজ্জ ফরযের প্রমাণ	৩৩
• আল-কোরআনে হজ্জ ফরযের প্রমাণ	৩৩
• হাদিস শরীফে হজ্জ ফরযের প্রমাণ	৩৪
• হজ্জ ফরযে ইজমার প্রমাণ	৩৫
• যুক্তির মাধ্যমে হজ্জ ফরযের প্রমাণ	৩৫
হজ্জের ফজিলত	৩৬
• কোরআনের বর্ণনায় হজ্জের ফজিলত	৩৬
• হাদিসের বর্ণনায় হজ্জের ফজিলত	৩৬
হজ্জ পালনের তাগিদ্	৪০
হজ্জের সুফল ও হাকিকত	৪১
• হজ্জের সুফল	৪১
• হজ্জের নিগূঢ় তত্ত্ব ও হাকিকত	৪১
ফরয হজ্জ ও ওয়াজিব হজ্জ	৪৩
হজ্জের সময়সীমা	৪৪
হজ্জের শর্ত সমূহ	৪৪
হজ্জের প্রস্তুতি	৪৫
• ধর্মীয় ও মানসিক প্রস্তুতি	৪৫
• বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি	৪৬
• পুরুষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের তালিকা	৪৭
• মহিলাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের তালিকা	৪৮
হজ্জ-উমরার প্রস্তুতির বিষয় প্রশ্ন	৪৯
হজ্জের জন্য গৃহ হতে নির্গমন	৫০
কাফেলার নেতা নির্বাচন	৫৬
হজ্জের সফরে আচার-আচরণ	৫৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
হজ্জের আহ্কাম (ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত)	৫৮
• হজ্জের ফরয সমূহ	৫৮
• হজ্জের ওয়াজিব সমূহ	৫৯
• হজ্জের সুন্নাত সমূহ	৫৯
হরম	৬০
মীকাত	৬০
• মীকাতের প্রকারভেদ	৬০
• ইয়ালামলাম পাহাড়	৬১
ইহরাম ও হজ্জের নিয়্যাত	৬২
• ইহরাম	৬২
• উমরাহর নিয়্যাত	৬৩
• তামাত্তু’ হজ্জের নিয়্যাত	৬৩
• ইফরাদ হজ্জের নিয়্যাত	৬৩
• ক্বিরাণ হজ্জের নিয়্যাত	৬৩
• ইহরামের গোসলের মাসআলা সমূহ	৬৩
• ইহরামের লেবাসের মাসআলা সমূহ	৬৪
• ইহরামের নামাযের মাসআলা সমূহ	৬৪
• তালবিয়া	৬৫
• মহিলাদের ইহরাম	৬৬
• অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা ও পাগলের ইহরাম	৬৭
• খোজা, সংজ্ঞাহীন ও পীড়িত ব্যক্তির ইহরাম	৬৮
ইহরামকারীর করণীয় ও বর্জনীয় আমল	৬৮
• ইহরামকারীর করণীয় আমল	৬৮
• ইহরামকারীর বর্জনীয় আমল	৬৯
• ইহরামের মাকরূহ্ বিষয় সমূহ	৬৯
• ইহরামের মুবাহ্ বিষয় সমূহ	৭০
ইহরামকারীর জ্ঞাতব্য বিষয়	৭১
ইহরামের তাৎপর্য	৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
জেদ্দা আগমন	৭২
মুয়াল্লিম সম্পর্কীয় জ্ঞাতব্য বিষয়	৭২
মক্কা মোয়াজ্জমা	৭৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমরাহ্ পালন	৭৩
• উমরাহ্র ফজিলত	৭৩
উমরাহ্র আহকাম ও আদায়ের পদ্ধতি	৭৫
• ইহরামের নামায	৭৬
• তালবিয়া	৭৬
• হরম শরীফ প্রবেশ ও তাওয়াফ	৭৭
• মাকামে ইব্রাহীমে নামায	৭৯
• যমযমের পানি পান	৭৯
• সাফা-মারওয়া সাঈ ও মাথা মুন্ডানো	৮০
হজ্জের প্রকারভেদ	৮১
আহ্কামে হজ্জ ও উমরার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৮১
• উমরার কার্যাবলী	৮২
• হজ্জে তামাত্তু’র কার্যাবলী	৮২
• হজ্জে ইফরাদের কার্যাবলী	৮২
• হজ্জে কেরানের কার্যাবলী	৮৩
• হজ্জ সম্পর্কে হুশিয়ারি	৮৩
তামাত্তু’ হজ্জ আদায়ের নিয়মাবলী	৮৪
• তামাত্তু হজ্জের বর্ণনা	৮৪
• তামাত্তু’ হজ্জ পালনকারীর উমরা আদায়	৮৪
• তারিখ অনুযায়ী তামাত্তু’ হজ্জের কার্যাবলী	৮৪
• তামাত্তু’ হজ্জ সম্পাদন	৮৫
• ইহরামের নামায	৮৫
• হরম শরীফ প্রবেশ ও তাওয়াফ	৮৬
• মাকামে ইব্রাহীমে নামায	৮৮
• যম্যমের পানি পান	৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
• সাফা-মারওয়া সাঈ	৮৯
তামাত্তু' হজ্জের ব্যস্ততম ০৫ (পাঁচ) দিন (৮-১২ই যিলহজ্জ)	৯০
• ৮ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	৯০
• ৯ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	৯০
• ১০ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	৯২
• ১১ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	৯৩
• ১২ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	৯৩
হজ্জে তামাত্তু'র শর্ত সমূহ	৯৫
হজ্জে তামাত্তু'র মাসআলা	৯৫
ইফরাদ হজ্জ আদায়ের নিয়মাবলী	৯৬
• ইফরাদ হজ্জের বর্ণনা	৯৬
• তারিখ অনুযায়ী ইফরাদ হজ্জের কার্যাবলী	৯৭
• ইফরাদ হজ্জ সম্পাদন	৯৭
• ইহরামের নামায	৯৮
• হরম শরীফ প্রবেশ ও তাওয়াফ	৯৮
• মাকামে ইব্রাহীমে নামায	১০১
• যম্‌যমের পানি পান	১০১
• সাফা-মারওয়া সাঈ	১০১
ইফরাদ হজ্জের ব্যস্ততম ০৫ (পাঁচ) দিন (৮-১২ই যিলহজ্জ)	১০২
• ৮ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	১০২
• ৯ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	১০২
• ১০ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	১০৪
• ১১ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	১০৫
• ১২ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	১০৫
ক্বিরান হজ্জ আদায়ের নিয়মাবলী	১০৭
• ক্বিরান হজ্জের বর্ণনা	১০৭
• তারিখ অনুযায়ী ক্বিরান হজ্জের কার্যাবলী	১০৭
• ক্বিরান হজ্জ সম্পাদন	১০৮
• ইহরামের নামায	১০৮
• হরম শরীফ প্রবেশ ও তাওয়াফ	১০৯

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
• মাকামে ইব্রাহীম-এ নামায	১১১
• যম্যমের পানি পান	১১১
• সাফা-মারওয়া সাঈ	১১২
ক্বিরান হজ্জের ব্যস্ততম ০৫ (পাঁচ) দিন (৮-১২ই যিলহজ্জ)	১১৩
• ৮ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	১১৩
• ৯ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	১১৩
• ১০ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	১১৪
• ১১ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	১১৬
• ১২ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয়	১১৬
ক্বিরান হজ্জের শর্ত সমূহ	১১৭
ক্বিরান হজ্জের মাস্আলা	১১৮
এক নজরে পবিত্র হজ্জে তামাত্তো	১২০
এক নজরে পবিত্র হজ্জে ইফরাদ	১২১
এক নজরে পবিত্র হজ্জে ক্বিরান	১২২
উমরা ও হজ্জের পার্থক্য	১২৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাওয়াফ-এ বাইতুল্লাহ্	১২৩
• তাওয়াফের অর্থ	১২৩
• তাওয়াফের ফজিলত	১২৪
• তাওয়াফের সংক্ষিপ্ত দোয়া	১২৪
• তাওয়াফের সহজ দোয়া	১২৪
তাওয়াফের প্রকারভেদ	১২৭
• তাওয়াফ ০৭ (সাত) প্রকার	১২৭
• তাওয়াফের আহকাম (ফরজ)	১২৮
• তাওয়াফের আরকান (ফরজ)	১২৮
• হজ্জের তাওয়াফের শর্ত সমূহ (ফরজ)	১২৮
• হজ্জ ব্যতীত অন্য সকল তাওয়াফের শর্ত সমূহ (ফরজ)	১২৮
• তাওয়াফের ওয়াজিব সমূহ	১২৯
• তাওয়াফের ওয়াজিবের হুকুম	১২৯
• তাওয়াফের সুন্নাত সমূহ	১২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
• তাওয়াফের মুস্তাহাব সমূহ	১৩০
• তাওয়াফের মুবাহ্ কাজ সমূহ	১৩০
• তাওয়াফের নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ	১৩১
• তাওয়াফের মাকরূহ বিষয় সমূহ	১৩১
মহিলাদের তাওয়াফ	১৩২
সাঈ’র বিস্তারিত বিবরণ	১৩২
• সাঈ’র অর্থ	১৩২
• সাঈ’র সুন্নাত তরীকা	১৩৩
• সাঈ’র সংক্ষিপ্ত দোয়া	১৩৫
• সাঈ’র বিস্তারিত দোয়া	১৩৬
সাঈ’র আহকাম	১৪৮
• সাঈ’র ফরয সমূহ	১৪৮
• সাঈ’র ওয়াজিব সমূহ	১৪৯
• সাঈ’র সুন্নাত সমূহ	১৫০
• সাঈ’র মুস্তাহাব সমূহ	১৫০
• সাঈ’র মাকরূহ কাজ সমূহ	১৫০
মাথা মুন্ডান	১৫১
• হলক ও কসর	১৫১
• মাস্‌আলা	১৫১
• মাথা মুন্ডানোর দোয়া	১৫৩
মীনা-মুযদালিফা-আরাফাতের নক্‌শা	১৫৩
মীনা-আরাফাত-মুযদালিফায় অবস্থানে সাথে নিবেন	১৫৪
মিনায় অবস্থান	১৫৪
• মাস্‌আলা	১৫৫
আরাফাতে অবস্থান	১৫৫
• আরাফাতের বর্ণনা	১৫৫
• আরাফাত সম্পর্কীয় মাস্‌আলা	১৫৬
আরাফাতে অকুফের (অবস্থানের) আহ্কাম	১৫৮
• অকুফের শর্ত (ফরজ) সমূহ	১৫৮
• অকুফের রুকন (ফরজ)	১৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
• অকুফের সুন্নাত সমূহ	১৫৯
• অকুফের মুস্তাহাব সমূহ	১৫৯
• অকুফের মাকরূহ কাজ সমূহ	১৬০
আরাফাতের ময়দান হতে মুযদালিফা হয়ে মীনায় গমন	১৬১
মুযদালিফায় অবস্থান	১৬১
• মুযদালিফার বর্ণনা	১৬১
• মুযদালিফা সম্পর্কীয় মাস্‌আলা	১৬২
মুসাফিরের নামায	১৬২
সফরে সুন্নাত নামায	১৬২
মক্কা মুয়াজ্জামা, আরাফাত ও মুযদালিফায় নামায	১৬৩
• মক্কা শরীফে নামায	১৬৩
• আরাফাত ও মুযদালিফায় নামায	১৬৩
• যোহর ও আসর নামায একত্রিকরণের শর্ত সমূহ	১৬৩
• মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রিত করা	১৬৪
• মাস্‌আলা	১৬৫
রমী (কংকর নিক্ষেপ) করা	১৬৬
• রমীর বর্ণনা	১৬৬
• কংকর নিক্ষেপের স্থান	১৬৬
• রমী সম্পর্কীয় মাস্‌আলা	১৬৬
কংকর নিক্ষেপের আহ্‌কাম	১৬৬
• কংকর নিক্ষেপের শর্ত (ফরয)	১৬৬
• বিবিধ মাসআলা	১৬৮
কুরবানী	১৬৯
• কুরবানীর বর্ণনা	১৬৯
• কুরবানীর নিয়ম	১৭০
• কুরবানীর মাস্‌আলা	১৭০
তাওয়াফে যিয়ারত	১৭১
• তাওয়াফে যিয়ারতের শর্ত (ফরয) সমূহ	১৭১
• তাওয়াফে যিয়ারতের ওয়াজিব সমূহ	১৭২
• তাওয়াফে যিয়ারতের মাস্‌আলা	১৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
তাওয়াফে বিদা	১৭৩
• তাওয়াফে বিদা'র বর্ণনা	১৭৩
• তাওয়াফে বিদা'র নিয়ম	১৭৩
• তাওয়াফে বিদা'র মাস্‌আলা	১৭৫
• তাওয়াফে বিদা না করে মীকাত অতিক্রম করার মাস্‌আলা	১৭৫
বদলী হজ্জ	১৭৫
• বদলী হজ্জের বর্ণনা	১৭৫
• প্রথমে নিজের হজ্জ করবেন তারপর অন্যের হজ্জ	১৭৬
• এবাদতে প্রতিনিধি নিয়োগ	১৭৭
• বদলী হজ্জের মাসআলা সমূহ	১৭৭
• অন্যের নামে কোন্ প্রকারের হজ্জ সম্পাদন করবেন	১৭৯
• বদলী হজ্জের নিয়্যত	১৮০
• বদলী হজ্জ আদায়ে সক্ষম ব্যক্তি কে?	১৮০
• বদলী হজ্জ আদায়কারীর জন্য সফরের খরচ	১৮১
"এহইয়াউ উলুমিদ্দিন" কিতাবের আলোকে "দেশ-মিকাত-মক্কা শরীফ"	১৮৩
"এহইয়াউ উলুমিদ্দিন" কিতাবের আলোকে তাওয়াফ	১৯২
পারিভাষিক শব্দ এবং কতিপয় বিশেষ স্থানের নাম	১৯৭
হিজাযী ওজন ও পরিমাপ	২০১
মক্কা শরীফ	২০২
• মক্কা শরীফের বর্ণনা	২০২
• মক্কা শরীফের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা	২০২
প্রথমে কোথায় যাবেন: মক্কা শরীফ না মদীনা শরীফ?	২০৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কা'বা শরীফের ইতিহাস	২০৫
• কা'বা শরীফের ফজিলত	২০৬
• গিলাফে ঢাকা কা'বা	২১০
• কা'বা শরীফের মুতাওয়াল্লী	২১২
• হাজরে আসওয়াদ	২১৩
• হাতিম	২১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
• মীজাবে রহমত	২১৫
• মুলতাযাম	২১৫
• মাতাফ	২১৫
• রুকনে ইয়ামানী	২১৫
• রুকনে ইরাকী	২১৫
• রুকনে শামী	২১৫
• মাকামে ইব্রাহীম	২১৫
মসজিদুল হারাম ও সাফা-মারওয়ার নক্শা	২১৫
জাহেরী কা'বা ও বাতেনী কা'বা	২১৮
মক্কা শরীফের গুরুত্বপূর্ণ গৃহ সমূহ	২২০
পবিত্র যমযমের পানি	২২১
• যমযমের পানির ফজিলত	২২১
• মাথায় ও গায়ে যম্যমের পানি ছিটা দেয়া	২২৩
• যমযমের পানি দ্বারা ওযু করা	২২৩
• যমযমের পানি পান করানো সওয়াবের কাজ	২২৩
• যমযমের পানি পান করার আদব	২২৩
• যমযমের পানি পান করার দোয়া	২২৩
• যমযমের পানি দেশে আনা	২২৪
• যমযমের পানির মাসআলা	২২৪
জান্নাতুল মোয়াল্লা	২২৫
মক্কা মুকাররমাহ্ ও মীনার মসজিদ সমূহ	২২৫
মক্কা শরীফের পবিত্র পাহাড় সমূহ	২২৬
• সাফা ও মারওয়া পাহাড়	২২৬
• নূর পাহাড়	২২৬
• সাওর পাহাড়	২২৭
• জাবালে আবি কুবাইস	২২৭
• জাবালে রহমত	২২৭
মক্কা শরীফ দোয়া কবুলের স্থান	২২৭
পবিত্র হজ্জ ও উমরাহ্ সম্পাদনকারীদের নেক আমল	২২৮
• মক্কা শরীফে করণীয় নেক্ আমল	২২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
• মদীনা শরীফে করণীয় নেক আমল	২২৯
• সেরা ইবাদত নামায	২২৯
• জানাযার নামায	২৩০
• সালাতুত্ তাসবীহ্	২৩২
• নামাজের জন্য অপেক্ষায় থাকার ফজিলত	২৩৩
দূরপাল্লার বিমান ভ্রমণে যাত্রীদের জন্য ব্যয়ামের অনুশীলন	২৩৪
স্বাস্থ্য সচেতনতা	২৩৪
হজ্জের দাওয়াত	২৩৫
• মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহ্র হজ্জের দাওয়াত	২৩৫
• মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি মহান আল্লাহ্র হজ্জের দাওয়াত	২৩৬
• কুতুবুল এরশাদের প্রতি মহান আল্লাহ্র হজ্জের দাওয়াত	২৩৬
হজ্জ সম্পর্কীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মাস্আলা	২৪০
• সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধানের ত্রুটি	২৪০
• জুতার মাসআলা	২৪১
• মাথা এবং মুখমন্ডল আবৃত করার ত্রুটি	২৪১
• সুগন্ধি এবং তেল ব্যবহার করার ত্রুটি	২৪২
• হরমের বৃক্ষ ও উদ্ভিদ কর্তনের ত্রুটি	২৪৪
হজ্জের ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফ্ফারা	২৪৫
• দমের মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় হওয়ার শর্ত সমূহ	২৪৬
• রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় হওয়ার শর্ত সমূহ	২৪৬
• সাদ্কার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় হওয়ার শর্ত সমূহ	২৪৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মদীনা মুনাওয়ারা	২৪৮
• আল-মদীনার বিবরণ	২৪৮
• মদীনা মুনাওয়ারা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী	২৪৯
হরমে মদীনা	২৫১
মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের জাহেরী ও বাতেনী গুরুত্ব	২৫১

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশকালীন আদব	২৫৩
মসজিদে নববী ও রওজা শরীফ পরিচিতি	২৫৫
মসজিদে নববী ও রওজা মোবারক যিয়ারতে উত্তম পোশাক পরিধান করা	২৫৯
দুর্গন্ধযুক্ত কিছু নিয়ে মসজিদে প্রবেশ না করা	২৬০
রওজা শরীফ যিয়ারতে লক্ষণীয় বিষয়	২৬০
রওজা শরীফ যিয়ারত	২৬১
রওজা শরীফে সালাম পাঠ করার নিয়ম	২৬২
মসজিদে নববীর ফজিলত	২৬৬
রিয়াজুল জান্নাতে রহমতের স্তম্ভ সমূহ	২৬৮
মদীনা শরীফে দোয়া কবুল ও জিয়ারতের স্থান সমূহ	২৬৯
আল-মদীনার মসজিদ সমূহের যিয়ারত	২৭০
আল-মদীনার কূপ সমূহ	২৭৪
শোহাদায়ে উহুদের যিয়ারত	২৭৬
যিয়ারতে হযরত ফাতিমা (রাঃ)	২৭৭
জান্নাতুল বাকীর নক্শা	২৭৯
আহলে জান্নাতুল বাকীদের যিয়ারত	২৮০

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	২৮২
স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যিয়ারত	২৮৭
রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যিয়ারত লাভের আমল	২৯৫
হজ্জ হতে দেশে প্রত্যাবর্তন	২৯৬
• মদীনা মুনাওয়ারা হতে জেদ্দা ও দেশে পৌঁছা	২৯৭
• বাড়ীর নিকটে পৌঁছা	২৯৭
• হাজীগণকে অভ্যর্থনা করা	২৯৮
মকবুল হজ্জ	২৯৮
• হজ্জ কবুল হওয়ার নিদর্শন	২৯৮
• হজ্জের পরবর্তী অবস্থা ও অনুধাবন	২৯৯
একজন হাজীর আজীবন কর্তব্য ও দায়িত্ব	২৯৯
মুর্শিদ আমার	৩০০
• পরিচয়	৩০০

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
• শিক্ষা জীবন	৩০০
• কর্ম জীবন	৩০০
• আধ্যাত্মিক জীবন	৩০০
• কুতুবুল এরশাদ ও মোজাদ্দেদ	৩০১
গদ্দিনশীন পীর সাহেব	৩০৪
মুহাম্মাদীয়া তরীকার বিবরণ ও সাধনা পদ্ধতি	৩০৫
• মুহাম্মাদীয়া তরীকার বিবরণ	৩০৫
• মুহাম্মাদীয়া তরীকার লতিফা সমূহ	৩০৬
• মুহাম্মাদীয়া তরীকার অজিফা	৩০৭
• দশ লতিফার জিকির	৩০৯
বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর বাণী	৩১১
হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আসহাব (রাঃ)-গণের দৈনিক কার্যের রুটিন	৩১৪
খাওয়ার ফরজ ও ওয়াজিবের বিবরণ	৩১৬
আল্লাহ্ ০৮ (আট)টি অভ্যাস বড়ই ঘৃণা করেন	৩১৬
০৯ (নয়) প্রকার লোকের দোয়া কবুল হয়	৩১৬
দোয়া কবুল হওয়ার সময়	৩১৬
লেখক পরিচিতি	৩১৭
কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) এর রচিত গ্রন্থাবলী	৩১৯
সহায়ক গ্রন্থাবলী	৩২০

প্রথম পরিচ্ছেদ

হজ্জের ইতিহাস

হজ্জের রয়েছে সুপ্রাচীন ইতিহাস। এর প্রতিটি কাজ ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত ও তাৎপর্যপূর্ণ। জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আসার পর হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আঃ) পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে তাঁরা একে অপরকে খুঁজতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ্র রহমতে তাঁরা আরাফাতের ময়দানে মিলিত হন। তারই কৃতজ্ঞতা ও স্মরণ স্বরূপ আদম সন্তানগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতি বছর আরাফাতের মহামিলন প্রান্তরে সমবেত হয়ে আল্লাহর দরবারে কান্না-কাটি করেন। তারা তাদের হৃদয়-মন দিয়ে আল্লাহকে উপলব্ধি করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

এভাবে সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ, মীনায় শয়তানকে কংকর মারা এবং কুরবানীর প্রেক্ষাপট, যা হযতর ইব্রাহীম (আঃ) ও বিবি হযরত হাজেরা (আঃ) এবং তাঁদের পুণ্যবান সন্তান হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর দ্বারা রচিত হয়েছে আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে। এভাবে হযরত আদম (আঃ) থেকে আজ পর্যন্ত সর্বযুগের আল্লাহপ্রেমিক, আল্লাহতে নিবেদিতপ্রাণ নবী-রাসূল, ওলী-আবদাল তথা আল্লাহর নেককার, সত্যপ্রাণ ও মকবুল বান্দাগণের পরম ব্যাকুলতার সাথে আল্লাহর ঘর তাওয়াফের মাধ্যমে হাজার হাজার বছরের আত্মনিবেদনের মাধ্যমে রচিত হয়েছে হজ্জ ও যিয়ারতের সুবিশাল প্রেক্ষাপট।

হযরত আদম (আঃ) এর পৃথিবীতে আগমনের পূর্ব হতেই বাইতুল্লাহ শরীফ বিদ্যমান, আকাশের ফেরেশতারা যেমন বায়তুল মামুর তাওয়াফ করেছেন, জমিনের ফেরেশতারাও তদ্রূপ বাইতুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করেন। মানব জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ আদায় করেছেন। এরপর হযরত নূহ (আঃ) সহ অন্যন্য নবী-রাসূলগণ সকলেই বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও তাওয়াফ করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, বায়তুল্লাহ শরীফের পুনঃনির্মাণের কাজ সমাধা করার পর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে এই পবিত্র গৃহের তাওয়াফ ও হজ্জ করার জন্য বললেন। এ নির্দেশ পেয়ে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইল (আঃ) উভয়েই তাওয়াফ সহ হজ্জের যাবতীয় কর্মকান্ড সমাধা করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা হুকুম করলেন, হে ইব্রাহীম! তুমি গোটা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা ছড়িয়ে দাও। এ মর্মে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

"এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করে দাও; তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।"- (সূরা হাজ্জ, ২২ঃ২৭)

তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একটি উঁচুস্থানে আরোহণ করলেন এবং ডানে-বামে পূর্ব-পশ্চিমে ফিরে হজ্জের ঘোষণা করলেন। বললেন–

أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَاَجِيبُوا رَبَّكُمْ

"হে লোক সকল! বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও।" এ আহ্বান শুনে পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত যাদের হজ্জ নসীব হবে তাঁরা সকলেই উত্তরে বলেছেন–

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

'হাজির হে প্রভু! আমরা সকলেই হাজির' বলেছে। কেউ সাড়া দিয়েছে একবার, আবার কেউ সাড়া দিয়েছে একাধিকবার। যারা একবার সাড়া দিয়েছে, তাদের একবার হজ্জ নসীব হয়। আর যারা একাধিকবার সাড়া দিয়েছে, তাদের একাধিকবার হজ্জ নসীব হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পর যত নবী রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন তাঁরা সকলেই বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারত করেছেন, হজ্জব্রত পালন করেছেন।

জাহেলিয়াতের যুগেও লোকেরা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং যিয়ারত করতো। কিন্তু তারা তা করতো নিজেদের মনগড়া পন্থায়। নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তাধারার আলোকে জাহেলী বহু কর্ম-কান্ড তারা হজ্জের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, হজ্জের মৌসুমে কুরায়েশগণ অন্যান্য হাজীদের ন্যায় আরাফার ময়দানে না গিয়ে মুযদালিফায় অবস্থান করতো। তারা বলতো, আমরা হুম্‌স। আমাদের একটা স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য রয়েছে। তাই অন্যান্যদের মত আমরা সেখানে যেতে পারি না।

বস্তুতঃ, কালের বিবর্তনে হজ্জ তার আপন পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্যতা হারিয়ে খেল-তামাশা এবং অশ-ীল চিত্তবিনোদনের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। তখন তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতো। জাহেলী যুগের এসব কুসংস্কার চিরতরে বন্ধ করার লক্ষ্যে ইসলাম নতুনভাবে হজ্জের ফরযিয়াতের বিধান প্রবর্তন করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য।"-(সূরা আ'ল ইমরান, ৩ঃ৯৭)

ইসলামী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সকল মুসলমান সমান। কাজেই অন্যান্য লোকেরা যেমন আরাফা পর্যন্ত যায়, তেমনিভাবে কুরায়শগণকেও আরাফা পর্যন্ত যেতে হবে।

ইরশাদ রয়েছে–

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"তারপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান হতে

প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"-(সূরা বাকারা, ২ঃ১৯৯)

হজ্জকে জাহেলী যুগের বাকযুদ্ধ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَ كُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

"তারপর তোমরা যখন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে।"-(সূরা বাকারা, ২ঃ২০০)

ইরশাদ হয়েছে–

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ

"হজ্জ অবস্থায় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়।"-(সূরা বাকারা, ২ঃ১৯৭)

জাহেলী যুগের মুশরিক লোকেরা উপাস্য দেব-দেবীর নামে পশু বলি দিত এবং গোশত দেব-দেবীর সামনে রেখে দিত আর গায়ে রক্ত ছিটিয়ে দিত। বস্তুতঃ এ ধরনের কার্যকলাপ বিভ্রান্তি বৈ কিছু নয়।

এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন–

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

"আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না তাদের গোশ্‌ত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।"- (সূরা হাজ্জ, ২২ঃ৩৭)

জাহেলী যুগের আরেকটি হাস্যকর রেওয়াজ ছিল এই যে, হজ্জের নিয়্যত করার পর সম্মুখ দরজা পথে ঘরে প্রবেশ করাকে তারা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে মনে করত। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল হজ্জ নষ্ট করে দেওয়ার নামান্তর। কুরআন মজীদে এ সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"এবং পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে তাকওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"-(সূরা বাকারা, ২ঃ১৮৯)

মুশরিক লোকদের আরেকটি বাড়াবাড়ি এই ছিল যে, তারা হজ্জের সফরে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নিয়ে যাওয়া তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী মনে করতো। তাদের যুক্তি ছিল, আমরা আল্লাহ্‌র মেহমান। সাথে করে কিছু নিয়ে যাওয়া মেহমানের অপমানেরই নামান্তর। এদিকে তারা আবার অন্যের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করতেও

কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হতো না। বরং এটাকে তারা অহংকার দমনের সাধনা বলে চালিয়ে দিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ চতুরতার পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে ঘোষণা করলেন–

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

"এবং তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। তবে মনে রাখবে তাকওয়াই উত্তম পাথেয়।"– (সূরা বাকারা, ২ঃ১৯৭)

হজ্জের সময় মুশরিক লোকেরা আরেকটি নির্লজ্জ কাজ করতো। তা হলো, তারা উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করতো। তাদের যুক্তি ছিল যে এই পোশাক পরিধান করে বছর ভর আল্লাহ্র নাফরমানী করেছি। সুতরাং এ পোশাক পরিধান করে তাওয়াফ করতে পারি না। বস্তুত এটা ছিল রুচিবিরোধী অশ-ীল কাজ। তাই কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'য়ালা বনী আদমকে সম্বোধন করে বলেন–

يَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে।"– (সূরা আ'রাফ, ৭ঃ৩১)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে বিদায় হজ্জের এক বছর পূর্বে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, আগামী বছর থেকে কোন মুশরিক ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করতে পারবে না এবং উলঙ্গ অবস্থায়ও কেউ তাওয়াফ করতে পারবে না। মোট কথা, এই সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত হজ্জকে আবার সুন্নাতে ইব্রাহীমীর দিকে ফিরিয়ে আনল। ফলে যাবতীয় শিরক্, বিদ'আত ও জাহেলী কর্ম হতে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে হজ্জ আবার তাওহীদের প্রতীক হিসাবে প্রতিবিম্বিত হলো।

হজ্জের বিবরণ

হজ্জ আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করা। শরীয়তের পারিভাষায় নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে মক্কার কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ, আরাফাত ময়দানে অবস্থান, সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ান, মীনায় অবস্থান প্রভৃতি কার্য যেভাবে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছেন ও পালন করেছেন, সেভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করার নামই হজ্জ। এটি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের পঞ্চম স্তম্ভ।

কোরআন মজীদে ২ঃ১৫৮, ২ঃ১৮৯, ২ঃ১৯৬, ২ঃ১৯৭, ৩ঃ৯৭ঃ ৯ঃ৩, ৯ঃ১৯, ২২ঃ২৭ মোট ৮টি আয়াতে ১২ (বার) বার হজ্জ শব্দটি উল্লেখ হয়েছে। হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয়টি কোরআন-হাদীস, ইজমা ও কিয়াস (যুক্তি) দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং হজ্জকে অস্বীকার করা কোরআন-হাদীস ও ইজমাকে অস্বীকার করারই নামান্তর। শরীয়তের ভাষায় ইহা কুফরী।

হজ্জ মদীনাতেই ফরয হয়েছে। হিজরতের পূর্বে মক্কায় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সকল হজ্জ করেছেন তাতে কুরাইশদের রীতি অনুসরণ করেছেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি উমরার নিয়তেই মক্কা রওয়ানা হয়েছিলেন এবং বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে হোদায়বিয়ায় সন্ধি করে মদীনায় ফিরে আসেন। ৭ম হিজরীতে উমরা আদায় করেন। ৮ম হিজরীতে রমযান মাসে মক্কা জয় করেন এবং হযরত আত্তাব বিন আহীদ (রাঃ)-কে গভর্ণন নিযুক্ত করেন, পরে হজ্জের সময় তাকেই আমীরুল হজ্জ করেন। ৯ম হিজরীতে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-কে আমীরুল হজ্জ করে পাঠান। তিনশত মুসলমান এ হজ্জে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন নকীবে ইসলাম। হযরত সায়াদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত জাবের (রাঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ছিলেন মুয়াল্লিম। মহা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তরফ হতে কোরবানীর জন্য বিশটি উট সঙ্গে ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) হজ্জের খুৎবা পাঠ করেন এবং হযরত আলী (রাঃ) সূরা বারাআতের চল্লিশটি আয়াত তেলাওয়াত করেন। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১০ম হিজরীতে নিজেই হজ্জ করেন। ইহাই হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একমাত্র ফরয হজ্জ ও বিদায়ী হজ্জ। বোখারী ও মুসলীম শরীফের উদ্ধৃতিতে মেশকাত শরীফের ২৪০৪ নং হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৪ বার উমরাহ্ আদায় করেন।

হজ্জ ফরযের প্রমাণ

আল-কোরআনে হজ্জ ফরযের প্রমাণ ঃ

হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনায় সূরা আল-ইমরানের ৯৭নং আয়াতটি সবচেয়ে স্পর্ষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ঃ

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ـ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

"যার পথ খরচের সম্বল আছে তার জন্যই আল্লাহর এ ঘরে হজ্জ সম্পাদন করা ফরয। বস্তুতঃ যারা এ নির্দেশ পালনে অস্বীকার করবে (তাদের জেনে রাখা উচিত যে,) নিশ্চিতই আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টি জগতের কারও মুখাপেক্ষী নন।"- (কোরআন ৩ঃ৯৭)

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে বলেন–

وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

"তুমি আমার বান্দাদের (আশেকদের) মধ্যে হজ্জ করার জন্য (আযান ধ্বনী) ঘোষণা করে দাও তাহলে দেখতে পাবে যে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত হতে পদদলেই হোক বা উষ্ট্র পৃষ্ঠেই হোক তারা তোমার (প্রতিষ্ঠিত এ ঘরের) নিকট আগমন করবে।"–(কোরআন ২২ঃ২৭)। এ আযানের উত্তরে হজ্জ সম্পদনকারী বলে এসেছেন ও কেয়ামত পর্যন্ত বলতে থাকবে–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

"হাজির হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাজির"

আল-কোরআনে নির্দেশ –

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

"তোমরা সকলে হজ্জ এবং উমরাহ্ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সম্পাদন কর"।–(কোরআন ২ঃ১৯৬)

আল-কুরআনের আলোকে প্রমাণিত হলো হজ্জ ফরজ।

হাদীস শরীফে হজ্জ ফরযের প্রমাণ ঃ

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا- (رواه مسلم)

অর্থাৎ- "হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা অবশ্যই হজ্জ পালন করবে।"–মুসলিম।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ - (رواه البخاري و مسلم)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা– "(১) আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, এ স্বাক্ষ্য প্রদান, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমযানের রোযা পালন করা এবং (৫) বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ পালন করা।"–বোখারী ও মুসলিম।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اِنَّ اِمْرَاَةً مِّنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلٰى عِبَادِهٖ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَالِكَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ - (بخاري و مسلم)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, খাসআম গোত্রের এক মহিলা হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি যে হজ্জ ফরয করেছেন, তা আমার পিতার

উপর তার বার্ধক্যাবস্থায় ফরয হয়েছে। তিনি সওয়ারীর উপর উপবেশন করতে পারেন না, এমতাবস্থায় কি আমি তার পক্ষে হজ্জ সম্পাদন করতে পারি? উত্তরে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হ্যাঁ পার। ইহা ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।"–বোখারী ও মুসলিম।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হ'ল, হজ্জ ফরয এবং যিনি অক্ষম হবেন তিনি অপর কোন লোক দ্বারা নিজের পক্ষ হতে হজ্জ করাবেন।

হজ্জ ফরযে ইজমার প্রমাণ ঃ

"লুবাবুল মানসিক" গ্রন্থে হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয় ইজমার উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছে–

وَاَمَّا الْاِجْمَاعُ فَلِاَنَّ الْاُمَّةَ اَجْمَعَتْ عَلٰى فَرْضِيَّتِهٖ - ﴿بدائع ٢/١١٨﴾

"উম্মতে মুহাম্মদী হজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছে।"

اَلْحَجُّ فَرْضٌ مَرَّةً بِالْاِجْمَاعِ عَلٰى كُلِّ مَنِ اسْتَجْمَعَتْ فِيْهِ الشَّرَائِطُ

যার মধ্যে হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ বর্তমান রয়েছে তার উপর ইজমা বা সর্বসম্মত মতানুযায়ী জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।

যুক্তির মাধ্যমে হজ্জ ফরযের প্রমাণ ঃ

মানবের ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব প্রকাশ। হজ্জের মাধ্যমে বান্দার চরম দাসত্বের প্রমাণ মিলে। বান্দা বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-পরিজন, বিত্ত-বৈভব সব কিছু পরিত্যাগ করে, জল ও স্থল পথের ভ্রমণের কষ্ট, ক্ষুধা পিপাসার জ্বালা সহ্য করে একান্ত বিক্ষিপ্ত, উদভ্রান্ত অবস্থায় প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পূণ্য ভুমির উদ্দেশ্যে পাগল বেশে ধাবিত হয়। আরাম ও বিলাসের সাজসজ্জা পরিত্যাগ করে শুধু একটি লুঙ্গি ও একখানা চাঁদর জড়ায়ে রেখে যেন কাফন পরিধান করেছে এবং পরম বন্ধু আল্লাহ-তা'য়ালার প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। বর্ধিত নখ, চুল, ধুলা মলিন, দেহবয়ব আর মুখে "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" ধ্বনি, পরম বন্ধু মহান আল্লাহ নিজ বাড়ীতে আপনাকে ডাকছেন, আপনি প্রিয়তমের ডাকে অত্যন্ত বিনীত চিত্তে ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ভাব ও ভাষার মাধ্যমে সাড়া দিচ্ছেন, প্রভুর দরবারে উপস্থিত হয়ে কখনও তাঁর দেয়ালে কখনও তাঁর দরজায় আবার কখনও তাঁর ভিত্তি প্রস্তরে (কাল পথরে) চুমা খাচ্ছেন, আবার কখনও চার পাশে ঘুরে ঘুরে তাওয়াফ করছেন। মোট কথা হজ্জ হলো পরম বন্ধু আল্লাহর দাসত্ব প্রকাশের উত্তম উপায়; আর দাসত্ব প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য এই হজ্জব্রত পালনের মাধ্যমেই।

ইবাদত দুই প্রকার ঃ মালী ও বদনী। হজ্জে দৈহিক শ্রম ও সম্পদ ব্যয় হয়। উভয় নিয়ামতেরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় হজ্জের মাধ্যমে। মহান নেয়ামত দাতার আনুগত্যে ব্যয় করাই হলো নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়, ইহা ফরয। সুতরাং বান্দার প্রতি হজ্জ ফরয।

হজ্জের ফজীলত

কোরআনের বর্ণনায় ফজীলত ঃ

কাবা শরীফকে কেন্দ্র করেই হজ্জ। কাবাগৃহের পবিত্রতা ও হজ্জের ফজীলত সম্বন্ধে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ

بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا

"বাক্কায় স্থাপিত (মক্কা শরীফের) এ ঘরই সর্ব প্রথম ঘর যা (আমার উপাসনার জন্য) মানবের জন্য পৃথিবীতে স্থাপিত হয়েছে। উহা সর্ব জগতের জন্য কল্যাণকর ও পথ প্রদর্শক। এতে আমার প্রিয় ইব্রাহীম যে কিরূপে আমাকে লাভ করেছিলেন তার স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে এবং যে এখানে প্রবেশ করবে সে (দোজখের অগ্নি হতে) নিরাপদ হবে। –আল-কুরআন (৩ঃ৯৬-৯৭)

হেরেম শরীফ প্রবেশ ও বাইতুল্লাহ তাওয়াফ অর্থাৎ হজ্জের পুরস্কার দোজখ হতে পরিত্রাণ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ। আল্লাহ্ বলেন–

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

"তোমরা হজ্জ এবং উমরাহ্ আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সম্পাদন কর। (২:১৯৫)

হাদীসের বর্ণনায় ফজীলত ঃ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ

لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ (بخاري و مسلم)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন– এক উমরাহ্ অপর উমরাহ্ পর্যন্ত সময়ের জন্য কাফফারা স্বরূপ এবং মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন কিছুই নয়। (বোখারী মুসলীম)।

حَجَّةٌ مَّبْرُوْرَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَحَجَّةٌ مَّبْرُوْرَةٌ لَيْسَ

لَهَا جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ .(متفق عليه)

হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন যে, "হজ্জে মকবুল দুনিয়া এবং যা কিছু দুনিয়ার মধ্যে আছে সবকিছু থেকে উত্তম। আর হজ্জে

মকবুলের বিনিময় একমাত্র বেহেশত।”–(বোখারী, মুসলীম)

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন–

اَلْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ وَزُوَّارُهُ اِنْ سَاَلُوْهُ اَعْطَاهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ وَاِنْ دَعَوْا اِسْتُجِيْبَ لَهُمْ وَاِنْ شَفَعُوْا شُفِّعُوْا (ابن ماجه)

“হাজীগন আল্লাহ্ তা’য়ালার অতিথি সুতরাং তারা যা চান তিনি তা দেন, এবং পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে ক্ষমা করেন। তাঁকে ডাকলে তিনি ডাকে সাড়া দেন। কারও জন্য সুপারিশ করলে সুপারিশ কবুল করেন।”–(ইবনে মাজা)

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ ﴿بخاري و مسلم﴾

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন “যে ব্যাক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে এবং এতে অশ-ীল কথা বলেনি, বা অশ-ীল কাজ করেনি সে হজ্জ হতে ফিরবে সে দিনের ন্যায়; যে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছে।”– (বোখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿رض﴾ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, “কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, এরপর কোনটি উত্তম? তিনি বললেন আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো এরপর কোনটি? জবাবে তিনি বলেন, মকবুল হজ্জ।”–(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে হাজী বাহনের পিঠে আরোহণ করে হজ্জ পালন করে, তার বাহনের প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে ৭০টি নেকী লেখা হয়। আর যে হাজী পদব্রজে হজ্জ সমাপন করে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে হরমের নেকী সমূহ হতে ৭শত নেকী লিপিবদ্ধ হয়। নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হলো হরমের নেকীর পরিমান কত? তিনি বলেন, হরমের এক নেকী সাধারণ এক লক্ষ নেকীর সমান।”

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন- আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি আল্লাহর যাত্রী (বন্ধু) হল তিন ব্যক্তি, গাজী, হাজী, উমরাহ্ কারী।– (নাসায়ী)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যখন তুমি হাজীর সাক্ষাৎ পাবে তাকে সালাম করবে, মুসাহাফা করবে ও তাকে অনুরোধ করবে যেন তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চান, তার ঘরে প্রবেশের পূর্বে। কেননা হাজী হল ক্ষমা প্রাপ্ত ব্যক্তি।– (আল-হাদীস)

হুযুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি হজ্জ এবং উমরাহ করার নিয়তে ঘর থেকে বের হয়ে মৃত্যু বরণ করে, তার জন্য হজ্জকারী ও উমরাহকারীর ছওয়াব রোজ কিয়ামত পর্যন্ত জারী হতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি দু'হেরেম শরীফের মধ্য থেকে কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করে, হাশরের ময়দানে তার কোন হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন পড়বে না; বরং কেবল বলা হবে, যাও, তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর।

বর্ণিত আছে যে, আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ্ যে ব্যক্তির গুনাহ্ মাফ করে দেন, সে ব্যক্তির কাছে যে উপস্থিত হয় তার গুনাহ্সমূহও আল্লাহ মাফ করে দেন। পূর্ব যুগের এক বুযর্গ বলেন, যদি কোন বছর আরাফাতের তারিখ শুক্রবার হয় তাহলে সেদিন আরাফাতে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ মাগফেরাত দান করেন। আরাফাতের তারিখ শুক্রবার হলে, সেই শুক্রবার দিনটি দুনিয়ার যে কোন দিনের চাইতে মর্তবায় শ্রেষ্ঠ। উল্লেখ্য যে, হুযুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এদিনেই বিদায় হজ্জ করেছিলেন।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, হে মাবুদ! তুমি হাজীকে ক্ষমা কর আর হাজী যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকেও ক্ষমা করে দাও। হাদীসে এরশাদ হয়েছে যে, আলী ইবনে মুওয়াফফাফ (রহঃ) হুযুরে পাকের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পক্ষ থেকে কয়েকবারই হজ্জ্ব করেছিলেন। তিনি বলেন যে, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এরশাদ করছেন, হে আলী ইবনে মুওয়াফফাফ! তুমি কি আমার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আমার পক্ষ থেকে লাব্বায়েক বলেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তাহলে এর প্রতিদান আমি তোমাকে রোজ কিয়ামতে দেব। মানুষ যখন সেদিনকার হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে অস্থির থাকবে, তখন আমি তোমাকে তোমার হাত ধরে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দেব।– (এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন)

মুজাহিদ এবং অন্যান্য কতিপয় আলিম বলেছেন, হাজীগণ যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াযযমায় উপস্থিত হয়ে যায়, তখন যারা উটের পৃষ্ঠে চড়ে আসে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম জানায়। যারা গাধার পৃষ্ঠে চড়ে আসে, তাদের সাথে করমর্দন করে। আর যারা পায়দল আসে তাদের সাথে আলিঙ্গন করে। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রমযানের পরে, জিহাদের পরে অথবা হজ্জ আদায় করার পরে মৃত্যুবরণ করে, সে ব্যক্তি শাহাদাত বরণের ছওয়াব অর্জন করে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হাজীদের গুনাহ্ (নিঃসন্দেহে) মাফ হয়ে যায়। যিলহজ্জ, মহররম, সফর এবং

রবিউল আউয়াল মাসের বিশ তারিখ পর্যন্ত তারা যাদের জন্য দোয়া করে তাদেরকেও আল্লাহ্ মাফ করে দেন। পূর্ব যুগের বুযর্গ মনীষীদের নিয়ম ছিল, তারা মুজাহিদগণকে জিহাদে গমনকালে বিদায় অভ্যর্থনা জানাতে কিছুদূর তাদের সঙ্গে আগমন করতেন এবং হাজীদেরকে স্বাগত জানাতে তাদের আগমনকালে এগিয়ে যেতেন। আর তারা তাদেরকে চোখে ও ললাটে-চুম্বন করতেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না হাজীগণ পার্থিব কাজ-কারবারে লিপ্ত হত বা কোন গুনাহর কাজ কর্মে জড়িয়ে পড়ত, তাদের নিকট দোয়া চাইতেন।

আলী ইবনে মুওয়াফফাফ বলেন, একবার আমি হজ্জ উপলক্ষে গিয়ে এক রাত্রিতে মসজিদে খায়েফে অবস্থান করলাম, সেদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, সবুজ পোশাক পরিহিত দুজন ফেরেশতা আসমান থেকে অবতরণ করল। তাদের একজন অপরজনকে আবদুল্লাহ বলে আহবান করলে সে লাব্বায়েক বলে সাড়া দিল। তখন প্রথম ফেরেশতা দ্বিতীয় ফিরেশতাকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি কি বলতে পার এবার কতজন লোক আমাদের প্রতিপালকের গৃহের হজ্জ আদায় করেছে? দ্বিতীয় ফেরেশতা বলল, তা আমি বলতে পারব না। প্রথম ফেরেশতা বলল, এবার ছয় লক্ষ লোক হজ্জ আদায় করেছে। প্রথম ফেরেশতা দ্বিতীয় ফেরেশতাকে আবার প্রশ্ন করল, তুমি কি বলতে পার এবার কতজন লোকের হজ্জ কবুল হয়েছে? দ্বিতীয় ফেরেশতা বলল তাও আমি বলতে পারব না। তখন প্রথম ফেরেশতা বলল ছয় লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ছয়জনের হজ্জ কবুল হয়েছে। একথা বলার পরেই উভয় ফেরেশতা উর্ধ্ব দিকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমি তখন ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, আমার মনে তখন এক নিদারুণ হতাশা ও নৈরাশ্য চেপে বসল। আমার মনে এ প্রশ্ন জেগে উঠলো যে, মাত্র সে ছয়জন লোকের মধ্যে আমি কি আর থাকতে পারব? অতঃপর যখন আমি আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে মাশআরে হারামের নিকট রাত্রি কাটালাম, তখন কেবল এ চিন্তাই আমার মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, এই বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে মাত্র ছয়জন লোকেরই হজ্জ কবুল হল? এরূপ চিন্তা করতে করতে আমি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আল্লাহ্র কি মর্জি। আমি আবার স্বপ্নে দেখলাম যে, পূর্বোক্ত সেই দুজন ফেরেশতাই আবার অবতরণ করল এবং একে অপরজনের সাথে পূর্বোক্ত আলোচনা শুরু করল। প্রথম ফেরেশতা বলল, আল্লাহ্ তায়ালা যে ছয়জনের হজ্জ কবুল করেছেন তাদের প্রত্যেকের যিম্মায় একলক্ষ করে মানুষ দিয়েছেন। তার অর্থ এই যে, এদের একেক জনের সুপারিশে একলক্ষ করে মোট ছয় লক্ষ লোকের হজ্জ কবুল হয়ে যাবে। আলী ইবনে মুওয়াফফাফ বলেন যে, এরপর আমি যখন জাগ্রত হলাম তখন আমার মন আনন্দে উথলে উঠল।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আলী ইবনে মুওয়াফফাফ বলেন যে, একবার আমি যখন হজ্জের কাজ-কর্মগুলো সম্পন্ন করলাম, তখন যাদের হজ্জ কবুল হয়নি তাদের কথা চিন্তা করে সবার জন্য দোয়া করলাম– হে মাবুদ! আমি আমার হজ্জের ছওয়াব সেই ব্যক্তিকে

দিয়ে দিলাম, যার হজ্জ তুমি কবুল করোনি। ইবনে মুওয়াফফাফ বলেন যে, সেদিন রাত্রিতে আমি আল্লাহ তায়ালাকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন– “হে আলী! তুমি আমার নিকট দানশীলতার সুন্দর নমুনা প্রকাশ করলে। জেনে রেখ, আমিই দানশীলতা এবং দাতাদেরকে সৃষ্টি করেছি। সমস্ত দান এবং দাতা আমার থেকেই সৃষ্টি। আর দান করার যোগ্যতা সর্বাপেক্ষা আমারই বেশী। আমি যাদের হজ্জ কবুল করিনি, তাদেরকে এমন লোকদের যিম্মায় দিয়ে দিয়েছি যে, তাদের হজ্জ কবুল হয়েছে।”

পবিত্র আয়াত ও হাদীস শরীফের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, যদি কেউ আল্লাহর জন্যই হজ্জ পালন করে, আর কোন প্রকার গুণাহে লিপ্ত না হয়, তা হলে তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ।

হজ্জ পালনের তাকীদ্

হজ্জ ফরয হওয়ার পর যথা শীঘ্র তা সম্পন্ন করা অতীব জরুরী। কোন রকম বিলম্ব করা উচিত নয়। যার আর্থিক সামর্থ, দৈহিক সক্ষমতা ও হজ্জ ফরজের যাবতীয় শর্ত বর্তমান থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায়ে দেরি করে, তার সম্পর্কে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কঠোর শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন। তাই হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করা আবশ্যই কর্তব্য।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ (ابو داؤد)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ সমাপন করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন উহা শীঘ্র আদায় করে নেয়।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন– “যে ব্যক্তিকে কোন অনিবার্য প্রয়োজন অথবা অত্যাচারী শাসক অথবা কঠিন পীড়া হজ্জব্রত পালনে বিরত রাখবে না এবং সে হজ্জ সমাপন না করে মৃত্যু বরণ করবে, তা হলে সে যেমন খুশি মরতে পারে, ইচ্ছা হয় ইহুদী অবস্থায় মরুক অথবা খৃষ্টান অবস্থায় মরুক।” - দারেমী

হযরত আবু সাঈদ (রা:) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, “আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন যে ব্যক্তিকে আমি দৈহিক সুস্থতা আর আর্থিক প্রাচুর্য দান করেছি অথচ সে, প্রতি চার বৎসর অন্তর অন্তর আমার দরবারে হাজিরা প্রদান করে নাই, সে বঞ্চিত।”– জাম্‌উল ফাওয়াইদ।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং তাবেঈন (রাঃ)-গণ অজস্র কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও অধিক সংখ্যায় হজ্ব সমাপন করতেন। কেউ কেউ-তো প্রত্যেক বৎসরই হজ্জ পালন করতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রা:) পঞ্চান্নবার হজ্জ করেছেন।

যে মুসলামান হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও শরীয়ত সম্মত অপারগতা ব্যতীত পার্থিব

স্বার্থ ও অলসতাবশতঃ হজ্জ সমাপন করে না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে হুশিয়ার করেছেন, কেননা হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তাবলী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও হজ্জ সমাপন না করে আর তা যদি হজ্জকে ফরয বলে অস্বীকার করার কারণেই হয়ে থাকে, তবে সে ব্যক্তি সুস্পষ্টরূপে কাফের। আর যদি ফরয হওয়ায় বিশ্বাস করে তবে কাফের হবে না।

হজ্জের সুফল ও হাকীকত্

হজ্জের সুফল ঃ

(১) হজ্জের অনুষ্ঠান সমূহ বিশেষ বিশেষ পবিত্র স্থানে সম্পাদন করা হয়। হাজীদের মনে ঐ সব স্থানের ঘটনা সমূহ ভেসে ওঠে যেখানে নবী রাসূলগণের প্রতি কল্যাণ ও বরকত অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের বিষয় স্মরণ হয়। যেমন জাবালে রহমতে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আঃ)'র ভুলের ক্ষমা, মিনায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর কোরবানী, সাফা ও মারওয়ায় হযরত হাজেরার দৌড়ান ও যম্‌যম্ লাভ ইত্যাদি। নতুন করে হাজীর হৃদয়ে তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণের উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি হয়। সুতরাং হজ্জ হলো আত্মতৃপ্তি ও চরিত্র সংশোধনের সর্বোত্তম উপায়।

(২) প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক জাতি মতবিনিময়, নিজেদের শক্তি ও জাঁকজমক প্রদর্শন ও ধর্মীয় রীতি-নীতির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য কোথাও সমবেত হয়ে থাকে। যেহেতু বাইতুল্লাহ্ শরীফ মুসলিম ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু, এ কারণে মুসলমানগন এখানে এসে সমবেত হয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময় ইসলামী শান-শওকত ও বাইতুল্লাহ্ শরীফের মর্যাদা প্রদর্শন করে থাকে।

(৩) হজ্জ পারস্পরিক পরিচিতি, একতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটি উত্তম উপায়, ইহা বিশ্ব মুসলিমের এমন একটি মহা সম্মেলন যার নজীর পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

হজ্জের নিগূঢ় তত্ত্ব ও হাকীকত্ ঃ

(১) কামেল মুসলমান হওয়ার পথ নির্দেশ হচ্ছে হজ্জ। আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য যেরূপ মুত্তাকী (আল্লাহ্ প্রেমিক ও তাঁর ভয়ে ভীত) হওয়া উচিত সেরূপ মুত্তাকী হও এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" —কোরআন (৩ঃ১০২)

হজ্জ ঈমানদারগণকে কামেল (পূর্ণ) মুসলমান বা আল্লাহ্‌র হাতে আত্ম সমর্পণ করার শিক্ষা দেয়। যুক্তি তর্ক ছাড়াই হজ্জ সম্পাদনকারী প্রেমপূর্ণ সরল হৃদয়ে মহা প্রভূর হাতে আত্ম সমর্পণ করে। যেমনঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ, হাজ্‌রে আছওয়াদ

চুম্বন, সাফা-মারওয়া দৌড়ান, আরাফা, মুজদালেফা ও মিনায় অবস্থান প্রভৃতি অনুষ্ঠান যার অর্থ বুদ্ধির অতীত তা সে বিনা যুক্তিতে পালন করে মহা প্রভুর পূর্ণ দাসত্ব প্রদর্শন করে। মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে বলেন- যুক্তি তর্ক না করেই আমার বান্দা আমার আদেশ পালন করেছে।

(২) আখেরাতের সফরের বিশেষ নিদর্শন হচ্ছে হজ্জ ঃ হজ্জের ছফর মৃত্যুর সময় আখেরাতে আল্লাহ্‌র নিকট মহা প্রস্থানের নমুনা। মৃত্যুর পরই মাইয়েতকে গোসলের পর যেমন সিলাই বিহীন শ্বেত ও শুভ্র কাফন পরিধান করানো হয় তেমনি হাজীগন সাদা সিলাই বিহীন কাপড় পরিধান করে হজ্জের নিয়ত করে। মানুষ যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন আত্মীয়-স্বজন বাড়ি-ঘর, ধন-সম্পদ, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে সফরে বের হতে হয়। যেমন মৃত্যু সময় বাড়ি-ঘর, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন সবকিছুই বর্জন করতে হয়। যান বাহনে আরোহন হাজীকে খাঁটিয়ায় সাওয়ার হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। “লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক” বলা কিয়ামতের দিন আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয়ার সমতুল্য। সাফা-মারওয়া সাঈ হাশরের মাঠে ছুটাছুটি করার মত। আরাফাত ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের অবস্থান হাশরের ময়দানের নমুনা। মিনায় কুরবানী আল্লাহরই আদেশ পালনে প্রাণ উৎসর্গ করার নির্দেশ দেয়। মোট কথা হজ্জের প্রতিটি আমলে হাজীর হৃদয়ে আখেরাত স্মরন করায়।

(৩) হজ্জ হল আল্লাহ্‌র ইশক ও মহব্বত প্রকাশ করার এক অপরূপ বিধান। প্রেমাস্পদের আকর্ষণে মাতোয়ারা হয়ে প্রেমিক ছুটে চলে তাঁর ঘর যিয়ারতে। যাত্রা শুরু করেই পাগল হয়ে যায় পরম বন্ধুর জন্য। পৌঁছে মক্কা শরীফ, পৌঁছে মদীনা শরীফ, আরাফা, মুজদালাফায় উপস্থিত হয়ে কান্না-কাটি ও গড়াগড়ি করছে মহান আল্লাহর দরবারে। কোথাও দাড়াবার সুযোগ নেই, বিশ্রামের অবকাশ নেই, কেবল ছুটাছুটি করে উত্তপ্ত হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করতেই সে সচেষ্ট। প্রতিটি আমলেই আমরা দেখতে পাই প্রেমের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কেননা সবকিছুরই মায়া ছেড়ে প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া, তারই তালাশে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পবিত্র মক্কা-মদিনা পৌঁছা, অলিতে গলিতে দৌড়া-দৌড়ি ও ছুটাছুটি করা একমাত্র প্রেমিকেরই কাজ। না আছে মাথায় টুপি, না শরীরে জামা, না সুন্দর পোশাক, না আছে সুগন্ধি বরং ফকীর বেশে উদাসীন মনে সাদা কাপড়ে আচ্ছাদিত প্রেমিকের কি এক অপূর্ব দৃশ্য। “লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক” ধ্বনিতে মুখরিত আকাশ-বাতাস “প্রভু-হে, বান্দা হাজির, হাজির তোমার দরবারে।” মনে করে, আমি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌছে গেছি, বিচ্ছেদের পর এ নৈকট্য লাভ করতে যে কত মধুর, কত যে শান্তি, তৃপ্তি, আশেক ছাড়া বুঝে না। মধুমক্ষির মত বাইতুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ, হাজরে আসওয়াদে চুমা খাওয়া, মুলতাযাম জড়িয়ে ধরা, কাবার চৌকাঠ ধরে কান্না-কাটি করা, ঐ সবই ইশকে ইলাহীর অনুপম দৃশ্য। জামারাতে কংকর নিক্ষেপের পর কুরবানী করে প্রেমানুরাগের শেষ মঞ্জিল অতিক্রম করে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে হাজীগণ নিজ মুসাফির

খানায়। বাইতুল্লাহ শরীফ ও রওযা শরীফের মহব্বতে প্রেমিকের মনে দাউদাউ করে প্রেমাগ্নি জ্বলতে থাকে। সার কথা, প্রেমিক মানুষ আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বতে বাইতুল্লাহ শরীফ ও রওজা শরীফ যিয়ারাত করে। ইহাই হল হজ্জের অন্যতম উদ্দেশ্য ও হাকিকত্।

প্রকৃত হাজী জাহেরী চক্ষু দিয়ে যখন আল্লাহর ঘর অবলোকন করে তখন তার বাতেনী কলবের চক্ষু গৃহস্বামীর (আল্লাহর) অপরিসীম রূপ দর্শণে রত হয়। স্মরণ রাখবেন, চর্ম চক্ষু দ্বারা কেউ কখনো আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখতে পারে না, তাঁকে হৃদয় দর্পণেই দেখা যায়। সুতরাং হৃদয় দর্পণকে কামেল পীরের দীক্ষা ও তাওয়াজ্জোহ দ্বারা পবিত্র করতে পারলেই আল্লাহ্র দিদার লাভে ধন্য হয়ে হাকীকাতে হজ্জ নছীব হওয়া সম্ভব।

ফরয হজ্জ ও ওয়াজিব হজ্জ

মাসআলা ঃ

১। সারা জীবনে মাত্র একবার হজ্জ ফরয। ফরয হজ্জকে হজ্জাতুল ইসলাম বলা হয়।

যদি কেউ হজ্জের মান্নত করেন, তা হলে তার উপরও হজ্জ ওয়াজিব হয়ে যায়। ফরয ও মান্নত হজ্জ একই পদ্ধতিতে আদায় করতে হয়। যেই বৎসর হজ্জ ফরয হয় সেই বৎসরই তা আদায় করা ওয়াজিব। কারণ আগামী বৎসর হজ্জ পর্যন্ত আপনার হায়াত আছে কিনা বা সম্পদ থাকবে কিনা, সুস্থ থাকবেন কিনা জানা নেই। যদি কেউ বিনা কারণে বিলম্ব করে তা হলে গুনাহ্গার হবে। কিন্তু যদি মৃত্যুর পূর্বে হজ্জ সমাপন করে নেয়, তা হলে আদায় হয়ে যাবে এবং বিলম্ব করার পাপও মোচন হবে। কিন্তু হজ্জ সমাপন না করে মারা গেলে হজ্জ আদায় না করার পাপ তার যিম্মায় থেকে যাবে।

যে ব্যক্তি হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে, সে কাফের।

২। হজ্জ অনেক সময় মান্নত ছাড়াও ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন– যদি কেউ ইহরাম না বেঁধে মীকাত অতিক্রম করেন, তা হলে তার উপরে হজ্জ অথবা উমরা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

৩। একাধিক হজ্জ পালন করলে তা নফল বলে গণ্য হবে।

৪। যদি কেউ হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার পরও আদায় করতে সক্ষম না হন, তা হলে তা আদায় করার ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব।

৫। মেয়ে লোকের জন্য স্বামী অথবা মাহ্রাম না থাকলে হজ্জ করতে পারবে না। তদ্রূপ রাস্তা-ঘাট নিরাপদ না হওয়াও ওযর। এমন অসুখ-বিসুখ, যাহার দরুন সফর করা সম্ভব নয় অথবা সফরে সাংঘাতিক কষ্টের আশঙ্কা থাকে, তবে তাও ওযর।

হজ্জের সময়সীমা

হজ্জ-এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। এর বাইরে হজ্জ আদায় করা জায়িয নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ

"হজ্জের মাস সমূহ সুবিদিত।" (সূরা বাকারা, ২ঃ১৯৭)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রাঃ) বলেন, "হজ্জের মাসসমূহ হচ্ছে শাওয়াল, যিলক্বদ এবং যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিন।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে, হজ্জের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে এর পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা জায়িয নয়। কোন কোন ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধলে হজ্জ আদায়ই হবে না। ইমাম আযম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে অবশ্য হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মাকরূহ হবে।

হজ্জের শর্তসমূহ

হজ্জের শর্ত চার প্রকার। যথা– ১) হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত ২) হজ্জ আদায় করার শর্ত ৩) হজ্জ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত ও ৪) ফরয হজ্জ হতে অব্যাহতি লাভের শর্ত।

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ ঃ

১। মুসলমান হওয়া।

২। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৩। সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া।

৪। আযাদ হওয়া।

৫। হজ্জ পালনের দৈহিক ও আর্থিক সঙ্গতি থাকা।

৬। হজ্জের সময় হওয়া।

৭। হজ্জ যাত্রা পথের নিরাপত্তা।

৮। বিধর্মী শত্রু রাষ্ট্রের নও মুসলিমের পক্ষে হজ্জ ফরয হওয়ার জ্ঞান থাকা।

অমুসলিম, জ্ঞান হারা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী ও পাগলের উপর হজ্জ ফরয নহে। আর্থিক সক্ষমতা তথা সফরের জন্য যে পাথেয় থাকার কথা বলা হয়েছে উহা নিম্নে বর্ণিত প্রয়োজনীয় সম্পত্তির অতিরিক্ত হতে হবে। যথা– বসবাসের ঘর-বাড়ী, পরিধানের কাপড়-চোপড়, গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, হজ্জ হতে ফিরে আসা পর্যন্ত চাকর-বাকর ও পরিবার-পরিজনদের যাবতীয় খরচপত্র, ঋণ, সওয়ারী অর্থাৎ গাঁধা, গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি আপন পেশা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

হজ্জ আদায় করার শর্ত পাঁচটি। যথা– ১) শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা ২) বন্দীদশা অথবা বাদশাহর পক্ষ হতে নিষেধ না থাকা ৩) পথ-ঘাট নিরাপদ হওয়া ৪) মহিলাদের জন্য স্বামী বা অপর কোন মাহরাম সঙ্গে থাকা ও ৫) মহিলাদের ইদ্দত পালনের অবস্থা হতে মুক্ত থাকা।

হজ্জ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত ৯টি। যথা– ১) মুসলমান হওয়া ২) ইহরাম বাঁধা ৩) হজ্জের নির্ধারিত মাসে হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহ পালন করা ৪) হজ্জের কাজ নির্দিষ্ট যথা স্থানে সম্পন্ন করা। যেমন– আরাফাহ্র ময়দানে অবস্থান, মসজিদে হারামে তাওয়াফ, মিনায় কংকর নিক্ষেপ, হরমের সীমার মধ্যে কোরবানী ৫) ভাল-মন্দ বুঝবার ক্ষমতা থাকা ৬) সুস্থ্য মস্তিস্ক হওয়া ৭) ইহরাম বাঁধার পর আরাফাতের ময়দানে অবস্থান পর্ব সমাপ্ত করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস না করা ৮) যাবতীয় অনুষ্ঠান নিজে সমাপন করা (অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ওযরবশতঃ অন্যকে দিয়ে কাজ করানো জায়েয আছে) ৯) যে বৎসর ইহরাম করবেন সে বৎসরই হজ্জ সমাপন করা।

ফরজ হজ্জ হতে অব্যাহতি লাভের শর্ত ৯টি। যথা– ১) হজ্জ আদায়ের সময় মুসলমান হওয়া (অর্থাৎ ইসলামের উপর থাকা) ২) শেষ জীবন পর্যন্ত ইসলামে বজায় থাকা। যদি কেহ হজ্জ আদায় করার পর ইসলাম ত্যাগ করে পরে আবার ইসলাম গ্রহণ করে তবে পূর্বের হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। ৩) আযাদ হওয়া ৪) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ৫) সুস্থ্য মস্তিষ্ক হওয়া ৬) সক্ষম হলে নিজেই হজ্জ করা ৭) হজ্জকে স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে বিনষ্ট না করা ৮) অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের নিয়ত না করা ৯) নফলের নিয়ত না করা।

হজ্জের প্রস্তুতি

হজ্জ যাত্রার প্রস্তুতির দু'টি দিক রয়েছে, একটি ধর্মীয় ও মানসিক প্রস্তুতি, অপরটি দুনিয়াদারী বা বাহ্যিক প্রস্তুতি, একে আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতিও বলা যেতে পারে।

ক) ধর্মীয় ও মানসিক প্রস্তুতি ঃ

১। নিয়্যত বিশুদ্ধকরণ– হজ্জ হবে একান্তই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে। নামধাম ও জৌলুস প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়। কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন– "মানুষের উপর এমন এক সময় উপস্থিত হবে যখন তাদের উচ্চবিত্তরা শুধু ভ্রমণ ও চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে, মধ্যবিত্তরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্ররা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং আলেম ও ক্বারী সাহেবরা খ্যাতি অর্জন ও লোক দেখানোর জন্য হজ্জ করবে।"

২। হজ্জ ও উমরার মাস'আলা সমূহ শিক্ষা করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– "আমার নিকট থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও।"

৩। উত্তম সফর সঙ্গী নির্বাচন, কেননা উত্তম সফর সঙ্গী ইবাদত বন্দেগীর সহায়ক হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিদেশ-বিভূয়ে আপদে-বিপদে সংযমী, সহানুভূতিশীল বিবেকবান সফর সাথী ছাড়া বিশেষ অসুবিধা হয়। হজ্জের মাস'আলা জানা অভিজ্ঞ আলিম ও সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী সাথী মকবুল হজ্জ হাসিলের বিশেষ সহায়ক।

৪। হালালভাবে অর্জিত মালের সংস্থান। কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- "আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজে পবিত্র, পবিত্রতা ছাড়া অন্য কিছু তিনি কবুল করেন না।" রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন- "কোন ব্যক্তি তার হালালভাবে অর্জিত সম্পদ নিয়ে হজ্জে বের হয়, বাহনে চড়ে, সে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযিরা দেয়। "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক"- "হাযির প্রভু তোমার দরবারে হাযির"। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার জবাবে বলেন- 'লাব্বাইক ও সা'দায়িক'-আমিও হাযির, তোমার অনুকূলে আমি আছি, তুমি সৌভাগ্যের অধিকারী। কেননা তোমার পথ খরচা, তোমার বাহন সবকিছু হালাল উপায়ে অর্জিত। **পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হারাম মাল নিয়ে হজ্জে বের হয়, তার লাব্বাইক উচ্চারণের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- 'লা লাব্বাইক ওয়া লা সা'দাইক'-আমি তোমার জন্য হাযির নই, তোমার অনুকূলেও নই, তোমার সৌভাগ্য নেই। কেননা তোমার হজ্জ উপলক্ষে ব্যয়িত সম্পদ হালালভাবে অর্জিত নয়।"**

৫। কারো সাথে কোন লেনদেন থাকলে তা যথাসাধ্য চুকিয়ে ফেলা এবং পুরোপুরি চুকানো সম্ভব না হলে তা লিখে রাখা এবং কয়েকজন সাক্ষী রাখা।

৬। কারো ধনসম্পদ জমি-জিরাত বা অন্য কোন হক নিজের জিম্মায় থাকলে তা আদায় করা। উপরন্তু কারো কোনরূপ মনোকষ্টের কারণ ঘটিয়ে থাকলে তার জন্যেও ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দায়মুক্ত হওয়া।

৭। মাতা-পিতা জীবিত থাকলে এবং তাদের সেবা শুশ্রুষার প্রয়োজন থাকলে বা পথ বিপজ্জনক হলে তাদের অনুমতি নেয়া।

৮। যাঞ্চা করা থেকে বিরত থাকা।

৯। অতীতের গুনাহরাশির জন্যে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেওয়া। ভবিষ্যতে আর গুনাহ্ না করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া।

১০। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে তাকওয়া অবলম্বন তথা ইসলামী জীবন যাপনের উপদেশ দান।

খ) বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ঃ

১। হজ্জের নিয়ন্ত্রণ যেহেতু ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হাতে, তাই তাদের জারীকৃত নির্দেশাদি ও তাদের বিলিকৃত পুস্তিকা ও ইশতেহারাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে সে মতে কাজ করা।

২। যথা সময়ে হাজী ক্যাম্পে পৌঁছে স্বাস্থ্যগত আনুষ্ঠানিক বিষয়, ইনজেকশন ও স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট ইত্যাদি গ্রহণ করা।

৩। ইহরামের কাপড় (দুই জোড়া নেওয়াই উত্তম), প্রয়োজনীয় দু'আ দরূদ ও অযীফা পুস্তক, হজ্জের মাস'আলা সংক্রান্ত পুস্তক ও প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি, কাপড়-চোপড় ও হালকা বিছানাপত্র, রঙিন চশমা, খাতা, কাগজ ও কলম, অভঙ্গুর ও হালকা বাসনপত্র, মিস্ওয়াক, টয়লেট পেপার, ক্ষৌর সামগ্রী ও আয়না, সুতলী, দড়ি, ছাতা, সর্বোপরি তালা চাবি সহ একটি মজবুত সুটকেস বা ব্যাগ, জরুরী কাগজপত্র ও টাকা-পয়সা রাখার মত একটি প্রশস্ত কোমরবন্ধ সাথে নেয়া। খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে না নেয়া।

৪। ব্যাগে নিজের ঠিকানা ও নম্বর পরিষ্কারভাবে লিখে নেওয়া যাতে হারিয়ে গেলে সহজে পাওয়া যায়।

৫। পাসপোর্ট ও সার্টিফিটেক ও বিমানের টিকিট ইত্যাদি সাবধানে রাখার ব্যবস্থা অবলম্বন।

৬। মহিলাদের বোরকা সাথে নেওয়া, অলংকারাদি যতদূর সম্ভব কম নেওয়া উত্তম। কেননা অনেক সময় তা বিপদের ও পেরেশানীর কারণ হয়ে যায়।

৭। প্রয়োজনীয় আরবী কথোপকথন শিখে নেওয়া, যাতে টুকটাক কথা বলা ও বোঝা যায়।

৮। মক্কা, মদীনা, আরাফাত ও মীনায় বাংলাদেশ দূতাবাস ও হজ্জ মিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

হজ্জ, উমরায় পুরুষ ও মহিলাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের তালিকা

পুরুষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের তালিকা ঃ

নং	বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
০১	কুরআন শরীফ/ওজিফা/হজ্জের কিতাব/ ছবকের বই	প্রয়োজন মতো
০২	ইহরামের কাপড়	সাদা ৫ হাত ২টা ও ৬ হাত ২টা
০৩	স্যান্ডেল	১ জোড়া
০৪	জুতা (পছন্দমত)	১ জোড়া
০৫	মৌজা	১ জোড়া
০৬	লুঙ্গি	২টি
০৭	গেঞ্জি	৩টি
০৮	পাঞ্জাবী	২টি
০৯	পায়জামা	২টি
১০	টুপি	২টি
১১	গামছা	১টি

১২	আয়না চিরুনি	১টি করে
১৩	ছোট কাঁচি	১টি
১৪	বে-ড	১ প্যাকেট
১৫	রেজার	১টি
১৬	পেষ্ট	১ প্যাকেট
১৭	ব্রাশ	১টি
১৮	গ্লাস	১টি
১৯	ভেজলিন	১টি
২০	ক্রিম	১টি
২১	প্লেট/বাটি/চামচ	১টি করে
২২	নোট বুক	১টি
২৩	কলম, ঘড়ি	১টি করে
২৪	রশি	১০ গজ
২৫	কোমর বেল্ট	১টি
২৬	টয়লেট পেপার	৩টি
২৭	সাবান	১টি
২৮	সুয়েটার, মাফলার	১টি করে
২৯	সঙ্গে রাখার ছোট ব্যাগ	১টি
৩০	বড় ব্যাগ	১টি
৩১	তাইয়াম্মুমের মাটি	প্রয়োজন মত
৩২	চশমা	১টি
৩৩	চিড়া	১ কেজি
৩৪	হালকা জায়নামায	১টি
৩৫	ঔষধ (সফরের পূর্ণ সময়ের জন্য)	প্রয়োজন মত

মহিলাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের তালিকা ঃ

নং	বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
০১	কুরআন শরীফ/ওজিফা/হজ্জের কিতাব/ ছবকের বই	প্রয়োজন মতো
০২	বোরকা	২ সেট
০৩	স্যান্ডেল	১ জোড়া
০৪	জুতা (পছন্দমত)	১ জোড়া
০৫	মৌজা	১ জোড়া

০৬	গামছা	১টি
০৭	আয়না	১টি
০৮	চিরুনী	১টি
০৯	পেষ্ট	১ প্যাকেট
১০	ব্রাশ	১টি
১১	গ্লাস	১টি
১২	ভেজলিন	১টি
১৩	প্লেট/বাটি/চামুচ	১টি করে
১৪	কলম, ঘড়ি	১টি করে
১৫	রশি	১০ গজ
১৬	টয়লেট পেপার	২টি
১৭	সাবান	১টি
১৮	বড় ব্যাগ ও ছোট ব্যাগ	১টি করে
১৯	চিড়া	১ কেজি
২০	মহিলাদের জন্য স্যালোয়ার, কামিজ ও ওড়না, চুলের ঢাকনী	৩ সেট বা প্রয়োজন মতো
২১	ঔষধ (সফরের পূর্ণ সময়ের জন্য)	প্রয়োজন মত
২২	রুমাল	২টি
২৩	জায়নামায	১টি
২৪	সুঁই-সুতা	১টি করে
২৫	তাইয়াম্মুমের মাটি	১টি
২৬	চশমা	
২৭	চকলেট	

হজ্জ-উমরার প্রস্তুতির বিষয়ে প্রশ্ন

১। আপনার পাসপোর্ট আছে কি?

২। আপনি কি সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জে/উমরায় যাবেন? না-কি এজেন্টের মাধ্যমে?

৩। যাওয়ার পূর্বে ভিসা, মেডিক্যাল চেক-আপ, ফ্লাইট বুকিং বিষয়ে অবগত হয়েছেন কি?

৪। সাথে শিশু থাকলে ছবিসহ আপনার পাসপোর্টে তা লিপিবদ্ধ করেছেন কি?

৫। তালিকা দেখে জিনিসপত্র যোগার করেছেন কি?

৬। মাসআলা-মাসায়েল জানেন এরকম বিজ্ঞ আলেম বা বিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে যাচ্ছেন কি? নিজে হজ্জ-উমরা বিষয়ে পড়া-শুনা করেছেন কি?

৭। নিজ সংসার পরিচালনার জন্য ব্যবস্থা করেছেন কি? যদি লেন-দেন থাকে তা সমাধান করেছেন কি?

৮। সফরে নিজ প্রয়োজন মত টাকা-পয়সা নিয়েছেন কি?

৯। মক্কা-শরীফ ও মদীনা শরীফ কোথায় কত দিন থাকবেন তা অবগত হয়ে প্রস্তুত হয়েছেন কি?

উপরোক্ত বিষয় সমূহের সমাধান ও প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক

হজ্জের জন্য গৃহ হতে নির্গমন

যাত্রার সময় গৃহ হতে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে বের হবেন; চিন্তিত ও বিমর্ষ অবস্থায় বের হবেন না। গৃহ হতে বের হওয়ার পূর্বে ও পরে কিছু দান-খয়রাত করবেন এবং ঘরে দুই রাকাআত নামায পড়বেন। মহল্লার মসজিদেও দুই রাকাআত নামায আদায় করবেন। প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখলাস পাঠ করবেন। সালাম ফিরিয়ে আয়াতুল কুরসী ও সূরা কুরাইশ পড়বেন এবং আল্লাহর নিকট সফরে সাহায্য ও সুবিধাদির জন্য প্রার্থনা করবেন। যদি মুখস্থ থাকে, তবে নিম্ন দো'আ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَ اَنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَ الْمَالِ اَللّٰهُمَّ
اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ مَسِيْرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَ التَّقْوٰى وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اَنْ تَطْوِىَ لَنَا الْاَرْضَ وَتُهَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَ تَرْزُقَنَا فِى سَفَرِنَا
هٰذَا السَّلَامَةَ فِى الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ وَ الْبَدَنِ وَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَتُبَلِّغَنَا حَجَّ بَيْتِكَ
الْحَرَامِ وَزِيَارَةَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَ السَّلَامِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًا
وَّلَا بَطَرًا وَّلَا رِيَاءً وَّلَا سُمْعَةً بَلْ خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ
وَقَضَاءً لِفَرْضِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَشَوْقًا اِلٰى
لِقَائِكَ اَللّٰهُمَّ فَتَقَبَّلْ ذَالِكَ وَ صَلِّ عَلٰى اَشْرَفِ عِبَادِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ
وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ اَجْمَعِيْنَ

"আল্লাহুম্মা আনতাস্ সা-হিবু ফিস্সাফারি ওয়াআনতাল্ খালীফাতু ফিল্ আহ্লি ওয়ালমাল। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী মাসীরিনা হা-যাল্ বিররা ওয়াত্তাক্বাওয়া ওয়ামিনাল আমালি মা তুহিব্বু ওয়াতারযা। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা আন্ তাত্ওয়া লানাল-আরযা ওয়াতুহাওয়্যিনা আলাইনাস সাফারা ওয়াতারযুক্বানা ফী সাফারিনা হা-

যাস্ সালামাতা ফিল্ আক্বলি ওয়াদ্‌দ্বীনি ওয়াল বাদানি ওয়ালমালি ওয়ালওলাদি ওয়াতুবাল্লিগুনা হাজ্জা বাইতিকাল্ হারামি ওয়াযিয়ারাতা নাবিয়্যিকা আলাইহ আফ্‌যালুস্ সালাতি ওয়াস্‌সালাম। আল্লাহুম্মা ইন্নী লাম্ আখরুজ্ আশারান্ ওয়াল বাতারান, ওয়াল রিয়াআন্ ওয়ালা সুমআতান্ বাল খারাজ্‌তু ইত্তিকাআ সাখাতিকা ওয়াবতিগাআ মারযাতিকা ওয়াক্বাযাআল্ লিফারযিকা ওয়াইত্তিআল, লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লামা ওয়াশাওকান্ ইলা লিকাইকা। আল্লাহুম্মা ফাতাক্বাব্বাল্ যা-লিকা ওয়াসাল্লি আলা আশরাফি ইবাদিকা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়াআলিহী ওয়াসাহ্‌বিহিত, তাইয়্যিবীনাত্ তা-হিরীনা আজমাঈন।"

যখন সেখান হতে উঠবেন তখন এই দো'আ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اِعْتَصَمْتُ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ مَا اَهَمَّنِيْ وَمَا لَا اَهْتَمُّ
بِهٖ اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِى التَّقْوٰى وَ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ

"আল্লাহুম্মা ইলাইকা তাওয়াজজাহ্‌তু ওয়াবিকা ই'তাসামতু। আল্লাহুম্মা আকফিনী মা আহম্মানী ওয়ামা লা আহ্‌তাম্মু বিহী। আল্লাহুম্মা যাওয়্যিদুনিত্ তাক্ব্‌ওয়া ওয়াগফিরলী যাম্বী।"

ঘরের দরজার নিকটে সূরা ইন্না-আনযালনা পাঠ করবেন। ঘর হতে বের হওয়ার সময় এই দো'আ পাঠ করবেন–

بِسْمِ اللهِ اٰمَنْتُ بِاللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ
التُّكْلَانُ عَلَى اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ
اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

"বিসমিল্লাহি আমানতু বিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিত্ তুকলানু আলাল্লাহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন্ আন্ আদিল্লা আও উদাল্লা আও আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজ্‌হালা আও য়ুজহালা আলাইয়্যা।"

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সবার নিকট হতে যাত্রার প্রাক্কালে ক্ষমা চেয়ে নিবেন, দো'আর প্রার্থনা করবেন এবং বিদায়ী মুসাফাহ্ করবেন। বিদায় হওয়ার সময় এই দো'আ পাঠ করবেন–

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ وَزَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوٰى وَيَسَّرَ
لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ كُنْتَ

"আসতাওদিউল্লাহা দ্বীনাকা ওয়াআমানাতাকা ওয়াআখিরা আমালিকা ওয়াযাওয়্যাদাকাল্লাহুত্ তাক্বওয়া ওয়াইয়াস্‌সারা লাকাল্ খায়রা হাইছু কুনতা।"

এবং যারা বিদায় জানাতে আসবে তারা এর সাথে এই শব্দ কয়টিও যোগ করবেন–

اَللّٰهُمَّ اَطْوِلْهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ

“আল্লাহুম্মা আত্উল্হুল বু’দা ওয়াহাওয়েন আলাইহিস্সাফার।”

যাত্রাকালে হজ্জ যাত্রীকে উপরোক্ত লোকজনদের সাথে দেখা করে যাওয়া উচিত এবং ফিরে আসার পর উপরোক্ত লোকজনদের তার সাথে দেখা করতে আসা উচিত।

যখন সাওয়ারীর উপরে আরোহণ করবেন তখন বিসমিল্লাহ্ বলে প্রথমে ডান পা রাখবেন এবং ডানপাশে বসবেন, অতঃপর সওয়ার হয়ে এই দো’আ পাঠ করবেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ
وَالسَّلَامِ سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُوْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
سُبْحَانَكَ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

“আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী হাদানা লিল-ইসলামি ওয়ামান্না আলাইনা বিমুহাম্মদিন্ আলাইহি আফযালুস্ সালাতি ওয়াস্সালামি। সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্করিনীনা ওয়াইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্কালিবুন। আলহামুদ লিল্লাহি, আলহামদুলিল্লাহি, আলহামদুলিল্লাহি আল্লাহু আকবারু আল্লাহু আকবারু আল্লাহু আকবারু সুবহানাকা ইন্নী যালাম্তু নাফসী ফাগফিরগী। ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনবা ইল্লাহ আনতা।”

যদি কোন উঁচু জায়গায় অথবা পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন, তা হলে বলবেন, ‘আল্লাহু আকবার’। নিম্নভূমিতে অবতরণ করলে বলবেন, ‘সুবহানাল্লাহ্’। বন-জঙ্গলের উপর দিয়ে অতিক্রম করবার সময় বলবেন, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার”।

কোন স্থানে যাত্রা বিরতি করা

যখন ভ্রমণ পথের কোন স্থানে যাত্রা বিরতি করবেন, তখন পড়বেন–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَاَ وَبَرَاَ سَلَامٌ عَلٰى
نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ

“আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তা-ম্মাতি কুল্লিহা মিন্ শাররি মা খালাক্কা ওয়াযারাআ ওয়াবারাআ। সালামুন্ আলা নূহিন্ ফিল্ আ-লামীন্।”

ইনশাআল্লাহ্ ঐ স্থানে কোন কিছু অনিষ্ট করতে পারবে না। যখন রাত হবে তখন এই দো’আ পড়বেন–

يَـاأَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّـكِ اللهُ أَعُوْذُ بِـاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَ شَرِّ مَا خُلِقَ فِـيْكِ وَشَـرِّ
مَـا يَدُبُّ عَلَيْكِ وَأَعُوْذُ بِـاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَّ أَسْوَدَ وَمِنَ الْحَـيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ مِنْ
شَرِّ سَاكِنِى الْبَلَدِ وَ مِنْ وَّالِدٍ وَّمَا وَلَدَ

"ইয়া আরযু রাব্বী ওয়ারাব্বুকিল্লাহু আঊযুবিল্লাহি মিন্ শাররিকি ওয়াশাররি মা খুলিক্বা ফীকি ওয়াশার্‌রি মা ইয়াদুব্বু আলাইকি ওয়াআঊযু বিল্লাহি মিন্ আসাদিন্ ওয়াআসওয়াদা ওয়ামিনাল হাইয়্যাতি ওয়ালআক্বারাবি ওয়ামিন শাররি সা-কিনিল বালাদি ওয়ামিন ওয়ালিদিন ওয়ামা ওলাদা।"

ভোর বেলা পড়বেন–

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَ حُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَ أَفْضِلْ عَلَيْنَا
عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ

"সামিআ সা-মিউন্ বিহামদিল্লাহি ওয়াহুসনি বালাইহ আলাইনা। রাব্বানা সা-হিবনা ওয়াআফযিল আলাইনা আ-ইযাম্বিল্লাহি মিনান্ নারি।"

যখন জাহাজ বা বিমান ছাড়ে তখন এই দো'আ পড়বেন–

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَ مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَّ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ
وَ الْأَرْضُ جَمِيْعًـا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ
وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

"বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়ামুরসা-হা ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর্ রাহীম। ওয়ামা ক্বাদারুল্লাহ ক্বাদরিহি ওয়ালআরযু জামীআন ক্বাবযাতুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি ওয়াস্‌সামাওয়াতু মাতভিয়্যাতুম বিইয়ামীনিহি সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আম্মা য়ুশরিকুন।"

জেদ্দা শহর দৃষ্টিগোচর হইবে তখন এই দো'আ পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ
وَ رَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ
الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا

"আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতিস্ সাবয়ি ওয়ামা আযলাল্না ওয়ারাব্বাল আরযীনাস্ সাবয়ি ওয়ামা আক্কলাল্না ওয়ারাব্বাশ্ শায়াতীনি ওয়ামা আযলাললনা

ওয়ারাব্বার রিয়াহি ওয়ামা যারাইনা ফাইন্না নাসআলুকা খাইরা হা-যিহিল ক্কারইয়াতি ওয়াখাইরা আহলিহা ওয়ানাঊযু বিকা মিন্ শাররিহা ওয়াশাররি মা ফীহা।"

যখন জেদ্দা নগরীতে প্রবেশ করবেন, তখন 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহা" তিনবার পাঠ করে নিম্নোক্ত দো'আটি পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا

"আল্লাহুম্মার যুক্বনা জানাহা ওয়াহাব্বিব্না ইলা আহলিহা ওয়াহাব্বিব্ সা-লিহী আহলিহা ইলাইনা।"

যখন মক্কা শরীফ দৃষ্টিগোচর হবে তখন এই দো'আ পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِيْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالًا

"আল্লাহুম্মায্ আল্লি বিহা ক্কারারাওয়ার্ যুকনি ফিহা রিযক্কান হালালা।"

অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে তালবিয়াহ্ পাঠ করতে করতে পরিপূর্ণ আদব ও সম্মান প্রদর্শন করে মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং প্রবেশ করবার সময় এই দো'আ পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ جِئْتُ لِاُؤَدِّيَ فَرْضَكَ وَ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ اَلْتَمِسُ رِضَاكَ مُتَّبِعًا لِاَمْرِكَ رَاضِيًا بِقَضَائِكَ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّيْنَ اِلَيْكَ الْمُشْفِقِيْنَ مِنْ عَذَابِكَ الْخَائِفِيْنَ مِنْ عِقَابِكَ اَنْ تَسْتَقْبِلَنِي الْيَوْمَ بِعَفْوِكَ وَ تَحْفَظَنِيْ بِرَحْمَتِكَ وَ تَجَاوَزَ عَنِّيْ بِمَغْفِرَتِكَ وَ تُعِيْنَنِيْ عَلٰى اَدَاءِ فَرْضِكَ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اَدْخِلْنِيْ فِيْهَا وَ اَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বি ওয়া আনা আ'বদুকা যি'তু লিউআদ্দিআ ফারাদাকা ওয়া আতলুবু রাহমাতাকা ওয়া আলতামিসু রিদাকা মুত্তাবিআন লিআমরিকা রাদ্বি'য়ান বিক্কাদ্বাইকা আস্আলুকা মাস্আলাতাল্ মুদ্বতাররি'না ইলাইকাল মুশফিকি'না মিন্ আজাবিকাল্ খা-ইফিনা মিন্ আক্কাবিকা আন্ তাসতাক্কবিলানিল ইয়াওমা বিআ'ফয়্যিকা ওয়া তাহফাযানি বিরাহমাতিকা ওয়া তাযাওয়াজা আ'ন্নি বিমাগফিরাতিকা ওয়া তু'ই-নানি আ'লা আদা-ই ফারিদ্বাকা আল্লাহুম্মাফ্ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা ওয়া আদ্বখিলনি ফিহা ওয়া আ-ইযনি মিনাস্সায়তানির্ রাযিম।"

اَسْئَلُكَ مِمَّا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

"রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্-দুনইয়া হাসানাতান ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতান্ ওয়াক্বিনা আযাবাননারি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিম্মা সাআলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা

মুহাম্মাদুন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়াআউযুবিকা মিন শাররি মাসতাআযা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।"

হরম সীমানার মধ্যে পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَ حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَ دَمِىْ وَ عَظْمِىْ وَ
بَشَرِىْ عَلَى النَّارِ اَللّٰهُمَّ اٰمِنِّىْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ
اَوْلِيَاءِكَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَ تُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"আল্লাহুম্মা ইন্না হা-যা হারামুকা ওয়াহারামু রাসূলিকা ফাহাররিম লাহমী ওয়াদামী ওয়াআযমী ওয়াবাশারী আলান্ নারি। আল্লাহুম্মা আ-মিননী মিন্ আযাবিকা ইয়াওমা তাব'আসু ইবাদাকা ওয়াজআলনী মিন্ আওলিয়াইকা ওয়াআহলি তা'আতিকা ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়্যাবুর্ রাহীম।"

তারপর দরূদ শরীফ ও তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন এবং আল্লাহ্পাকের হামদও সানা পড়বেন; আর আল্লাহ্ আপনাকে যে এই পরম সৌভাগ্য দান করেছেন, তার জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন।

মসজিদে হরমে প্রবেশের দো'আ–

بِسْمِ اللهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ
وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"বিসমিল্লাহি ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহি রাব্বিগফিরলী যুনুবী ওয়াফ্তাহ্লী আবওয়াবা রাহমাতিকা।"

মসজিদে হারামে প্রবেশ করার পর যখন বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে চোখ পড়বে, তখন তিন বার "আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পাঠ করবেন এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে এই দো'আ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّ مَهَابَةً وَّ زِدْ مَنْ شَرَّفَهٗ وَ
كَرَّمَهٗ مِمَّنْ حَجَّهٗ وَاعْتَمَرَهٗ تَشْرِيْفًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّ بِرًّا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ
وَ مِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

"আল্লাহুম্মা যিদ্ হা-যাল, বাইতা তাশরীফান ওয়াতা'যীমান ওয়াতাকরীমান্ ওয়া মাহাবাতান্ ওয়াযিদ্ মান্ শাররাফাহু ওয়াকাররামাহু মিম্মান্ হাজ্জাহু ওয়াঅতামারাহু তাশরীফান্ ওয়াতাকরীমান্ ওয়াতা'যীমান্ ওয়াবিররান্। আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালামু ওয়ামিন্কাস্ সালামু ফাহাইয়্যিনা রাব্বানা বিস্সালামি।"

অতঃপর দরূদ শরীফ পাঠ করবেন এবং যে দো'আ ইচ্ছা চাইবেন। এই সময়ের দো'আ কবুল হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ দো'আ হলো আল্লাহ্তা'য়ালার কাছে বিনা হিসাবে জান্নাত লাভের প্রার্থনা করা এবং ঐ সময় এই দো'আটিও পাঠ করা মুস্তাহাব–

أَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَ الْفَقْرِ وَ مِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ

"আঊযু বিরাব্বিল্ বাইতি মিনাদ্ দাইনি ওয়ালফাক্করি ওয়ামিন্ যীক্বিস্ সাদরি ওয়াআ'যাবিল কাবরি।"

দো'আ মুনাজাত শেষ করে তাওয়াফের স্থানে (মাতাফে) নেমে পড়ুন। বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে হাজরে আসওয়াদ ডানে রেখে তাওয়াফের নিয়্যাত করুন। উমরা অথবা যে প্রকার হজ্জ আদায়ের নিয়্যাত করেছেন সে বিধান অনুযায়ী করণীয় সকল আমল সম্পন্ন করে উমরা বা হজ্জ পালন করুন।

কাফেলার নেতা নির্বাচন

কয়েকজন একত্রিত হয়ে সফর করলে দলের মধ্য থেকে কোন দীনদার, এলেমদার, সমজদার, হুশিয়ার, অভিজ্ঞ ও নিরলস ব্যক্তিকে দলনেতা নিযুক্ত করা উচিত। দলের সকলেই তাঁর আনুগত্য করবে।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সম্পর্কে এরশাদ করেন– "ইযা-কা-না ছালা-ছাতুন ফী-সাফারিন ফালইউ মারু-আহাদুহুম।"

অর্থ ঃ তিন ব্যক্তি মিলে সফর করলে তারা যেন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নিযুক্ত করে নেয়। –আবু দাউদ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছ থেকে যখনই কোন কাফেলা রওয়ানা হত, তিনি তাদের একজনকে নেতা বানিয়ে দিতেন।

যে ব্যক্তি নেতা হবে, তাঁর কর্তব্য হবে সঙ্গীদের অবস্থা দেখাশুনা করা, তাদের আসবাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, তাদের আরাম ও সুখ-শান্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন– "সাইয়্যেদুল ক্বাওমি খাদিহুম।" অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর নেতা (সফরে) জনগোষ্ঠীর খাদেম হয়ে থাকে। –ফাজায়েলে হজ্জ

হজ্জের সফরে আচার-আচরণ

হজ্জ যাত্রী আল্লাহ্ তা'য়ালার মেহমান এবং সকল হজ্জ যাত্রীর গন্তব্যস্থল হচ্ছে আল্লাহ্ তা'য়ালার ঘর বা বাইতুল্লাহ। সুতরাং এ সফর অত্যন্ত পবিত্র। প্রত্যেক হজ্জ যাত্রীর নিম্নে বর্ণিত আচার-আচরণ পালন করা উচিত–

১। হজ্জে যাত্রার সময় গৃহ হতে শান্ত মনে বের হওয়া উচিত। চিন্তিত অবস্থায় বের হওয়া অনুচিত। এ পরিমাণ টাকা-পয়সা সঙ্গে নেয়া দরকার যেন নিজের

আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহের পর ফকীর মিসকিনকে কিছু দান-সদকা করা যায়। মনে মনে এ ধারণা করতে হবে যে, “আমি আল্লাহর আমন্ত্রণে সাড়া দিতে যাচ্ছি। হজ্জের এ সফরে কারো সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবো না এবং কাউকে ঝগড়ায় লিপ্ত করবো না এবং তাকওয়া-পরহেজগারী এখতিয়ার করবো।”

২। হজ্জ অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। যতদূর সম্ভব নিজেকে তৈরী রাখুন। পরিবার বর্গকে তাকওয়া এখতিয়ার ও পূর্ণ শরীয়তের পাবন্দ হওয়ার জন্য উপদেশ দিন।

৩। বিছানাপত্র খুব হাল্কা রাখুন। আপনার মালপত্র আপনাকেই বহন করতে হবে। আপনার সঙ্গী-সাথী সবাই হাজী, সকলেই আল্লাহর ঘরের মেহমান সবাই সম্মানিত ব্যক্তি।

৪। সঙ্গী-সাথীদেরকে সম্মানের চোখে দেখা উচিত এবং তাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটিকে নিজগুণে ক্ষমা করে দেয়া উচিত। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন।

তিরমীযী শরীফে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন– মুমিন ব্যক্তি কখনও ঠাট্টা বিদ্রূপকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী এবং অসদাচারী হতে পারে না।

৫। নিজেকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন না রেখে এবং সকলের সাথে মিলে-মিশে থাকা উচিত। সঙ্গী-সাথীদের অসুখ-বিসুখে তাদের পাশে দাঁড়ানো দরকার। প্রয়োজনে মেডিক্যাল মিশনে বা ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া উচিত।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– কোন মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ্ তা'য়ালা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ্য অবস্থায় সে যে সব সৎকর্ম করত, সেগুলো তাঁর আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক।

৬। সঙ্গী-সাথীদের আক্রমণাত্মক এবং ক্রোধান্বিত আচার-আচরণ ধৈর্যের সাথে এড়িয়ে চলা উচিত।

৭। বিনা প্রয়োজনে কোন কথা বলা ঠিক নয়। মুখ যতদূর সম্ভব বন্ধ রাখা দরকার। এমনি কোন অনর্থক কথার মাঝে পড়ে গেলে ভদ্রভাবে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

আল্লাহ্ তা'য়ালার বলেন–“আর যখন তারা কোন প্রকার অবাঞ্ছিত কথা শোনে, তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং (শান্তভাবে) বলে দেয়, আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি 'সালাম'। আমরা মূর্খদের সাথে জড়িত হতে চাই না।”– সূরা কাসাস, আয়াত- ৫৫

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তাঁর কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে।

ইমাম নববী (রঃ) বলেন, যখন কথা বলা ও চুপ থাকা উভয়ই উপকারী কল্যাণের দিক থেকে সমান, তখন সুন্নাত তরীকা হচ্ছে চুপ থাকা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু মূসা (রাঃ) বলেন– আমি জিজ্ঞাসা করলাম,হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বললেন– যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন– যে জিহ্বা বা বাকশক্তি এবং দু'পায়ের মধ্যবর্তী জিনিসের (লজ্জাস্থান) নিশ্চয়তা দিবে, আমি তার বেহেশত লাভের জন্য যামিন হব।

সংযমের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে। কথা দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের রুচি বা ব্যক্তিত্ব কেমন তা তার কথা শুনেই বোঝা যায়; কথা শুনে আন্দাজ করা যায় তার মন-মানসিকতা বা মেজাজ কোন স্তরের।

অবসর সময়ে মুশাহাদা এবং মুরাকাবা করবেন। অর্থাৎ অধিকাংশ সময় এই ধ্যানে নিমগ্ন থাকবেন যে, আমি আমার মালিকের সম্মুখে উপস্থিত আছি। আমার সমস্ত কথাবার্তা, কর্মকান্ড এবং আচার-আচরণ ও অবস্থার উপর তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। একা নিরবে বসে সমস্ত দিনের আমল স্মরণ করে এরূপ ধ্যান করবেন যে, এখন আমার হিসাব নিকাশ হচ্ছে আর আমি উত্তর দিচ্ছি।

৮। পথ খরচের মধ্যে কেউ কারো সাথে শরীক হবেন না। প্রত্যেকেই নিজের খরচ নিজে বহন করবেন। একত্রে খরচ করলে হিসাব পরিষ্কার রাখবেন।

৯। টাকা-পয়সা খুব সাবধানে রাখবেন, কারণ, বিদেশে টাকা-পয়সা খুবই প্রয়োজন।

১০। প্রত্যেক হজ্জ যাত্রীকে নিজ নিজ কাজে মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। হজ্জব্রত পালন শেষ হওয়ার পূর্বে বেশি কিছু কেনাকাটা করা উচিত নহে।

১১। এদিক-সেদিক দৃষ্টি না দিয়ে সতর্কতার সাথে চলাফেরা করা উচিত। নারী-পুরুষের উভয়ের উচিত ভীড়ের মাঝে নিজের দৃষ্টিকে সংযত করে নিজের দিকে রাখা। কারণ, অতি সহজেই চোখের পলকে চোখের গোনাহ্ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন আমাদের সকলকে চোখের এবং জবানের গোনাহ্ থেকে রক্ষা করেন। আমিন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জের আহ্কাম (ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত)

হজ্জের ফরয সমূহ ঃ

১। ইহরাম বাঁধা (আনুষ্ঠানিকভাবে হজ্জের নিয়্যত করা)।

২। আরাফাতে অবস্থান (উকূফ)ঃ ৯ই যিলহজ্জের সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে ১০ই যিলহজ্জের ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় কিছুক্ষণের জন্য হলেও।

৩। তাওয়াফে যিয়ারত, ১০ই যিলহজ্জের ভোর থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন দিন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা।

এ তিনটি ফরযের একটি যদি ছুটে যায় তাহলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছরে তার কাযা আদায় করা ফরয হয়ে যাবে।

হজ্জের ওয়াজিব সমূহ ঃ

১। মীকাতের সীমানার আগেই ইহরাম বাঁধা।

২। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে উকূফ করা।

৩। কিরান বা তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তির কুরবানী আদায় করা এবং তা রমী বা শয়তানকে কংকর মারা ও মাথা মুন্ডানোর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা।

৪। সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাঈ করা এবং সাফা পাহাড় থেকে সাঈ আরম্ভ করা।

৫। মুযদালিফায় উকূফ করা।

৬। তাওয়াফে যিয়ারত আইয়্যামে নহরের মধ্যে সম্পাদন করা।

৭। রমী বা শয়তানকে কংকর মারা।

৮। মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা। আগে রমী ও পরে মাথা মুন্ডানো।

৯। মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য– তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তাওয়াফ করা।

এগুলোর কোন একটিও ছুটে গেলে হজ্জ হয়ে যাবে তবে দম দিতে হবে। অর্থাৎ কাফ্ফারা স্বরূপ কুরবানী দিতে হবে।

এছাড়া হজ্জের অন্যান্য কার্যাদি সুন্নাত, মুস্তাহাব বা হজ্জের আদব পর্যায়ের।

হজ্জের সুন্নাত সমূহ ঃ

১। মীকাতের বাইরের লোকদের মধ্যে যারা ইফরাদ বা কিরান হজ্জ করেন তাদের জন্যে তাওয়াফে কুদূম করা।

২। তাওয়াফে কুদূমে রমল করা। এ তাওয়াফে রমল না করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারত অথবা বিদায়ী তাওয়াফে তা করে নিতে হবে।

৩। ইমামের জন্য তিন স্থানে খুতবা প্রদান করা। অর্থাৎ ৭ই যিলহজ্জ মক্কা মুকাররমায়, ৮ই যিলহজ্জ মিনায় এবং ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের ময়াদনে।

৪। ৮ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান।

৫। ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় যাওয়া।

৬। আরাফাতের ময়দান থেকে ইমামের রওনা হওয়ার পর রওনা হওয়া।

৭। আরাফাত থেকে ফেরার পথে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।

৮। আরাফাতে গোসল করা।

৯। মিনার কাজ-কর্ম সম্পাদনকালে মিনায় রাত্রি যাপন করা।

১০। মিনা থেকে ফেরার পথে মুহাস্সাব নামক স্থানে স্বল্পক্ষনের জন্যে হলেও উকূফ করা।

হরম

মক্কা মুকাররমার চারদিকে নির্দিষ্ট সীমানায় হরমের চিহ্ন নির্মিত রয়েছে। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে ঐ স্থানসমূহের পরিচয় অবগত করিয়েছিলেন এবং সে স্থানগুলি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। অতঃপর হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই চিহ্নসমূহ নির্মাণ করেন। পরে হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) প্রমুখ নিজ নিজ খিলাফত আমলে সেগুলি নতুন করে তৈরি করেন। জিদ্দার দিকে মক্কা মুকাররমা হতে দশ মাইলের মাথায় শুমাইসিয়্যাহ (যেখানে হোদায়বিয়ার সন্ধি হয়েছিল)-এর সন্নিকটে হরমের চিহ্ন স্বরূপ মিনারা নির্মিত রয়েছে এবং পবিত্র মদীনার দিকে তানঈম নামক স্থানে– যাহা মক্কা হতে ৩ মাইল, আর ইয়ামেনের দিকে 'ইযাআতে লবন' পর্যন্ত ৭ মাইল, ইরাকের দিকেও ৭ মাইল, জারানার দিক হতে ৯ মাইল এবং তায়েফের দিকে আরাফাত পর্যন্ত ৭ মাইল পর্যন্ত 'হরম'। এই সীমানার ভিতরে কোন স্থলজপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা, ধরা, তাড়ানো, বৃক্ষলতাদি অথবা ঘাস কর্তন ইত্যাদি হারাম। এই কারণেই নির্ধারিত সেই এলাকাকে 'হরম' বলা হয়।

মীকাত

মীকাত বলা হয় নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থানকে। প্রচলিত অর্থে মীকাত হলো সেই স্থান যেখানে পৌঁছার পর হাজীগণ হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধেন।

মীকাতের প্রকারভেদ ঃ

মীকাত দুই প্রকার। যথা– মীকাতে যামামী ও মীকাতে মাকানী।

১। মীকাতে যামামী হলো হজ্জের মাস সমূহ। যথা– শাওয়াল, যিলকাদ, যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০দিন।

২। মীকাতে মাকানী হলো ঐসব স্থান যেখান থেকে ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব।

মীকাতে মাকানী তিন প্রকার। যথা–

১। মীকাতের বাইরে বসবাসকারীদের মীকাত।

২। মীকাতের ভিতরে অথচ হেরেমের বাইরে বসবাসকারীদের মীকাত।

৩। আহলে হরম অর্থাৎ মক্কা মুকাররমার অধিবাসী এবং হরমের চৌহদ্দীতে বসবাসকারীদের মীকাত।

হজ্জের মীকাত বিভিন্ন দেশের হাজীদের জন্যে বিভিন্ন। তাই এক এক দিক থেকে আগত হাজীদেরকে এক একটি মীকাতে পৌঁছে ইহরাম বাঁধতে হয়।

মীকাত সীমার বাইরের লোকদের জন্য মীকাত পাঁচটি ঃ

১। যুল হুলায়ফা বা বীরে আলী– মদীনাবাসী ও মদীনার পথে হজ্জে আগমনকারীদের জন্য।

২। ইয়ালামলাম– ইয়ামনবাসী এবং বাংলাদেশ, পাক-ভারত উপমহাদেশ তথা প্রাচ্য থেকে সাগর পথে আগত হজ্জযাত্রীদের জন্যে।

৩। জুহ্ফা– সিরিয়াবাসীদের এবং সেদিক থেকে আগতদের জন্য।

৪। কারন্–নজ্দবাসী এবং নজদের দিক থেকে আগমনকারীদের জন্যে।

৫। যাতে ইর্ক– ইরাকবাসীদের এবং সেদিক থেকে আগমনকারীদের জন্য।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসে এই মীকাত সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। (হিদায়া ঃ কিতাবুল হাজ্জ)।

মীকাতের ভিতরে অথচ 'হরম' এলাকার বাইরে বসবাসকারীদের জন্য সমগ্র 'হিল' এলাকাই মীকাত স্বরূপ। অর্থাৎ 'হরম' এলাকার চৌহদ্দীর বাইরের যে কোন স্থান থেকে তাদের ইহরাম বাঁধা চলে। **তবে তাদের নিজেদের ঘর থেকে ইহরাম বাঁধাই উত্তম।** এমন এলাকার লোকদের প্রত্যেকবারই হরম প্রবেশের জন্যে ইহরাম বাঁধা জরুরী নয়। কেবল হজ্জ ও উমরার জন্যেই তাদের ইহ্রাম বাঁধা জরুরী, আর যারা হরম শরীফের সীমানার মধ্যেই অবস্থান করেন তারা হজ্জের জন্যে হরম এলাকার যে কোন স্থানেই ইহ্রাম বাঁধতে পারেন। তবে উমরার জন্য তাঁদেরকে হরম সীমার বাইরে হিল এলাকার যে কোন স্থান থেকে ইহ্রাম বেঁধে আসতে হবে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এবং তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-কে উমরার জন্যে 'তানঈম' থেকে ইহরাম বাঁধতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মীকাতের বাইরে বসবাসকারী হজ্জ, উমরাহ্ বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে হরম শরীফে গেলে তার জন্য মীকাত থেকে ইহ্রাম বেঁধে আসা ওয়াজিব।

ইয়ালাম্লাম্ পাহাড়

রাস্তায় ইয়ালাম্লাম্ পর্যন্ত হাজী সাহেবদের জন্য হজ্জের কোন জরুরী হুকুম নাই। অবশ্য ইয়ালাম্লাম্ হতেই হজ্জের আহকাম শুরু হয়ে যায়। ইয়ালাম্লাম্ মক্কা হতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। ইদানিং সা'দিয়া নামে অভিহিত করা হয়। পাক-ভারত-বাংলা উপ মহাদেশসহ দূর-প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের যে সব লোক পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে এটার উপর দিয়ে অথবা এটার সীমারেখা দিয়ে অতিক্রম করেন, তাদের জন্য এটা হতে অথবা এটার সীমারেখা হতে ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব। এটা এতদ্দেশীয় লোকজনদের মীকাত।

ইহ্রাম ও হজ্জের নিয়্যত

ইহরাম ঃ

নামাযের উদ্দেশ্যে যেমন তাহরীমা বাঁধা হয়, হজ্জের জন্য ঠিক তেমনি ইহরাম বাঁধা হয়। এটি হজ্জের আনুষ্ঠানিক নিয়্যত। তাহরীমা ও ইহরাম একই ধাতু থেকে নির্গত একই অর্থবোধক শব্দ। এ দু'টি শব্দের অর্থই হচ্ছে হারাম করা। নামাযী যেমন তার নিয়্যতের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থার হালাল অনেক ব্যাপারই নিজের জন্য হারাম করে নেয়, ঠিক তেমনি একজন হজ্জযাত্রীও ইহ্রাম বাঁধার মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় যা তার জন্য বৈধ, সেগুলো হজ্জ পালনকালে বা ইহরাম অবস্থায় নিজের জন্য হারাম করে নেন।

ইহরাম বাঁধার পূর্বেই গোঁফ, বগল ও নাভীর নিচের ক্ষৌর কার্যাদি সম্পন্ন করে, নখ কেটে, গোসল করে পাক-সাফ হতে হয়। এমন কি ঋতুবতী মহিলাদেরও এ সময় গোসল করা মুস্তাহাব। (হিদায়া) ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইহরাম বাঁধার পূর্বে তাঁকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

গোসল করা সম্ভব না হলে উযূ করে নিলেও হবে। অনুরূপ চুল কাটার দরকার না থাকলে চিরুনী করে চুল বিন্যস্ত করে নিতে হয়। তারপর দুই রাকা'আত নামায ইহরামের নিয়্যতে পড়তে হয়। এতে প্রথম রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ইখ্লাস মিলানো মুস্তাহাব। ইহরামের দুই প্রস্ত সেলাই বিহীন কাপড় একটি লুঙ্গির মত এবং অপরটি চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে নিতে হবে। কাপড়গুলো নতুন হওয়া উত্তম। (হিদায়া)

কিবলামুখী হয়ে বসা অবস্থায় ইহরামের কাপড় দু'টি পরতে হয় এবং ইফরাদ, তামাত্তু' বা ক্বিরান অথবা উমরাহ্ করার জন্য এ ইহরাম বাঁধা হচ্ছে, তার নিয়্যত করতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহর কাছে এ দু'আও করতে হয় যে, তিনি তা পালন করা সহজ করে দেন এবং কবুল করেন। মুখে নিয়্যতের কথা বলা উত্তম। নিয়্যতের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ করলেই ইহরাম সম্পন্ন হয়।

তামাত্তু হজ্জের নিয়্যাত ঃ

তামাত্তু হজ্জ আদালকারী প্রথমে উমরার জন্যে এবং পরে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবেন।

উমরার নিয়্যাত ঃ

উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলে নিয়্যাতে বলতে হবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ

"ইয়া আল্লাহ! আমি উমরা পালনের নিয়্যত করছি, উহা আমার জন্য সহজ করো এবং কবুল করো।"

একাধিক উমরার ক্ষেত্রে হরম শরীফ থেকে নিকটবর্তী মীকাত হচ্ছে তানঈম। হরম শরীফের বাইরে অন্যত্র থেকেও ইহরাম বাঁধা চলে। তবে মক্কা শরীফের অধিবাসীগণ বা বহিরাগত হাজীগণ সাধারণত তানঈমে গিয়েই ইহরাম বেঁধে আসেন। অন্যের নামে উমরা বা হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধালে 'মিন্নি' না বলে যার নামে উমরা বা হজ্জ করছেন তার নাম বলতে হবে।

তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীর হজ্জের নিয়্যত ঃ

যখন হজ্জের সময় আসবে তখন হজ্জের নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধে হজ্জ পালন করবেন। হজ্জের নিয়্যাত–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

"হে আল্লাহ! আমি হজ্জের নিয়্যত করলাম, তুমি তা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করো।"

ইফরাদ হজ্জের নিয়্যাত ঃ

যদি ইহরাম ইফরাদ হজ্জের জন্য হয় তাহলে তিনি বলবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

"হে আল্লাহ! আমি হজ্জের নিয়্যত করলাম, তুমি তা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করো।"

ক্বিরান হজ্জের নিয়্যাত ঃ

যদি ক্বিরান হজ্জ হয় অর্থাৎ হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে নিয়্যত করা হয় তাহলে হজ্জযাত্রী বলবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ

"হে আল্লাহ! আমি হজ্জ ও উমরার নিয়্যত করছি, তুমি আমার জন্য এগুলো সহজসাধ্য করে দাও এবং কবুল করো।"

ইহরামের গোসলের মাসআলা সমূহ ঃ

১। ইহরামের জন্য গোসল করা সুন্নত। এই গোসল শুধু পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে করতে হয়। সুতরাং হায়েয বা নেফাস পালনরতা মহিলা এবং শিশুদের জন্যও এই গোসল মুস্তাহাব।

২। যদি ইহরামের জন্য গোসল করে থাকেন এবং ইহরাম বাঁধার পূর্বেই ওযু নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে গোসলের ফযীলত অর্জিত হবে না। কোন কোন আলেমের মতে গোসলের ফযীলত হাসেল হয়ে যাবে।

৩। যদি গোসল করতে না পারেন, তা হলে ওযু করে নিবেন। তবে ওযু-গোসল ছাড়াও ইহরাম বাঁধা জায়েয। **কিন্তু মাকরূহ হবে।**

ইহরামের লেবাসের মাসআলা সমূহ ঃ

১। ইহরামের চাঁদর এমন লম্বা হতে হবে যে, সহজে ডান বগলের নীচের দিক হতে পেচিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখা যায়। আর লুঙ্গি এই পরিমাণ হতে হবে যাতে ছতর ঠিকমত আবৃত হয়।

২। ইহরামের অবস্থায় কোর্তা, পায়জামা, আচকান, সদরিয়া, গেঞ্জি প্রভৃতি পরিধান করা নিষিদ্ধ। শরীরের মাপে সেলাই করা কাপড় ইহরাম অবস্থায় পরিধান করা জায়েয নয়।

৩। যদি চাঁদর অথবা লুঙ্গি মাঝখান দিয়ে সেলাই করা হয়, তবে সেটি ব্যবহার করা জায়েয। কিন্তু ইহরামের কোন কাপড় সেলাইযুক্ত না হওয়াই উত্তম।

৪। ইহরামের কাপড় সাদা হওয়া উত্তম।

৫। ইহরামের জন্য মাত্র একটি কাপড়ও যথেষ্ট এবং দুই এর অধিক কাপড়ও জায়েয। রঙিন কাপড় ব্যবহারেরও অনুমতি রয়েছে, কিন্তু তা যেন কুসুম অথবা যাফরান দ্বারা রঞ্জিত না হয়।

৬। ইহরাম অবস্থায় কম্বল, লেপ, কাঁথা, শাল ইত্যাদি গায়ে দেয়া জায়েয।

ইহরামের নামাযের মাসআলা সমূহ ঃ

১। মাকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত যে কোন সময় ইহরামের নিয়্যাতে দুই রাকাআত নামায আদায় করা সুন্নত।

২। যে মীকাত হতে ইহরাম বাঁধবেন, সেখানে যদি কোন মসজিদ থাকে, তবে ঐ মসজিদে নামায আদায় করে ইহরাম বাঁধা মুস্তাহাব।

৩। নামায ছাড়াও ইহরাম জায়েয, কিন্তু মাকরূহ্। তবে যদি ইহরাম বাঁধার সময় মাকরূহ্ ওয়াক্ত থাকে, তা হলে বিনা নামাযে ইহরাম বেঁধে নেওয়া মাকরূহ্ নয়।

৪। যেহেতু হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় মহিলাদের জন্য নামায পড়া নিষিদ্ধ, তাই তারা ওযু-গোসল করে কেবলামুখী হয়ে বসবেন এবং ইহরামের নিয়তে তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন; কিন্তু নামায পড়বেন না।

৫। ইহরামের উদ্দেশ্যে যে নামায আদায় করা হয়, তা মস্তক আবৃত করে পড়তে হয় এবং নামাযের মধ্যে ইযতেবা (অর্থাৎ চাঁদর ডান বগলের নীচের দিক হইতে পেচিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখা) করতে হবে না। শুধু তাওয়াফের মধ্যেই ইযতেবা করতে হয়। যতদিন ইহরাম অবস্থায় থাকবেন, ততদিন যাবতীয় নামাযই অনাবৃত মস্তকে আদায় করবেন। ইহরাম অবস্থায় নামাযের মধ্যে মস্তক আবৃত করা নিষিদ্ধ।

তালবিয়া

ইহরামকারীর ইহরাম বাঁধার সাথে সাথেই সশব্দে নিম্নের বাক্য ঘোষণা দিতে হয়, একে তালবিয়া বলে।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

"লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান, নি'মাতা লাকা ওয়াল্ মুলক্, লা-শারীকা লাক।"

"হাযির হে আল্লাহ, তোমার সমীপে হাযির, আমি হাযির, তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত এবং রাজত্ব তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই।"

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, "যখন কোন মুমিন বান্দাহ্ তালবিয়া পাঠ করে, তখন তার ডানে-বায়ে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি যেমন- গাছ, পাথর ইত্যাদি সবাই তার সাথে "লাব্বাইক" বলে। এমন কি এদিক, ওদিকের সমস্ত জমিনেই তা বিস্তৃত হয়ে যায়।"

তারপর দরূদ শরীফ পাঠ করে নিজের ইচ্ছে মতো দু'আ করবেন। ইহরাম বাঁধার পর এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ النَّارِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকা রেদ্বাকা ওয়াল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিন্ গাদ্বাবিকা ওয়ান্নার।"

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের আশা করছি এবং তোমার অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।"

তালবিয়া পাঠের সময় ঃ

প্রত্যেক নামাজের পর; বেতেরের; প্রত্যেক নফল ও সুন্নাত নামাজের পর; উঠতে বসতে, খালি পায় চলতে ও ছওয়ার হতে নামতে, সকাল-বিকাল সব সময় লাব্বাইকা বলবে। ঘুম থেকে জাগতে; রাস্তার মোর ফিরতে; তারকা উঠতে, তারকা ডুবতে, লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও আলাদা হতে এবং লোকের হুজ্জুমের (লোকের ভিরের) সময় পড়বে। কেউ লাব্বাইকা বললে তার সাথে কেউ বলবে না; বরং প্রত্যেকে পৃথক পৃথক বলবে। এটা উচ্চস্বরে বলা মোস্তাহাব কারণ, যারা শ্রবণ করবে তারা সাক্ষী দিবে। গলা ফেটে যায় এমন জোরে বলবে না এবং যখন এটা বলবে তিন বার বলবে। প্রথম পাথর মারার সময় হতে লাব্বাইকা বলা বন্ধ করতে হবে।

মাসআলা ঃ

১। তালবিয়াহ্ মুখে উচ্চারণ করা শর্ত। যদি শুধু মনে মনে বলেন, তবে তা যথেষ্ট হবে না। ফরয এবং নফল নামাযের পরে তালবিয়াহ্ পাঠ করা উচিত।

২। ইহরাম বাঁধবার সময় তালবিয়াহ্ অথবা অন্য কোন প্রকার যিকির একবার পাঠ করা ফরয এবং তাহা একাধিকবার পাঠ করা সুন্নত। যখন তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন তখন তিন বারই পাঠ করবেন।

৩। তালবিয়াহ্ পাঠের মাঝখানে কোন কথা বলবেন না। তালবিয়াহ্ পাঠরত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া মাকরূহ্।

৪। ১০ই যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়াহ্ পাঠ শেষ হয়ে যায়। অবশিষ্ট দিনগুলিতে শুধু তাকবীর বলতে হয়। আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ কোরবানীর ঈদের পরবর্তী ৩ দিন তাকবীর বলবেন।

৫। অধিক পরিমাণে তালবিয়াহ্ পাঠ করা মুস্তাহাব। তালবিয়াহ্ পাঠের সময় স্বর উঁচু করা সুন্নত। কিন্তু সেজন্য এত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করবেন না যার দরুন নিজের অথবা অন্য নামাযী ও ঘুমন্ত ব্যক্তির অসুবিধা হতে পারে। মসজিদে হারাম, মিনা, আরাফাত এবং মুযদালিফায় তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন। কিন্তু মসজিদের ভিতরে জোরে পাঠ করবেন না। তাওয়াফ ও সাঈ পালনের সময় তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন না।

৬। তালবিয়াহ্ শব্দের উপরে আরো কিছু শব্দ বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব। কিন্তু মাঝখানে বাড়াবেন না; বরং শেষের দিকে বাড়াবেন। এই শব্দগুলো বাড়াতে পারেন–

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَى إِلَيْكَ অথবা لَبَّيْكَ إِلَهَ الْخَلْقِ لَبَّيْكَ

৭। মহিলাদের জন্য জোরে তালবিয়াহ্ পাঠ করা নিষিদ্ধ। হজ্জের মধ্যে কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়াহ্ পাঠ করা যায়। যখন জামারা-ই-আকাবার কংকর নিক্ষেপ শুরু করবেন, তখন তালবিয়াহ্ পড়া বন্ধ করে দিবেন। এর পর আর পড়বেন না। উমরার মধ্যে তাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত তালবিয়াহ্ পড়া যায়।

মহিলাদের ইহরাম ঃ

মাসআলা ঃ

১। মহিলাদের ইহরাম পুরুষদের ইহরামের অনুরূপ। শুধু পার্থক্য হলো- তারা সেলোয়ার, কামিজ, বোরখা, মৌজা ইত্যাদি সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করতে পারবেন। মাথা ঢেকে রাখবেন, মুখমন্ডল আবৃত করবেন না। তবে আল্লাহ্পাকের এ আদেশ স্মরণে রাখুন– "হে নবী আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুসলমান নারীদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের শরীরের উপর চাঁদর জড়িয়ে নেয় (যেন শরীরের কাঠামো প্রকাশ না পায়); এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে কেউ তাদের উত্যক্ত করবে না।"– কোরআন (৩৩ঃ৫৯)। হুশিয়ার ভাবে চলুন, মনে রাখবেন, মহিলাদের জন্য পর্দা সর্বকালীন (দায়েমী) ফরয।

২। মসজিদে হারামে মেয়েদের নির্দিষ্ট জায়গায় নামায পড়বেন। পুরুষের সঙ্গে দাঁড়াবেন না।

৩। মহিলাদের জন্য ইহরাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত রঙিন কাপড়ও পরিধান করা জায়েয আছে; কিন্তু কাপড় যেন যাফরান অথবা কুসুম দ্বারা রঞ্জিত না হয়। যদি এটা দ্বারা রঞ্জিত হয়, তবে এত বেশী ধৌত করে নিতে হবে যে, কোন গন্ধ যেন অবশিষ্ট না থাকে।

৪। মহিলাদের জন্য ইহরামের অবস্থায় অলঙ্কার, মৌজা, দস্তানা ইত্যাদি পরিধান করা জায়েয। তবে তা পরিধান না করাই উত্তম।

৫। মহিলাদের জন্য জোরে তালবিয়াহ্ পাঠ করা নিষিদ্ধ। শুধু নিজে শুনতে পান এমন জোরে পাঠ করবেন।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা ও পাগলের ইহরাম ঃ

মাসআলা ঃ

১। যদি কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু চালাক ও বুদ্ধিমান বলে প্রতীয়মান হয়, তবে সে নিজেই ইহরাম বেঁধে হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করবে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের মত সকল কাজ সম্পন্ন করবে। পক্ষান্তরে যদি সে একান্তই অবুঝ শিশু হয়, তবে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে ইহরাম বাঁধবেন।

২। যদি একান্ত অবুঝ শিশু নিজে ইহরাম বাঁধে অথবা হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে, তা হলে এই ইহরাম ও হজ্জ সংক্রান্ত কাজ শুদ্ধ হবে না।

৩। কোন বুদ্ধিমান শিশুর পক্ষ হতে তার অভিভাবক ইহরাম বাঁধতে পারবে না।

৪। বুদ্ধিমান শিশু হজ্জের যে সকল কাজ নিজে সম্পাদন করতে পারে, তা নিজে নিজেই সমাপন করবে, আর যা নিজে সম্পন্ন করতে পারবে না, তা তার অভিভাবক সম্পন্ন করে দিবেন। অবশ্য তাওয়াফের নফল নামায শিশু নিজে পড়বে, অভিভাবক পড়লে আদায় হবে না।

৫। বুদ্ধিমান শিশু নিজেই তাওয়াফ সম্পন্ন করবে, আর অবুঝ শিশুকে তার অভিভাবক কোলে নিয়ে তাওয়াফ করাবেন। অকুফে আরাফা, সাঈ ও রামি বা কংকর নিক্ষেপ প্রভৃতি কাজের হুকুমও একই রকম।

৬। শিশুকে ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত রাখা অভিভাবকের কর্তব্য, কিন্তু যদি শিশু কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে তবুও সে জন্য কোন দম অথবা সদকা শিশু বা তার অভিভাবক কাহারও উপর ওয়াজিব হবে না।

৭। যখন কোন শিশুর পক্ষ হতে ইহরাম বাঁধা হবে, তখন তার দেহ হতে সেলাইযুক্ত কাপড় খুলে ফেলতে হবে এবং তাকে সেলাইবিহীন চাঁদর ও লুঙ্গি পরিয়ে দিতে হবে।

৮। শিশুর উপর হজ্জ ফরয নয়। সুতরাং তার এই হজ্জ নফল রূপে পরিগণিত হবে।

৯। শিশুর ইহরাম ওয়াজিব নয়। সুতরাং যদি সে হজ্জের যাবতীয় কাজ ছেড়ে দেয় অথবা আংশিক ছেড়ে দেয়, তবে তার উপরে দম অথবা সাদকা এবং ক্বাযা ওয়াজিব হবে না।

১০। যে নিকটতম অভিভাবক শিশুর সঙ্গে থাকবেন তিনিই শিশুর পক্ষ হতে ইহরাম বাঁধবেন। যেমন যদি শিশুর পিতা ও বড় ভাই সঙ্গে থাকেন তা হলে পিতার জন্য ইহরাম বাঁধা অধিকতর উত্তম। তবে বড় ভাই বা অন্যরা ইহরাম বাঁধলেও জায়েয হবে।

খোজা, সংজ্ঞাহীন ও পীড়িত ব্যক্তির ইহরাম ঃ

মাসআলা ঃ

১। খোজা (শারীরিক প্রতিবন্ধি) হজ্জের যাবতীয় আহকামের ব্যাপারে মহিলাদের সমান। তার জন্য কোন বেগানা পুরুষ অথবা নারীর সহিত একাকী থাকা জায়েয নেই।

২। যদি কোন ব্যক্তি ইহরাম বাঁধবার সময় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন তবে তার সঙ্গীদের নিজেদের ইহরাম বাঁধবার আগে অথবা পরে সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির পক্ষ হতেও ইহরামের নিয়ত করে তালবিয়াহ্ পাঠ করে নেয়া উচিত। সঙ্গীরা তার পক্ষ হতে ইহরামের নিয়ত করে তালবিয়াহ্ পাঠ করলেই তারও ইহরাম আদায় হয়ে যাবে।

৩। সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির পক্ষ হতে ইহরাম বাঁধবার জন্য তার অনুমতির প্রয়োজন নেই। তিনি আদেশ অথবা অনুমতি প্রদান করুন বা না করুন সর্বাবস্থায় যদি সঙ্গীরা তার পক্ষ হতে ইহরাম বেঁধে নেন তবে তার ইহরাম শুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইহ্রামকারীর করণীয় ও বর্জনীয় আমল

ইহ্রামকারীর করণীয় আমল ঃ

ইহরামকারী ইহরাম বাঁধার সাথে সাথেই সশব্দে তিনবার তালবিয়া পাঠ করবেন। তালবিয়া হলো–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা-শারিকা লা-কা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নিয়মাতা লা-কা ওয়ালমুলক, লাশারিকা লা-ক।"

"হাযির হে আল্লাহ, তোমার সমীপে হাযির আমি হাযির, তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত এবং রাজত্ব তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই।

তারপর দরূদ শরীফ পাঠ করে নিজের ইচ্ছে মতো দু'আ করবেন। ইহরাম বাঁধার পর এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ النَّارِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা রেদাকা ওয়াল্ জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিন গাদাবিকা ওয়ান্নার।"

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের আশা করছি এবং তোমার অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।"

ইহ্‌রামকারীর বর্জনীয় আমল ঃ

নিম্নোক্ত কার্যাদি ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ–

১। যৌন সম্ভোগ ও সে সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করা।

২। পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরা, তবে স্ত্রী লোকদের জন্য তা নিষিদ্ধ নয়।

৩। মাথা ও মুখমন্ডল আবৃত করা, তবে তাঁবু ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। স্ত্রী লোকগণ মাথা ঢাকবেন এবং মুখমন্ডল অনাবৃত করবেন।

৪। সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৫। চুল বা পশম কাটা বা উপড়ানো।

৬। নখ কাটা, তবে ভাঙ্গা নখ ভেঙ্গে ফেলায় ক্ষতি নেই।

৭। কোন স্থলজ পশু শিকার করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন– "হে ঈমানদারগণ! ইহরামরত অবস্থায় শিকার করো না।"– (সূরা ঃ মায়িদা- ৫ঃ৯৫)

অনুরূপভাবে শিকারকে হাঁকানো বা কাউকে দেখিয়ে শিকারের কাজে সহযোগিতা করা বা যবেহ্ করাও নিষিদ্ধ।

৮। নিজের শরীর বা মাথা থেকে উকুন বা উকুন জাতীয় প্রাণী বধ করা। সাপ, মশা, মাছি, ডাশ, গিরগিটি, ইঁদুর, পাগলা কুকুর ইত্যাদি মারা জায়িয আছে।

ইহরামের মাকরূহ বিষয়সমূহ ঃ

১। শরীর থেকে ময়লা দূর করা, মাথা অথবা দাড়ি ও দেহ সাবান দ্বারা ধোঁয়া।

২। মাথার চুল বা দাড়ি চিরুনীর দ্বারা আঁচড়ানো। এমনভাবে ও গুলো চুলকানোও মাকরুহ যাতে উকুন পড়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

৩। দাড়ি খিলাল করাও মাকরুহ, তবে দাড়ি পড়ে যায় না এমনভাবে খিলাল করায় কোন ক্ষতি নেই।

৪। লুঙ্গি অর্থাৎ নিম্নাঙ্গের কাপড়ের সামনের দিক থেকে সেলাই করা। তবে কেউ সতর ঢাকার নিয়্যতে এরূপ করলে দম ওয়াজিব হয় না।

৫। গিরা দিয়ে চাদর লুঙ্গি পরা, সুঁই পিন ইত্যাদি লাগানো বা সূতা ও দড়ি দিয়ে তা বাঁধা।

৬। সুগন্ধি স্পর্শ করা অথবা ঘ্রাণ নেওয়া, সুগন্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি বিক্রেতার দোকানে বসা, সুগন্ধিযুক্ত ফল অথবা ঘাসের ঘ্রাণ নেওয়া।

৭। মাথা ও মুখ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশে বিনা প্রয়োজনে পট্টি বাঁধা। প্রয়োজনে পট্টি বাঁধা মাকরূহ নয়।

৮। কা'বা শরীফের পর্দার নিচে এমনভাবে দাঁড়ানো যে তা মাথায় বা মুখে লেগে যায়।

৯। লুঙ্গিকে ফিতা লাগাবার মত ভাঁজ করে তা সূতা বা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

১০। নাক, থুতনী ও গাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। হাত দিয়ে ঢাকা জায়িয।

১১। বালিশের উপর মুখ রেখে উপুর হয়ে শোয়া। মাথা বা গাল বালিশে রাখায় ক্ষতি নেই।

১২। রান্না বিহীন সুগন্ধি খাবার খাওয়া। তবে রান্না করা সুগন্ধি খাবার মাকরূহ নয়।

ইহরামের মুবাহ্ বিষয়সমূহ ঃ

মাসআলা ঃ

১। প্রয়োজনে শীতল হবার জন্য এবং ধূলা-বালি দূর করার জন্য ঠান্ডা অথবা গরম পানি দ্বারা গোসল করা জায়েয। কিন্তু ময়লা দূর করতে পারবেন না। পানিতে ডুব দেওয়া, হাম্মামখানায় প্রবেশ করা, কাপড় পবিত্র করা, আংটি পরিধান করা, হাতিয়ার গায়ে সাজানো, শরীয়ত মোতাবেক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা প্রভৃতি জায়েয।

২। টাকার থলি অথবা কোমরের বেল্ট লুঙ্গির উপরে অথবা নীচে বাঁধা জায়েয। চাই তাতে নিজের টাকা-পয়সা থাকুক অথবা অন্য কারও টাকা-পয়সা থাকুক।

৩। ঘর অথবা তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করা, ছাতি টানানো, হাওদা অথবা অন্য কোন কিছুর ছাঁয়ায় বসা জায়েয।

৪। আয়না দেখা, মিস্ওয়াক করা, দাঁত তুলে ফেলা, ভাঙ্গা নখ কেটে ফেলা, শিঙ্গা লাগানো, সুগন্ধিহীন সুরমা লাগানো, খৎনা করানো, ভাঙ্গা অঙ্গ ব্যান্ডেজ করা ইত্যাদি জায়েয।

৫। কলেরার ইনজেকশন ও বসন্তের টিকা নেয়া জায়েয।

৬। লুঙ্গির মধ্যে টাকা-পয়সা অথবা ঘড়ির জন্য পকেট লাগানো জায়েয।

৭। মাথা এবং মুখমন্ডল ছাড়া সারা দেহ আবৃত করা, কান, কাঁধ বা পা চাঁদর অথবা রুমাল ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করা জায়েয।

৮। যে দাড়ি থুতনীর নীচে থাকে, উহা আবৃত করা জায়েয।

৯। হাঁড়ি, ডেকচী, রেকাবী, চারপাই, সবজি ইত্যাদি মাথায় বহন করা জায়েয।

১০। এমন স্থলজ শিকারের মাংস মুহরিমের জন্য খাওয়া জায়েয, যাহা কোন গায়র মুহরিম ব্যক্তি 'হিল্ল' এলাকা হতে শিকার করে থাকেন এবং তিনি নিজেই তা যবেহ করে থাকেন কিন্তু এ ব্যাপারে মুহরিম ব্যক্তির কোন ভূমিকা না থাকে। উট, গরু, বকরী, মুরগী, গৃহপালিত হাঁস যবেহ করা এবং উহার গোশত খাওয়াও জায়েয তবে বন্য হাঁস যবেহ করা জায়েয নয়।

১১। লং, এলাচী এবং সুগন্ধিযুক্ত জর্দা ছাড়া পান খাওয়া জায়েয। লং, এলাচী এবং সুগন্ধি জর্দা দিয়ে পান খাওয়া মাকরূহ।

১২। সুগন্ধিযুক্ত বস্তু ভক্ষণ করা মাকরূহ। যদি কেহ খাদ্য দ্রব্যের সুগন্ধি ঢেলে রান্না করেন এবং খাদ্য দ্রব্যে এর ঘ্রাণ পাওয়া যায়, তা হলে মাকরূহ নয়।

১৩। যে কবিতার মধ্যে পাপের কোন কথা নেই তা আবৃতি করা জায়েয। কিন্তু পাপের কোন কথা থাকলে তা আবৃতি করা নিষিদ্ধ।

১৪। শরীরে ঘৃত অথবা চর্বি মালিশ করা জায়েয নেই।

১৫। দাড়ি, মাথা এবং সমস্ত দেহ এমনভাবে চুলকানো জায়েয যাতে চুল না পড়ে। যদি জোরে জোরে চুলকালেও চুল পড়ার আশঙ্কা না থাকে, তা হলে রক্ত বের হয়ে গেলেও তা জায়েয।

১৬। ঘৃত, তৈল এবং চর্বি খাওয়া জায়েয।

১৭। যখম অথবা হাত-পায়ের ফাটা জায়গায় তেল লাগানো জায়েয। তবে শর্ত এই যে, তাহা যেন সুগন্ধিযুক্ত না হয়।

১৮। মাসআলা-মাসায়েল এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কথা-বার্তা, তর্ক-বিতর্ক জায়েয।

১৯। ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা অথবা কাহাকেও বিবাহ দেওয়া জায়েয, কিন্তু সহবাস করা জায়েয নহে।

ইহরামকারীর জ্ঞাতব্য বিষয়

মাসআলা ঃ

১। যদিও পাপাচার সর্বদাই হারাম, কিন্তু ইহরামের অবস্থায় তা আরও জঘন্যতম অপরাধ। তাই ইহরাম অবস্থায় কোন পাপকার্য সম্পাদন করা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।

২। সঙ্গী-সাথীদের সাথে বা অপর কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা নিষিদ্ধ।

৩। সুগন্ধি ব্যবহার করা, নখ ও চুল কাটা অথবা কাউকে দিয়া কাটানো, মস্তক অথবা মুখ সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ঢাকা নিষিদ্ধ (পুরুষের জন্য)।

৪। শিশুকে ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত রাখা অভিভাবকের কর্তব্য, কিন্তু যদি শিশু কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে তবুও সে জন্য কোন দম অথবা সদকা শিশু বা তার অভিভাবক কারও উপর ওয়াজিব হবে না।

৫। পাগলের হুকুম সকল ব্যাপারেই অবুঝ শিশুর অনুরূপ। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ইহরাম বাঁধবার পরে পাগল হন, তা হলে ইহরামের নিষিদ্ধ কোন কাজ সংঘটিত হলে তার উপর দম অথবা সদকা ওয়াজিব হবে কি না সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সাবধানতার জন্য দম অথবা সদকা আদায় করে দেয়াই উত্তম। তবে তার হজ্জ যে শুদ্ধ হয়ে যাবে তাতে কোন মতবিরোধ নেই। অবশ্য লোকটি যদি ইহরামের পূর্ব হতেই পাগল থাকে এবং তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে ইহরাম বেঁধে নেন, অতঃপর তিনি স্থির-মস্তিষ্ক হয়ে যান, তবে স্থিরমস্তিষ্ক হওয়ার পর দ্বিতীয়বার ইহরাম বেঁধে হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করলে তবেই তার ফরয হজ্জ আদায় হবে, অন্যথায় আদায় হবে না।

ইহরামের তাৎপর্য

নামাযের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমার ভূমিকা যদ্রূপ, হজ্জ ও উমরার মধ্যে ইহরামের ভূমিকাও ঠিক তদ্রূপ। যেমনভাবে একজন মুসলমান খালেস নিয়তে আল্লাহু আকবার বলে নামায আরম্ভ করেন এবং বহুবিধ কর্ম তার জন্য নামাযের অবস্থায় হারাম

হয়ে যায়, তেমনিভাবে হাজী ইহরাম ও তালবিয়ার মাধ্যমে হজ্জ এবং উমরা পালনের প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করে নেন, নিয়তের এখলাস এবং আল্লাহ্পাকের সম্মান ও মর্যাদার প্রকাশ ঘটান, নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতার আকৃতি ধারণ করে অন্তরে ও মুখে এর স্বীকৃতি প্রদান করেন, সর্ববিধ ভোগ-লালসা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস পরিহার করে মাত্র দুইখানা কাপড় পরিধান করেন এবং স্বয়ং নিজেকে মৃতের সমান করে নেন। অধিকন্তু, এই বিশেষ লেবাসের মধ্যে এটাও একটি হেকমত যে, ধনী-গরীব, বাদশাহ্-ফকীর নির্বিশেষে সকলে একই লেবাস পরিধান করে মহান আল্লাহ্পাকের দরবারে উপস্থিত হন এবং কাহারও অহঙ্কার করার কোন সুযোগ থাকে না। ফলে ইসলামী সমতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের এক অনুপম পরিবেশ গড়ে ওঠে।

জিদ্দা আগমন

হিজরী ৩৬ সনে ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) জিদ্দাকে মক্কা মুকাররমার সমুদ্র বন্দরে পরিণত করেন। স্টীমার ইয়ালামলাম হতে আনুমানিক ২৪ ঘণ্টা পর জিদ্দা পৌঁছায়। কামরান হতে জিদ্দা আনুমানিক সাড়ে পাঁচশত মাইল দূরে অবস্থিত। জিদ্দায় প্রথম অবস্থায় স্টীমার জেটির অভাবে তীর হতে প্রায় এক মাইল দূরে থামত। এখন স্টীমারের জন্য জেটি নির্মিত হয়ে গিয়েছে, অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথেই যাত্রীগণ নামতে শুরু করেন। নিজের যাবতীয় মাল-সামান স্টীমার থামার পূর্বেই গুছিয়ে নিবেন। কোন কোন সময় মালপত্র অন্য লোকের মালপত্রের সাথে মিশে পরে হারিয়ে যায়। সুতরাং সর্বদা পাসপোর্ট নিজের সঙ্গে রাখবেন।

বর্তমানে বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশ থেকেই হজ্জ যাত্রী বিমানযোগে মক্কা শরীফ আসেন। তাতে কম সময়ে হজ্জ সম্পন্ন করা যায়। বিমানে আরোহণের পর ইহরামের প্রস্তুতি নিয়ে নিয়্যত করা সহজ থাকে না বিধায় অধিকাংশ হাজী সাহেবরা বিমানে উঠার পূর্বেই ইহরাম বেঁধে থাকেন। বাংলাদেশ থেকে হজ্জ যাত্রীরা বিমানে যাতায়াত করেন এবং সেই হিসাবেই বিমানে আরোহণের পূর্বে ইহরাম বাঁধবেন। সতর্কতার সাথে সব নিয়ম পালন করবেন।

মুয়াল্লিম সম্পর্কিয় জ্ঞাতব্য

সউদী সরকারের আইনানুযায়ী প্রত্যেক হাজীর জন্য মুয়াল্লিম নির্বাচন করা জরুরী। সরকারীভাবে অনেক লোক মুয়াল্লিম হিসাবে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের কল্যাণে হাজী সাহেবগণ থাকা-খাওয়া ও সফরের ব্যবস্থা এবং হজ্জের করণীয় বিষয়াদি আদায় করার ব্যাপারে আরাম, শান্তি ও সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করে থাকেন।

আজকাল সউদী সরকার মুয়াল্লিম নির্দিষ্ট করে থাকে। জেদ্দায় মুয়াল্লিমের প্রতিনিধি অথবা তাদের নিজস্ব লোক উপস্থিত থাকে। তারা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে

যাবে। আপনি তখন বের হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের মালপত্র নিয়ে নিবেন এবং মুয়াল্লিমের প্রতিনিধির সাথে রওয়ানা হবেন। তা হলে কথাবার্তা প্রভৃতি কাজ সহজ হবে।

মক্কা মুয়াজ্জমা

বর্তমানে জিদ্দা হতে মক্কা মুয়াজ্জমায় মোটর গাড়ী চলাচল করে। মুয়াল্লিম কিংবা তার প্রতিনিধিকে জানালে আপনার সব ব্যবস্থা করে দিবেন। জিদ্দা হতে দুই ঘন্টায় মক্কা মুকাররামায় পৌঁছে যাবেন। জিদ্দা হতে মক্কার দূরত্ব প্রায় ৪৬ মাইল। মক্কার রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে চা ও কফির দোকান রয়েছে। সেখানে পানি ও লাল চা প্রচুর পাওয়া যায়।

রাস্তায় সরকারী পুলিশ সেবা ফাঁড়িও রয়েছে। এতে টেলিফোন সেট বসানো আছে। যদি কোন প্রয়োজন পড়ে অথবা কোন অভিযোগ প্রভৃতির অবকাশ আসে অথবা গাড়ী খারাপ হয়ে যায়, তা হলে পুলিশ ফাঁড়িতে জানিয়ে দিবেন। ইনশাআল্লাহ্ ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

যদি হজ্জ সমাপনের পূর্বেই মদীনা মুনাওয়ারা যাওয়ার প্রোগ্রাম হয়, তবে মক্কা মুকাররামা হয়ে অথবা জিদ্দা হতে সোজা মদীনা গমন করতে পারেন। কিন্তু যদি মক্কা মুকাররামা হয়ে মদীনা মুনাওয়ারা যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তা হলে উমরা পালন করে মদীনা যেতে হবে। যদি জিদ্দা হতে সোজা মদীনা গমনের ইচ্ছা থাকে, তা হলে ইয়ালামলাম হতে উমরাহর ইহরাম বাঁধবেন না। কারণ হরম সীমার বাইরের পথ দিয়া মদীনায় যেতে হবে এবং বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার অপরাধ সংঘটিত হবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমরাহ্ পালন

উমরাহ্ আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ যিয়ারত বা দর্শণ করা। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে ‘মীকাত’ অথবা ‘হিল্ল’ হতে ইহরাম বেঁধে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া দৌঁড়ায়ে মাথা মুন্ডায়ে বা চুল ছেটে হালাল হয়ে যাওয়াই উমরা। হজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলো যেমন- ৯ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত এই পাঁচ দিন হজ্জের জন্য নির্ধারিত। তখন উমরা পালন করা মাকরূহ্ তাহরীমা। এ সময় ব্যতীত বছরে যে কোন সময় উমরা করা যায়। সক্ষম হলে সারা জীবনে একবার উমরা আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

উমরাহ্র ফযীলত ঃ

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন–

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“তোমরা সকলে হজ্জ এবং উমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সম্পাদন করো।”– কোরআন (২ঃ১৯৬)। উক্ত আয়াতে কারীমায় হজ্জের সাথে উমরারও নির্দেশ করেছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন–

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ط فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

“নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শণগুলোর অন্তর্ভূক্ত সুতরাং যে কেউ এ ঘরের হজ্জ কিংবা উমরাহ সম্পন্ন করে এ দুইটি প্রদক্ষিণ করায় তার উপর কোন গুনাহ্ নেই।”–কোরআন (২ঃ১৫৮)। এ আয়াতে হজ্জ ও উমরার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বহু হাদীসে উমরার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা শুধু তিনটি রেওয়ায়তই উল্লেখ করছি–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿رض﴾ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴿رواه الترمذى وغيره﴾

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন - “তোমরা হজ্জ ও উমরা একই সঙ্গে সম্পন্ন করিও। কারণ এগুলি দারিদ্র্য ও গুনাহকে এমনভাবে দূর করে যেভাবে কামারের হাঁপর লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা দূরীভূত করে দেয়।”–তিরমিযী ইত্যাদি।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজ্জ ও উমরার কারণে শুধু গুনাহ্-ই মাফ হয় না, বরং এর বরকতে মানুষের দারিদ্র্য এবং অভাব-অনটনও দূরীভূত হয়ে যায়। আর হজ্জ ও উমরা পালনকারী ব্যক্তিকে প্রকাশ্য ও গোপনীয় এবং ইহলৌকিক ও পার-লৌকিক সম্পদ দ্বারা প্রাচুর্যমন্ডিত করা হয়। কিন্তু নিয়তের পবিত্রতা হচ্ছে পূর্বশর্ত।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿رض﴾ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ﴿رواه الشيخان وفى رواية لمسلم﴾ حَجَّةً مَعِيْ

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন- রমযান মাসে উমরা পালন করা সওয়াবের দিক দিয়ে এক হজ্জের সমান। (শায়খান) মসুলিম শরীফে একটি রেওয়াতে আছে যে, “ঐ হজ্জের সমান যা আমার সাথে পালন করা হয়েছে।”

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন–

اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ ﴿رواه ابن ماجة﴾

অর্থাৎ “হজ্জ ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহ্র মেহমান। তারা যদি আল্লাহ্র নিকট কোন প্রার্থনা করেন, তিনি উহা কবুল করে থাকেন এবং যদি পাপ হতে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, তবে তাদের পাপ ক্ষমা করেন। –ইবনে মাজাহ্

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اِلاَّ الَّتِىْ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهٖ عُمْرَةٌ مِّنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِّنَ الْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مَّعَ حَجَّتِهٖ — متفق عليه

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চারটি উমরা করেছেন, প্রত্যেকটি যিলকদ্ মাসে হজ্জের সাথের উমরা ছাড়া। এক উমরা হুদায়বিয়া হতে যিলকদ্ মাসে, এক উমরা পরবতী বৎসর যিলকদ্ মাসে, এক উমরা জি'রানা হতে যেখানে তিনি হুনাইন যুদ্ধের গণীমত বণ্টন করেছিলেন, যিলকদ্ মাসে এবং অপর উমরা (দশম হিজরীতে) তাঁদের হজ্জের সাথে।– (বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জ ও উমরাকে একই পর্যায়ে রেখে কোরআন শরীফে বর্ণনা করায় ইমাম মালিক ও শাফিঈ (রঃ)-এর মতে উমরাও হজ্জের মতই ফরয। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে উমরা সুন্নাত। তিনি বলেন, কোরআন শরীফে উমরা শুরু করার পর তা পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই শুরু করা উমরা পূর্ণ করা ফরয। তাঁর মতের স্বপক্ষে তিরমিযী শরীফের একটি সহীহ্ হাদীস রয়েছে, যাতে বর্ণিত আছে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন– একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! উমরা কি ফরয? জবাবে তিনি বললেন না। তবে উমরা করা উত্তম।–(মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রঃ) অনুদিত মিশকাত শরীফ হজ্জ পর্বের ভূমিকায়)। সক্ষম হলে জীবনে একবার উমরা আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

"উমরা"র আহ্কাম ও আদায়ের পদ্ধতি

উমরা আদায়ে ফরয দুটি ও ওয়াজেব দুটি ঃ

১। উমরার ইহরাম বাঁধা	- ফরজ
২। বাইতুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করা	- ফরজ
৩। ছাফা মারওয়া সাঈ করা	- ওয়াজেব
৪। মাথা মুন্ডান বা চুল ছাটা	- ওয়াজেব

যিনি উমরা সম্পাদন করতে চান, তিনি মীকাতে পৌঁছে ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করবেন, নাভির নিম্নদেশের লোম পরিষ্কার করবেন, স্ত্রী সঙ্গে থাকলে এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তার সাথে সহবাসও সেরে ফেলবেন। তারপর ইহ্রামের নিয়তে গোসল করবেন। গোসল করতে না পারলে ওযূ করে নিবেন। এই গোসল শুধু পরিচ্ছন্নতার জন্য। এই কারণে হায়েয ও নেফাসবর্তী মহিলা এবং শিশুদের জন্যও

সুন্নত। এর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা শরীয়ত সিদ্ধ নহে। গোসলের পর শরীর হতে সেলাইযুক্ত কাপড় খুলে ফেলবেন এবং একটি সেলাই বিহীন লুঙ্গি পরিধান করবেন ও একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে নিবেন। যদি দুটি কাপড় না থাকে তাহলে একটিই যথেষ্ট। কাপড় দুটি সাদা, নতুন অথবা ধোঁলাইকৃত হওয়া মুস্তাহাব। অবশ্য একদম কোন প্রকার সেলাইযুক্ত না হওয়াই মুস্তাহাব। এর পর শরীর ও কাপড়ে সুগন্ধি লাগাবেন। পুরুষের জন্য রং বিহীন সুগন্ধি উত্তম এবং মহিলাদের জন্য রং বিশিষ্ট। কিন্তু কাপড়ে এমন সুগন্ধি লাগাতে নেই যার চিহ্ন লাগানোর পরে অবশিষ্ট থাকে। এরপর দুই রাকাআত নফল নামায পড়বেন। তবে শর্ত এই যে, তা যেন মাকরূহ ওয়াক্তে না হয়।

ইহ্রামের নামায ঃ

"নাওয়াইতুআন উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকয়াতায় ছলাতিল ইহরামে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শরিফাতে আল্লাহু আকবার।" ইহরামের নামাযে প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখলাস পাঠ করবেন। এই নামায মাথা আবৃত করে ইযতেবা ছাড়াই আদায় করবেন। সালাম ফিরানোর পর কেবলামুখী হয়ে বসে মাথা অনাবৃত করে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশা নিয়ে উমরার নিয়্যত করবেন। দাঁড়িয়ে অথবা সওয়ারীর উপর বসেও নিয়ত করা জায়েয। তারপর মুখে বলবেন ঃ উমরার নিয়্যত–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল ওমরাতা ফায়াছছিরহালী অ তাকাব্বালহা মিননী।"

তালবিয়াহ্ ঃ

ইহরামের নিয়্যাত করার পরই তালবিয়াহ্ পড়বেন। তালবিয়াহ্ শব্দ সমূহ নিম্নরূপ–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

"লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান, নি'মাতা লাকা ওয়াল্ মুলক্, লা-শারীকা লাক।"

তালবিয়াহ্ তিনবার পাঠ করা মুস্তাহাব। পুরুষরা উচ্চস্বরে এবং মহিলারা নিম্নস্বরে পাঠ করবেন। এখন ইহরাম বাঁধা হল। এখন প্রচুর সংখ্যায় তালবিয়াহ্ পাঠ করতে থাকবেন। বিশেষভাবে অবস্থা পরিবর্তনের সময় তালবিয়া পাঠ করবেন। ইহরাম বাঁধার পরে ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ হতে বিরত থাকবেন এবং উহার ওয়াজিব ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। ইহা ব্যতীত আর কোন বিশেষ কাজ হরম শরীফে প্রবেশ করা পর্যন্ত করতে হবে না।

হরম শরীফ প্রবেশ ও তাওয়াফ ঃ

যখন হরমের সীমানায় প্রবেশ করবেন (যাহা জিদ্দার দিক হতে গমনকারীদের জন্য মক্কা শরীফ হতে দশ মাইলের দূরত্বে শুরু হয়। সেখানে দুইটি সাদা মিনার তৈরী রয়েছে) তখন সওয়ারী হতে অবতরণ করে নগ্ন পায়ে চলবেন। যদি বেশী দূর হাটতে না পারেন, তবে অল্প কিছু দূর হাটবেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে হরমে প্রবেশ করবেন। প্রচুর পরিমাণে তালবিয়াহ, তাকবীর, তাহলীল প্রভৃতি পাঠ করবেন। যখন মক্কা মুকাররামার নিকটবর্তী হবেন, তখন মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বে গোসল করবেন এবং মক্কার কবরস্থান বাবুল মা'লার দিক হতে প্রবেশ করবেন এবং পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِيْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالًا

"আল্লাহুম্মায্ আল্লি বিহা ক্বারারাওয়ার্ যুকনি ফিহা রিযক্বান হালালা।"

এবং মাদ'আ নামক স্থানে দো'আ প্রার্থনা করবেন। তারপর যদি মালপত্রের দিক হতে শান্তি ও স্থিরতা বজায় থাকে, তাহলে সোজা মসজিদে হারামে চলে যাবেন। নতুবা মালপত্র বাসায় রেখে পরে মসজিদে হারামে গমন করবেন। বাবুস সালামের পথে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন। প্রথমে ডান পা রাখবেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রবেশ করবেন। লাব্বায়েকা পড়ে اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ "আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্লী আব্ওয়াবা রহ্মাতিকা" পাঠ করবেন। যখন বায়তুল্লাহ শরীফ দৃষ্টিগোচর হবে তখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ "আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" পাঠ করবেন এবং দো'আ করবেন। এই সময় নিম্নোক্ত দো'আটি পড়া সুন্নাত–

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّبِرًّا

"আল্লাহুম্মা যিদ্ বাইতাকা হাজা তাশরীফান ওয়া তাকরীমান ওয়া তাযিমান ওয়া বিররান্।"

তারপর তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে "হাজারে আসওয়াদ" এর দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাওয়াফে কুদুম সম্পন্ন করবেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাওয়াফের কারণে ফরয নামাযের জামা'আত অথবা বিতর অথবা সুন্নতে মুয়াক্কাদা বাদ পড়ার আশঙ্কা দেখা না দেয়। যদি ভয় থাকে, তাহলে প্রথমে নামায আদায় করে নিবেন। তাওয়াফের জন্য হাজারে আসওয়াদের সামনে এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে ডান কাঁধ হাজারে আসওয়াদের বাম দিকের সামনে থাকে আর সমগ্র হাজারে আসওয়াদ বাম দিকে থাকে। তারপর তাওয়াফের নিয়ত করবেন। এই নিয়ত করা ফরয। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বাক্যটি মুখে বলাও উত্তম। ইহা তাওয়াফের মৌখিক নিয়ত।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّيْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফা বাইতিকাল্ হারামি ছাব্‌য়াতা আশ্‌ওয়াতিন ফাইয়াস্‌সিরহু লী ওয়াতাক্কাব্বাল্‌হু মিন্‌নী।"

তারপর ডান দিকে কিঞ্চিত এমনভাবে সরে যাবেন যাতে হাজারে আসওয়াদ একদম সম্মুখে পড়ে। অতঃপর হাজারে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে বলবেন–

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ - لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ - وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ -
اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালিল্লাহিল্ হামদু ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ঈমানাম্ বিকা ওয়াতাস্‌দীকাম্ বিকিতাবিকা ওয়াওয়াফাআম্ বিআহ্‌দিকা ওয়াইত্তিবাআল্ লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবেন। উভয় হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের উপরে স্থাপন করে দুই হাতের মাঝে মুখ রেখে মৃদুভাবে চুম্বন করতে হবে যেন চড় চড় শব্দ না হয়। কারো কারো মতে হাজারে আসওয়াদের উপরে তিনবার মাথা রাখা মুস্তাহাব। যদি ভিড়ের কারণে চুম্বন করা সম্ভব না হয়, তবে তা পরিহার করবেন। লোকজনকে কষ্ট দিবেন না। এক্ষেত্রে শুধু উভয় হাত হাজারে আসওয়াদের উপরে রেখে পরে হাত দুটি চুম্বন করবেন। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে কোন কাঠের দ্বারা হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করে সেই কাঠটিতে চুমা খাবেন। যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে উভয় হাতকে এমনভাবে কান পর্যন্ত উঠাবেন যেন হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের দিকে এবং হাতের পিঠ নিজের মুখের দিকে থাকে; আর এই খেয়াল করবেন যে, হাতকে হাজারে আসওয়াদের উপরেই রেখেছেন। তারপর এই দো'আ পাঠ করবেন–

اَللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অলহামদুলিল্লাহ্ ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা ছাইয়েদেনীল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম"

এবং উভয় হাতে চুমা খাবেন। তাওয়াফ শুরু করার সামান্য পূর্বে ইযতেবা করবেন অর্থাৎ চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়ে পেঁচিয়ে বাম কাঁধের উপরে রাখবেন এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করবেন। অর্থাৎ সামান্য সদর্পে কাঁধ হেলিয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে বীরোচিত ভঙ্গিতে দ্রুত গতিতে চলবেন। তাওয়াফ আরম্ভ করার পর তালবিয়াহ পাঠ করবেন না। হাজারে আসওয়াদের ইস্তিলামের (চুম্বনের) পর বায়তুল্লাহ্ শরীফের

দরজার দিকে অর্থাৎ নিজের ডান দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাওয়াফের মধ্যে হাতীমকেও শামিল করবেন। যখন রুকনে ইয়ামানী অর্থাৎ বায়তুল্লাহর পশ্চিম দক্ষিণ কোণে পৌঁছবেন, তখন তাতে শুধু উভয় হাত অথবা ডান হাত লাগাবেন; চুমা দিবেন না। ভিড় থাকলে সেখানে ইঙ্গিতও করবেন না। তারপর যখন হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছবেন, তখন এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন। সম্ভব হলে ১২৪ পৃষ্ঠায় তাওয়াফের অধ্যায় লিখিত তাওয়াফের দো'আ পড়ুন। সাত চক্কর সম্পূর্ণ করার পর অষ্টম বার হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবেন। তাওয়াফ সমাপ্ত হয়ে গেল। তারপর মাকামে ইব্রাহীম (যা বায়তুল্লাহ্ পূর্ব দিকে মাতাফের প্রান্তে অবস্থিত)-এর দিকে "ওয়াত্তাখেজু মিম্ মাকামে ইব্রাহীমা মুসল্লা" পড়তে পড়তে অগ্রসর হবেন এবং মাকামে ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহ ও নিজের মাঝখানে রেখে দুই রাকাআত নামায পড়বেন।

মাকামে ইব্রাহীমে নামায ঃ

মাকামে ইব্রাহীমে নামাযের নিয়্যত ঃ "নাওয়াইতু আন উছল্লিয়ালিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতায় ছলাতি ওয়াজেবুত তাওয়াফে মুতাওয়াজিহান ইলাজিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতে আল্লাহু আকবার।" প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখলাস পাঠ করবেন। যদি সেখানে জায়গা পাওয়া না যায় তবে যেখানে সম্ভব হয় সেখানে পড়বেন।

তাওয়াফের নামায সমাপ্ত করে মুলতাযামের নিকটে আসবেন এবং উহাকে জড়িয়ে ধরবেন। ডান গাল এবং কখনও বাম গাল এর উপরে রাখবেন এবং উভয় হাত উপরের দিকে উঠিয়ে বিনয় ও নম্রতার সাথে দো'আ করবেন। তারপর যম্‌যম্ কূপের নিকটে আসবেন।

যম্‌যমের পানি পান ঃ

কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে খুব পরিতৃপ্তিসহ তিন নিঃশ্বাসে যমযমের পানি পান করবেন এবং গায়েও কিছু পানি ঢালবেন এবং এই দো'আ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ عَمَلًا صَالِحًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা ইল্‌মান্ নাফিআন্ ওয়ারিয্‌কান্ ওয়াসিআন্ ওয়া আমালান ছালেহাও্ ওয়াশিফাআম্ মিন্ কুল্লি দাইন্।"

যম্‌যমের পানি পান করে বাবুস সাফার পথে সাঈ'র জন্য মসজিদে হারাম হতে বের হয়ে আসবেন এবং প্রথমে বাম পা রাখবেন। এই সময় اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ "আল্লাহুম্মাগ-ফিরলী যুনুবী ওয়াফ্ তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতিকা" পড়বেন।

সাফা-মারওয়া সাঈ ও মাথা মুন্ডান ঃ

সাফা'র নিকটে পৌঁছে এই দো'আ পাঠ করবেন–

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

"আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি ইন্নাস্ সাফা ওয়াল্ মারওয়াতা মিন্ শাআ-ইরিল্লাহি।"

এবং সাফার এক তৃতীয়াংশ উপরে আরোহণ করবেন। অধিক উপরে উঠবেন না। কেবলামুখী হয়ে উভয় হাতকে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবেন, যেমন দো'আর জন্য উঠিয়ে থাকেন এবং তাকবীর, তাহলীল, হাম্‌দ প্রভৃতি তিন তিনবার পড়বেন।

সাঈর নিয়্যাত ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি উরীদুছ সাঈয়া বাইনাছ্‌ছাফা অলমারওয়াতা ছাবয়াতা আশওয়াতিন ফাইয়াছছিরহুলী অতাকাব্বালহু মিন্নী।" সাঈ-এর অধ্যায়ে (১৩৫ পৃষ্ঠা) যে সকল দো'আ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি পাঠ করবেন। যদি সেসব দো'আ মুখস্থ না থাকে, তবে নিজের ভাষায় দো'আ প্রার্থনা করবেন এবং সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দো'আ করবেন। অতঃপর সাফা হতে নেমে প্রশান্ত চিত্তে মারওয়ার দিকে অগ্রসর হবেন। মসজিদের দেয়ালে স্থাপিত সবুজ বাতি যখন ৬ হাত পরিমাণ দূরে থাকবে, তখন সেখান হতে দ্বিতীয় সবুজ বাতি পর্যন্ত দৌঁড়িয়ে চলবেন। কিন্তু খুব দ্রুত দৌঁড়াবেন না। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে এই দো'আ পাঠ করবেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"রাব্বিগ্‌ফির ওয়ারহাম্ আন্‌তাল্ আআ'য্‌যুল্ আক্‌রাম।"

তারপর দ্বিতীয় সবুজ বাতি হতে এগিয়ে যাবার পর স্বাভাবিক গতিতে চলবেন এবং মারওয়ার উপরে আরোহণ করে সামান্য ডান দিকে ঝুঁকবেন যেন মুখ কেবলার দিকে হয়ে যায়। এখানেও হাত উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ সাফার অনুরূপ দো'আ প্রভৃতি পাঠ করবেন। এভাবে সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত সাঈর এক চক্কর সম্পূর্ণ হল এবং মারওয়া হতে সাফা পর্যন্ত দ্বিতীয় চক্কর হয়ে যাবে। এমনিভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন। সপ্তম চক্কর মারওয়াতে সমাপ্ত করবেন। প্রত্যেক চক্করে যে দো'আ ও তসবীহ মুখস্থ থাকবে এবং যা পাঠে একাগ্রতা আসে তাই পাঠ করবেন। সাঈ-এর পরে মাতাফের প্রান্তে এসে দুই রাকাআত নফল নামায পড়বেন। এবার মনের আকুতি সহ মকছুদ পুরণের জন্য মা-বাবা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমস্ত মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন। এরপর আপনি মাথা মুন্ডান বা চুল ছোট করে হালাল হবেন। ইহ্‌রাম ছেড়ে দিন। তবে মহিলাগণ সমস্ত চুল ধরে হাতের আঙ্গুলের এককর পরিমাণ চুল কেটে হালাল হবেন। এই ভাবে উমরা শেষ হলো।

উমরা পালনের সময় ঃ

উল্লেখিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস অনুযায়ী পবিত্র মাহে রমযানে উমরা পালন করা সর্বোত্তম। কারণ উহা প্রাণের নবীজীর সাথে হজ্জ করার সমতুল্য। কেউ যদি ভীড় এড়িয়ে নিরিবিলি উমরা পালন করতে চান তাহলে হজ্জের পরপরই যখন উমরার ভিসা প্রদান করা শুরু হয় তখনই যাবেন। আলহামদুলিল্লাহ্! শান্তির সাথে উমরা আদায় করতে পারবেন।

অন্যের নামে উমরা ঃ

আপনি নিজের উমরা আদায়ের পর ইচ্ছা করলে প্রাণের নবীজীর নামে, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, নিজ মুরব্বীদের নামে এবং অন্যান্যের নামেও উমরা করতে পারেন।

মনে রাখবেন– কোরআন শরীফের আয়াতের মর্মে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের রুহানী পিতা, তাঁর মাধ্যমেই ইহকাল ও পরকাল পাব। তাই প্রাণের নবীজীর নামে সম্ভব হলে উমরা করবেন। ২০০৭ইং সনে আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে হজ্জে নিলেন, তখন আমি স্বপ্নের মাধ্যমে নির্দেশ পেলাম "হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে উমরা করা জরুরী"। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমি নবীজীর নামে 'উমরা' পালন করতে চেষ্টা করি।

হজ্জের প্রকার ভেদ

হজ্জ তিন প্রকার ঃ

১। তামাত্তো– হজ্জের মাসে প্রথমে উমরা এবং পরে হজ্জ করা।

২। ইফরাদ – হজ্জের মাসে উমরা ছাড়া কেবল হজ্জ করা।

৩। ক্বিরান– হজ্জ ও উমরা এক সাথে মিলিয়ে করা।

এই তিন প্রকারের যে কোন হজ্জই জায়েয। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হজ্জে ক্বিরানই সর্বোত্তম। এরপর তামাত্তু', এরপর ইফরাদ। মক্কা শরীফের বাহিরের লোকদের জন্য এখতিয়ার রয়েছে যে, তিন প্রকারের যে কোন এক নিয়মে হজ্জ আদায় করতে পারবেন। কিন্তু পবিত্র মক্কার অধিবাসীগণ শুধু এফরাদ আদায় করবেন। তাদের জন্য ক্বিরান ও তামাত্তো নিষিদ্ধ।

আহ্কামে হজ্জ ও উমরার সংক্ষিপ্ত তালিকা

উমরা, হজ্জে তামাত্তো', হজ্জে এফরাদ, হজ্জে ক্বেরানের যাবতীয় কর্ম সংক্ষিপ্ত তালিকার আকারে ক্রম অনুসারে পৃথক-পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো। হাজী সাহেবগণ এই তালিকাটি উমরা এবং হজ্জ সমাপনের সময় সঙ্গে রাখবেন এবং প্রত্যেক কাজের যে আহ্কাম তা পালন করার সময় এর বর্ণনায় দেখে নিবেন। এই তালিকায়

তাওয়াফে কুদুম ব্যতীত শুধু অবশিষ্ট সে সকল কর্মই গণনা করা হয়েছে, যা শর্ত, রুকন অথবা ওয়াজিব। সুন্নত এবং মুস্তাহাব কর্মসমূহ গণনা করা হয়নি। কেননা, সেগুলির তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। সেসব আলোচনা প্রত্যেক বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় করা হবে। সেখানে দেখে নিবেন।

উমরার কার্যাবলী ঃ

১।	উমরার ইহরাম	ফরয
২।	বাইতুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ	ফরয
৩।	সাঈ	ওয়াজিব
৪।	মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছাঁটানো	ওয়াজিব

হজ্জে তামাত্তো’র কার্যাবলী ঃ

১।	উমরার ইহরাম	ফরয
২।	উমরার তাওয়াফ	ফরয
৩।	উমরার সাঈ	ওয়াজিব
৪।	মাথা মুন্ডান অথবা ছাঁটানো	ওয়াজিব
৫।	৮ই যিলহজ্জ হজ্জের ইহরাম বাঁধা	ফরয
৬।	তাওয়াফ	সুন্নত
৭।	অকুফে আরাফা	ফরয
৮।	অকুফে মুযদালিফা	ওয়াজিব
৯।	রামিয়ে জামরায়ে উকবা (বড় শয়তানের স্তম্ভ)	ওয়াজিব
১০।	কোরবানী	ওয়াজিব
১১।	মাথা মুন্ডান অথবা ছাঁটানো	ওয়াজিব
১২।	তাওয়াফে যিয়ারত	ফরয
১৩।	সাঈ	ওয়াজিব
১৪।	রামিয়ে জেমার (তিন শয়তানের স্তম্ভ)	ওয়াজিব
১৫।	তাওয়াফে বিদা’	ওয়াজিব

হজ্জে ইফরাদের কার্যাবলী ঃ

১।	হজ্জের ইহরাম	ফরয
২।	তাওয়াফে কুদুম	সুন্নত
৩।	অকুফে আরাফা	ফরয
৪।	অকুফে মুযদালিফা	ওয়াজিব
৫।	রামিয়ে জামরায়ে উকবা (বড় শয়তানের স্তম্ভ)	ওয়াজিব
৬।	কোরবানী	ঐচ্ছিক

৭।	মাথা মুন্ডন বা ছাঁটানো	ওয়াজিব
৮।	তাওয়াফে যিয়ারত	ফরয
৯।	সাঈ	ওয়াজিব
১০।	রামিয়ে জেমার (তিন শয়তানের স্তম্ভ)	ওয়াজিব
১১।	তাওয়াফে বিদা'	ওয়াজিব

হজ্জে ক্বিরানের কার্যাবলী ঃ

১।	হজ্জ ও উমরার ইহরাম	ফরয
২।	উমরার তাওয়াফ	ফরয
৩।	তাওয়াফে কুদুম	সুন্নত
৪।	উমরার সাঈ	ওয়াজিব
৫।	অকুফে আরাফা	ফরয
৬।	অকুফে মুযদালিফা	ওয়াজিব
৭।	রামিয়ে জামরায়ে উকবা (বড় শয়তানের স্তম্ভ)	ওয়াজিব
৮।	কোরবানী	ওয়াজিব
৯।	মাথা মুন্ডন অথবা ছাঁটানো	ওয়াজিব
১০।	তাওয়াফে যিয়ারত	ফরয
১১।	সাঈ (হজ্জের)	ওয়াজিব
১২।	রামিয়ে জেমার (তিন শয়তানের স্তম্ভ)	ওয়াজিব
১৩।	তাওয়াফে বিদা'	ওয়াজিব

হজ্জ সম্পর্কে হুশিয়ারি ঃ

১। হজ্জে ক্বিরান পালনকারীর জন্য তাওয়াফে কুদুমের পরে সাঈ সম্পন্ন করতে হবে এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পরেও সাঈ সম্পন্ন করতে হবে।

২। মক্কাবাসীদের জন্য তাওয়াফে বিদা' ওয়াজিব নয়।

৩। উপমহাদেশের অধিকাংশ লোক যেহেতু কোরবানীর পশু সঙ্গে নেন না, কাজেই আমরা তামাত্তো'-এর শুধু সে প্রকারের আহকামই বর্ণনা করেছি। যদি কেউ কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে যান, তা হলে উমরার সাঈ করার পর মাথা মুন্ডন করবেন না; বরং এইভাবেই ইহরামে রত থাকবেন এবং ৮ই যিলহজ্জ হজ্জের জন্য পুনরায় আরেকটি ইহরাম বাঁধবেন।

৪। হজ্জে এফরাদ পালনকারী যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করেন, তা হলে তাওয়াফে কুদুমে রমল এবং ইযতেবাও করতে হবে। তবে তাওয়াফে যিয়ারতের পরেই সাঈ করা উত্তম।

তামাত্তু' হজ্জ আদায়ের নিয়মাবলী

তামাত্তু' হজ্জের বর্ণনা ঃ

তামাত্তু' শব্দের অর্থ হলো উপকারিতা অর্জন করা। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তামাত্তু' হলো উমরাহ্ অথবা উমরাহ্র অধিকাংশ তাওয়াফ হজ্জের মাস সমূহে সম্পন্ন করে কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে থাকলে ইহরাম না খোলা আর কোরবানীর পশু সঙ্গে না নিলে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাওয়া এবং ঐ বছরই দেশে ফিরে যাওয়ার পূর্বে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ পালন করা।

এটাকে তামাত্তু' বলার কারণ হলো– তামাত্তু' পালনকারী উমরাহ্র ইহরাম এবং হজ্জের মাঝখানে সে সকল বস্তু থেকে উপকারিতা অর্জন করতে পারেন, যা ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ থাকে। ক্বিরানের হুকুম ঠিক এটার বিপরীতে। ক্বিরান হজ্জকারীর উমরাহ্ সমাপ্ত করার পরও মুহরিম থাকেন এবং সে সকল বস্তু হতে উপকারিতা অর্জন করতে পারেন না। তামাত্তু' হজ্জ ক্বেরান থেকে উত্তম নয়; তবে ইফরাদ থেকে উত্তম।

তামাত্তু' হজ্জ পালনকারীর উমরা আদায় ঃ

[প্রথমে উমরার আহকাম ও আদায়ের পদ্ধতি (৭৫ পৃষ্ঠা) খুবই ভাল করে পড়ে নিন]

ক) শুধুমাত্র উমরাহ্র জন্য ইহরাম বাঁধা (ফরজ) মীকাত থেকে।

খ) উমরাহ্র তাওয়াফ করা (ফরজ)। সাত চক্করে ইযতিবা ও প্রথমে তিন চক্করে রমল সুন্নাত। মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাক'আত নামায আদায় করা ওয়াজিব। তারপর জমজমের পানি পান করা।

গ) উমরাহ্র সাঈ করা।– (ওয়াজিব)

ঘ) মাথা মুন্ডানো বা চুল কাটা।– (ওয়াজিব)। এরপর ইহরাম মুক্ত হওয়া।

তারিখ অনুযায়ী তামাত্তু' হজ্জের কার্যাবলী ঃ

১। ৮ই যিলহজ্জ ফযরের নামাযের পূর্বে হজ্জের জন্য নিজ বাসস্থান থেকে ইহরাম বাঁধা (ফরজ)। তারপর আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

২। ৮ই যিলহজ্জ মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায যোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং ৯ই যিলহজ্জ ফজরের নামায পড়া। – (সুন্নত)

৩। ৯ই যিলহজ্জ আরাফার মাঠে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা (ফরজ)। আরাফাতে গোসল করা। – (সুন্নত)

৪। রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করা এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া। – (ওয়াজিব)

৫। মুযদালিফায় সুবহে ছাদেক হলে ফযরের নামায আদায় ও পূর্ব আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। –(ওয়াজিব)। সূর্যোদয়ের পর 'মীনা'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়া।

৬। মিনাতে ১০ই যিলহজ্জ দুপুরে সূর্য হেলার পূর্বে বড় শয়তানকে ৭টি কংকর মারা। – (ওয়াজিব)

৭। কোরবানী করা। – (ওয়াজিব)

৮। মাথা মুন্ডানো বা মেয়েলোকদের চুল এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটা। –(ওয়াজিব)

৯। তাওয়াফে যিয়ারত (ফরয)

১০। সাঈ করা। –(ওয়াজিব)

১১।১০ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত থেকে ১২ই যিলহজ্জ তারিখ রাত পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা (সুন্নত)

১২। ১১ ও ১২ তারিখ তিনটি শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা। –(ওয়াজিব)

১৩। বিদায়ী তাওয়াফ করা। –(ওয়াজিব)

তামাত্তু' হজ্জ সম্পাদন ঃ

তামাত্তু' হজ্জ সম্পাদনকারী দেশ থেকে রওনা করে মীকাতে পৌঁছার পূর্বে বা মীকাতে পৌঁছে ইহরাম বাঁধবেন। ইহরামের জন্য করণীয় বিষয় হলো–

ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করবেন, নাভির নিম্নদেশের লোম পরিষ্কার করবেন, স্ত্রী সঙ্গে থাকলে এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তার সাথে সহবাসও সারতে পারেন। তারপর ইহরামের নিয়তে গোসল করবেন, ওযু করবেন। এই গোসল শুধু পরিচ্ছন্নতার জন্য। এই কারণে হায়েয ও নেফাসবর্তী মহিলা এবং শিশুদের জন্যও এই গোসল সুন্নত। গোসলের পর শরীর হতে সেলাইযুক্ত কাপড় খুলে ফেলবেন এবং একটি সেলাই বিহীন লুঙ্গি পরিধান করবেন ও একটি চাদর গায়ে জড়াবেন। যদি দুটি কাপড় না থাকে তাহলে একটিই যথেষ্ট। কাপড় সাদা, নতুন অথবা ধোলাইকৃত হওয়া মুস্তাহাব। অবশ্য একদম কোন প্রকার সেলাইযুক্ত না হওয়াই মুস্তাহাব। উহার পর শরীর ও কাপড়ে সুগন্ধি লাগাবেন। পুরুষের জন্য রং বিহীন সুগন্ধি উত্তম এবং মহিলাদের জন্য রং বিশিষ্ট। কিন্তু কাপড়ে এমন সুগন্ধি লাগাতে নেই যার চিহ্ন লাগানোর পরে অবশিষ্ট থাকে। এরপর দুই রাকআত নামায পড়বেন। তবে শর্ত এই যে, তা যেন মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়।

ইহরামের নামায ঃ

"নাওয়াইতুআন উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকয়াতায় ছলাতিল ইহরামে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শরিফাতে আল্লাহু আকবার।" ইহরামের নামাযে প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখলাস পাঠ করবেন। এই নামায মাথা আবৃত করে ইযতেবা ছাড়াই আদায় করবেন। সালাম ফিরানোর পর কেবলামুখী হয়ে বসে মাথা অনাবৃত করে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশা নিয়ে উমরার নিয়্যত করবেন। দাঁড়ায়ে অথবা সওয়ারের উপর বসেও নিয়্যত করা জায়েয। তারপর মুখে বলবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ

উমরার নিয়্যত করবেন– “আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল ওমরাতা ফাইয়াছছিরহালী অতাকাব্বালহা মিননী”।

তারপর তালবিয়াহ পাঠ করবেন। তালবিয়াহ শব্দ সমূহ নিম্নরূপ–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

“লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান, নি’মাতা লাকা ওয়াল্ মুলক্, লা-শারীকা লাক।”

তালবিয়াহ্ তিনবার পাঠ করা মুস্তাহাব। পুরুষরা উচ্চস্বরে এবং মহিলারা নিম্নস্বরে পাঠ করবেন। এখন ইহরাম বাঁধা হল। এখন প্রচুর সংখ্যায় তালবিয়াহ্ পাঠ করতে থাকবেন। বিশেষভাবে অবস্থা পরিবর্তনের সময় ইহরাম বাঁধার পরে ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ হতে বিরত থাকবেন এবং উহার ওয়াজিব ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এছাড়া আর কোন বিশেষ কাজ হরম শরীফে প্রবেশ করা পর্যন্ত করতে হবে না।

হরম শরীফ প্রবেশ ও তাওয়াফ ঃ

যখন হরমের সীমানায় প্রবেশ করবেন (যাহা জিদ্দার দিক হতে গমনকারীদের জন্য মক্কা শরীফ হতে দশ মাইলের দূরত্বে শুরু হয়। সেখানে দুইটি সাদা মিনার তৈরী রয়েছে) তখন সওয়ারী হতে অবতরণ করে নগ্ন পায়ে চলবেন। যদি বেশী দূর হাটতে না পারেন, তবে অল্প কিছু দূর হাটবেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে হরমে প্রবেশ করবেন। প্রচুর পরিমাণে তালবিয়াহ, তাকবীর, তাহলীল প্রভুতি পাঠ করবেন। যখন মক্কা মুকাররামার নিকটবর্তী হবেন, তখন মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বে গোসল করবেন এবং মক্কার কবরস্থান বাবুল মা’লার দিক হতে প্রবেশ করবেন এবং পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّىْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِىْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالًا

“আল্লাহুম্মায্ আল্লি বিহা ক্কারারাউওয়ার্ যুকনি ফিহা রিযক্কান হালালা।”

এবং মাদ’আ নামক স্থানে দো’আ প্রার্থনা করবেন। তারপর যদি মালপত্রের দিক হতে শান্তি ও স্থিরতা বজায় থাকে, তাহলে সোজা মসজিদে হারামে চলে যাবেন। নতুবা মালপত্র বাসায় রেখে পরে মসজিদে হারামে গমন করবেন। বাবুস সালামের পথে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন। প্রথমে ডান পা রাখিবেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রবেশ করবেন। লাব্বায়েকা পড়ে اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ “আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্লী আব্ওয়াবা রহ্মাতিকা” পাঠ করবেন। যখন বায়তুল্লাহ শরীফ দৃষ্টিগোচর হবে তখন اَللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ “আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার” পাঠ করবেন এবং দো’আ করবেন। এই সময় নিম্নোক্ত দো’আটি পড়া সুন্নাত–

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّبِرًّا

"আল্লাহুম্মা যিদ্ বাইতাকা হাজা তাশরীফান ওয়া তাকরীমান ওয়া তাযিমান ওয়া বিররান্।"

তারপর তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাওয়াফে কুদুম সম্পন্ন করবেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাওয়াফের কারণে ফরয নামাযের জামা'আত অথবা বিতর অথবা সুন্নতে মুয়াক্কাদা বাদ পড়ার আশঙ্কা দেখা না দেয়। যদি ভয় থাকে, তাহলে প্রথমে নামায আদায় করে নিবেন। তাওয়াফের জন্য হাজারে আসওয়াদকে সামনে রেখে এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে আপনার ডান কাঁধ হাজারে আসওয়াদের পশ্চিম প্রান্তে (রুকনি ইয়ামানীর দিকে) থাকে। তারপর তাওয়াফের নিয়্যত করবেন। এই নিয়্যত করা ফরয। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বাক্যটি মুখে বলাও উত্তম। ইহা তাওয়াফের মৌখিক নিয়্যত।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّيْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফা বাইতিকাল্ হারামি ছাব্য়াতা আশ্ওয়াতিন ফাইয়াস্সিরহু লী ওয়াতাক্কাব্বাল্হু মিন্নী।"

তারপর ডান দিকে কিঞ্চিত এমনভাবে সরে যাবেন যাতে হাজারে আসওয়াদ একদম সম্মুখে পড়ে। অতঃপর হাজারে আসওয়াদের সামনে দাঁড়ায়ে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে বলবেন-

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ـ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আকবার্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালিল্লাহিল্ হামদু ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ঈমানাম্ বিকা ওয়াতাস্দীকাম্ বিকিতাবিকা ওয়াওয়াফাআম্ বিআহ্দিকা ওয়াইত্তিবাআল্ লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবেন। উভয় হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের উপরে স্থাপন করে দুই হাতের মাঝে মুখ রেখে মৃদুভাবে চুম্বন করতে হবে যেন চড় চড় শব্দ না হয়। কারো কারো মতে হাজারে আসওয়াদের উপরে তিনবার মাথা রাখা মুস্তাহাব। যদি ভিড়ের কারণে চুম্বন করা সম্ভব না হয়, তবে তা পরিহার করবেন। লোকজনকে কষ্ট দিবেন না। এক্ষেত্রে শুধু উভয় হাত হাজারে আসওয়াদের উপরে রেখে পরে হাত দুইটি চুম্বন করবেন। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে কোন কাঠের দ্বারা হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করে সেই কাঠটিতে চুমা খাবেন। যদি

তাও সম্ভব না হয়, তবে উভয় হাতকে এমনভাবে কান পর্যন্ত উঠাবেন যেন হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের দিকে এবং হাতের পিঠ নিজের মুখের দিকে থাকে; আর এই খেয়াল করবেন যে, হাতকে হাজারে আসওয়াদের উপরেই রেখেছেন। তারপর এই দো'আ পাঠ করবেন-

اَللهُ اَكْبَرُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অলহামদুলিল্লাহ্ ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা ছাইয়েদেনীল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।"

এবং উভয় হাতে চুমা খাবেন। তাওয়াফ শুরু করার সামান্য পূর্বে ইযতেবা করবেন অর্থাৎ চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়ে পেঁচিয়ে বাম কাঁধের উপরে রাখবেন এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করবেন। অর্থাৎ সামান্য সদর্পে কাঁধ হেলিয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে বীরোচিত ভঙ্গিতে দ্রুত গতিতে চলবেন। তাওয়াফ আরম্ভ করার পর তালবিয়াহ পাঠ করবেন না। হাজারে আসওয়াদের চুম্বনের পর বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজার দিকে অর্থাৎ নিজের ডান দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাওয়াফের মধ্যে হাতীমকেও শামিল করবেন। যখন রুকনে ইয়ামানী অর্থাৎ বায়তুল্লাহর পশ্চিম দক্ষিণ কোণে পৌঁছবেন, তখন উহাতে শুধু উভয় হাত অথবা ডান হাত লাগাবেন; চুমা দিবেন না। ভিড় থাকলে সেখানে কেবলা ইঙ্গিত করবেন। তারপর যখন হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছবেন, তখন এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন। সম্ভব হলে ১২৪ পৃষ্ঠায় তাওয়াফের অধ্যায় লিখিত তাওয়াফের দো'আ পড়ুন। সাত চক্কর সম্পূর্ণ করার পর অষ্টম বার হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবেন। তাওয়াফ সমাপ্ত হয়ে গেল। তারপর মাকামে ইব্রাহীম (যা বায়তুল্লাহ্‌র পূর্ব দিকে মাতাফের প্রান্তে অবস্থিত)-এর দিকে "ওয়াত্তাখেজু মিম মাকাম ইব্রাহীমা মুসল্লা" পড়তে পড়তে অগ্রসর হবেন এবং মাকামে ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহ্ ও নিজের মাঝখানে রেখে দুই রাকাআত নামায পড়বেন।

মাকামে ইব্রাহীমে নামায ঃ

"নাওয়াইতু আন উছল্লিয়ালিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতায় ছলাতি ওয়াজেবুত তাওয়াফে মুতাওয়াজিহান ইলাজিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতে আল্লাহু আকবার।" প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখলাস পাঠ করবেন।

তাওয়াফের নামায সমাপ্ত করে মুলতাযামের নিকটে আসবেন এবং এটাকে জড়িয়ে ধরবেন। ডান গাল এবং কখনও বাম গাল এর উপরে রাখবেন এবং উভয় হাত উপরের দিকে উঠিয়ে বিনয় ও নম্রতার সাথে দো'আ করবেন। তারপর যমযম কূপের নিকটে আসবেন।

যম্‌যমের পানি পান ঃ

যম্‌যমের পানি কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে খুব পরিতৃপ্তিসহ তিন নিঃশ্বাসে পান করবেন এবং গায়েও কিছু পানি ঢালবেন এবং এই দো'আ পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ عَمَلاً صَالِحًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা ইল্‌মান্ নাফিআন্ ওয়ারিয্‌ক্বান্ ওয়াসিআন্ ওয়া আমালান ছালেহাও্ ওয়াশিফাআম্ মিন্ কুল্লি দাইন্।"

যমযমের পানি পান করে বাবুস সাফার পথে সাঈ'র জন্য মসজিদে হারাম হতে বের হয়ে আসবেন এবং প্রথমে বাম পা রাখবেন। এই সময়

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"আল্লাহুম্মাগ-ফির্‌লী যুনুবী ওয়াফ্ তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতিকা" পড়বেন।

সাফা-মারওয়া সাঈ ঃ সাফার নিকটে পৌঁছে এই দো'আ পাঠ করবেন–

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

"আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি ইন্নাস্ সাফা ওয়াল্ মারওয়াতা মিন্ শাআ-ইরিল্লাহি।"

এবং সাফার এক তৃতীয়াংশ উপরে আরোহণ করবেন। অধিক উপরে উঠবেন না। কেবলামুখী হয়ে উভয় হাতকে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবেন, যেমন দো'আর জন্য উঠিয়ে থাকেন এবং তাকবীর, তাহলীল, হাম্‌দ প্রভৃতি তিন তিনবার পড়বেন।

সাঈর নিয়্যাত ঃ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি উরীদুছ সাঈয়া বাইনাছ্‌ছাফা অলমারওয়াতা ছাবয়াতা আশওয়াতিন ফাইয়াছ্‌ছিরহুলী অতাকাব্বাল্‌হু মিন্নী।" সাঈ-এর অধ্যায়ে (১৩৫ পৃষ্ঠা) যে সকল দো'আ লেখা হয়েছে, সেগুলি পাঠ করবেন। যদি সেসব দো'আ মুখস্থ না থাকে, তবে নিজের ভাষায় দো'আ প্রার্থনা করবেন এবং সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দো'আ করবেন। অতঃপর সাফা হতে নেমে প্রশান্ত চিত্তে মারওয়ার দিকে অগ্রসর হবেন। মসজিদের দেয়ালে স্থাপিত সবুজ বাতি যখন ৬ হাত পরিমাণ দূরে থাকবে, তখন সেখান হতে দ্বিতীয় সবুজ বাতি পর্যন্ত দৌড়িয়ে চলবেন। কিন্তু খুব দ্রুত দৌড়াবেন না। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে এই দো'আ পাঠ করবেন–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

"রাব্বিগ্‌ফির ওয়ারহাম্ আন্‌তাল্ আআ'য্‌যুল্ আক্‌রাম।"

তারপর দ্বিতীয় সবুজ বাতি হতে এগিয়ে যাবার পর স্বাভাবিক গতিতে চলবেন এবং মারওয়ার উপরে আরোহণ করে সামান্য ডান দিকে ঝুঁকবেন যেন মুখ কেবলার দিকে হয়ে যায়। এখানেও হাত উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ সাফার অনুরূপ দো'আ প্রভৃতি পাঠ

করবেন। এভাবে সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত সাঈর এক চক্কর সম্পূর্ণ হল এবং মারওয়া হতে সাফা পর্যন্ত দ্বিতীয় চক্কর হয়ে যাবে। এমনিভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন। সপ্তম চক্কর মারওয়াতে সমাপ্ত করবেন। প্রত্যেক চক্করে যে দো'আ ও তসবীহ মুখস্থ থাকবে এবং যা পাঠে একাগ্রতা আসে তাই পাঠ করবেন। সাঈ-এর পরে মাতাফের প্রান্তে এসে দুই রাকাআত নফল নামায পড়বেন। এবার মনের আকুতি সহ মকছুদ পুরণের জন্য মা-বাবা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমস্ত মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন। এরপর আপনি মাথা মুন্ডান বা চুল ছোট করে হালাল হবেন। ইহরাম ছেড়ে দিন। তবে মহিলাগণ সমস্ত চুল ধরে হাতের আঙ্গুলের এককর পরিমাণ চুল কেটে হালাল হবেন। এভাবে উমরা শেষ হলো। হালাল হয়ে মক্কায় অথবা নিজের জন্মস্থান ব্যতীত অন্য কোথাও অবস্থান করবেন। যখন হজ্জের সময় আসবে তখন হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ পালন করবেন।

৭ই যিলহজ্জ -

হজ্জ পালনের নিয়তে ৭ই যিলহজ্জ তারিখে পূর্বে লিখিত নিয়মে (১) ইহরাম বেঁধে হজ্জের নিয়ত করবেন– "আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল হাজ্জা ফাইয়াছ্ছার্হুলী অতাকাব্বাল্হু মিন্নি"। এরপর তালবিয়া, তাকবীর, দরূদ ছালাম ইত্যাদি পড়বেন।

তামাত্তু' হজ্জের ব্যস্ততম ৫ (পাঁচ) দিন

(৮ই যিলহজ্জ থেকে ১২ই যিলহজ্জ)

৮ই যিলহজ্জে করণীয় ঃ

৮ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর এমন সময় মিনায় (১৫৪ পৃষ্ঠা) পৌঁছবেন যাতে যোহরের নামায মুস্তাহাব ওয়াক্তে সেখানে আদায় করতে পারেন। রাত্রি মিনায় যাপন করবেন এবং যোহর হতে ৯ই যিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের নামায সেখানে পড়বেন।

৯ই যিলহজ্জে করণীয় ঃ

৯ই যিলহজ্জ ফজরের নামায পড়ে সূর্যের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর তালবিয়াহ্ ও তাকবীর পড়তে পড়তে 'যাব'-এর পথে আরাফাত অভিমুখে রওয়ানা হবেন। যখন জাবালে রহমত (আরাফাতের ময়দানের একটি পাহাড়) দৃষ্টিগোচর হবে, তখন দো'আ প্রার্থনা করবেন এবং তাকবীর, তাহলীল ও ইস্তিগফার পড়বেন।

মসজিদে নামিরা (যা আরাফাতের প্রান্তে মক্কা মুকাররামার দিকে অবস্থিত)-এর নিকটে অবস্থান করবেন। পানাহার শেষ করে সূর্য হেলে পড়ার পূর্বেই গোসল করবেন। তারপর মসজিদে নামিরায় গিয়ে বসবেন, ইমামের খোৎবা শ্রবণ করবেন এবং যোহরের নির্ধারিত সময়ে যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়বেন। কিন্তু এতদূভয় নামায একত্রিত পড়ার কতিপয় শর্ত রয়েছে, যা ১৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

নামায সমাপ্ত করে যথাশ্রীঘ্র আরাফাতের ময়দানে নিজের অবস্থান স্থলে গমন করবেন। যদি জাবালে রহমতের নিকটবর্তী যেখানে কালো পাথর বিছানো রয়েছে, সেখানে জায়গা পাওয়া যায়, তবে সেখানেই অবস্থান করবেন। এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবস্থান করার জায়গা। নতুবা যেখানে সম্ভব অবস্থান করবেন। জাবালে রহমতের যথাসম্ভব নিকটে থাকা উত্তম। জাবালে রহমতের উপরে আরোহণ করবেন না, এসময় নিজের অবস্থান স্থলে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। শয়ন, উপবেশন প্রভৃতিও জায়েয (১৫৫ পৃষ্ঠা পড়ুন)। যখন ইমাম খোৎবা পাঠ করবেন, তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করবেন এবং যেসব দো'আ মুখস্থ থাকবে তা অবস্থান স্থলে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়তে থাকবেন। ঘোরাঘুরি ও আনন্দ-তামাশায় সময় নষ্ট করবেন না। কিছুক্ষণ পরপর লাব্বায়কা পড়বেন এবং বেশী বেশী করে তওবা ও ইস্তিগফার করবেন।

আরাফাতের দিন হাজী সাহেবদের জন্য রোযা রাখাও জায়েয, কিন্তু রোযা না রাখাই উত্তম। রোযা না রাখা এবং অতিভোজন না করা উত্তম।

সূর্যাস্তের পরে লাব্বায়কা এবং দো'আ পাঠ করতে করতে ইমামের সাথে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথে মুযদালিফায় গমন করবেন এবং প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে চলবেন। **সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের সীমা অতিক্রম করা জায়েয নয়।** যদি কেহ করেন, তবে দম দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি রাস্তা প্রশস্ত হয় এবং লোকজনের কষ্ট না হয়, তবে সামান্য দ্রুত চলবেন, অন্যথায় মন্থর গতিতে চলবেন। কাউকেও কষ্ট দিবেন না। মুযদালিফায় এসে গোসল অথবা ওযূ করে নিবেন। মসজিদে মাশআরে হারামের নিকটে রাস্তার ডান দিকে অবতরণ করা উত্তম। পথে কোথাও অবস্থান করবেন না।

'ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সার' ব্যতীত মুযদালিফার (১৬১ পৃষ্ঠা দেখুন) যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করতে পারবেন। ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সারে অবস্থান করা জায়েয নেই। মাল-সামান নামানোর পূর্বে মাগরিব এবং এশার নামায এক আযান এবং এক তাকবীরের সাথে এশার সময়ে পড়বেন। দুই নামাযের মাঝে কোন প্রকার সুন্নত, নফল প্রভৃতি পড়বেন না; বরং তা পরে পড়বেন। এই দুই নামাযকে একত্রিত করে পড়ার শর্তসমূহও দেখে নিবেন। আরাফাতের ময়দানে অথবা রাস্তায় মাগরিব ও এশার নামায পড়া জায়েয নেই। যদি কেহ পড়েন, তবে পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে। যদি এশার পূর্বেই মুযদালিফায় পৌঁছে যান তবে এশার ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযও পড়বেন না।

মুযদালিফায় যত বেশী সম্ভব রাত্রি জাগরণ করে এবাদত-বন্দেগী করবেন। এই রজনী শবে-ক্বদর হতেও উত্তম। সুবহে সাদিকের পর অন্ধকার থাকতে প্রথম সময়ে ইমামের সহিত অথবা একাকী যেমন সুযোগ হয় ফজরের নামায পড়ে মাশআরে হারামের নিকটে কেবলামুখী হয়ে লাব্বায়কা অথবা তাসবীহ ও তাহলীল পড়বেন এবং দো'আর মত হাত উপরে তুলে দো'আয় লিপ্ত হবেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে দুই রাকাআত নামায পড়ার পরিমিত সময় বাকী থাকতে মিনা অভিমুখে যাত্রা করবেন। ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সারে পৌঁছার পর দৌড়ায়ে এই স্থানটি পার হয়ে যাবেন।

মুযদালিফা হতে মটরশুটির সমান ৭০টি কংকর তুলে নিবেন। এইসব কংকর রাস্তা অথবা অন্য যে কোন স্থান হতে তোলাও জায়েয তবে জামরাতের নিকট হতে উঠাবেন না।

১০ই যিলহজ্জে করণীয় (শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ ও কোরবানী) ঃ

মিনায় পৌঁছার পর মধ্যবর্তী পথে জামরাতুল উখরার নিকটে এসে নিম্নভূমিতে ৫ হাত অথবা তার চাইতেও বেশী দূরে এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে মিনা ডান দিকে এবং মক্কা মুকররমা বাম দিকে থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদত অঙ্গুলির সাহায্যে কংকর ধরে নিক্ষেপ করবেন এবং প্রথম কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়াহ্ পড়া মুলতবী করবেন। প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় এই দো'আটি পাঠ করবেন– "বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার রগমাল লিশায়তান ওয়া রাদিয়া লিররহমান"।

কংকর নিক্ষেপের সময় হাত এত উপরে তুলবেন না যাতে বগল উন্মুক্ত হয়ে যায়। রামি শেষ করে সেখানে দাঁড়াবেন না, মীনায় নিজের থাকার জায়গায় ফিরে আসবেন।

১০ তারিখের রামির ওয়াক্ত হল সেই দিনের সুবহে সাদিক হতে ১১ তারিখের সুবহে সাদিক পর্যন্ত। কিন্তু সূর্যোদয়ের সময় হতে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত রামী করার সুন্নত সময়। এরপর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুবাহ্ এবং সূর্যাস্ত হতে ফজর পর্যন্ত মাকরূহ সময়। তবে মহিলা, অসুস্থ বা দূর্বলদের জন্য মাকরূহ হবে না।

রামি সমাপ্ত করে কোরবানী করবেন। যদি নিজে যবেহ করতে পারেন, তবে নিজ হাতে যবেহ করাই উত্তম। নিজের কোরবানীকৃত গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। সুতরাং যতটা সম্ভব প্রয়োজন অনুযায়ী কোরবানীর গোশত নিয়া নিবেন। সম্ভব হলে বাকী গোশত সদকা করে দিবেন।

হজ্জে তামাত্তু' পালনকারীর কোরবানী করা ওয়াজিব। কোরবানী করার পর কেবলামুখী হয়ে বসে মাথা মুন্ডন করে নিবেন অথবা চুল ছাঁটাবেন। তবে মাথা মুন্ডানোই উত্তম। এই ক্ষৌর কার্য ডানদিক হতে শুরু করবেন। ক্ষৌর কার্যের শুরুতে এবং পরে তাকবীর বলবেন। মহিলাদের জন্য মাথা মুন্ডন করা জায়েয নয়। সুতরাং তাদের সমস্ত চুলের গোছা ধরে অঙ্গুলের এক কর্ পরিমাণ চুল কেঁটে ফেলা অথবা নিজে কেঁটে ফেলাই তাদের জন্য যথেষ্ট। মহিলারা কোন বেগানা পুরুষকে দিয়া চুল কাটাবেন না। পুরুষের চুল মুন্ডন বা কর্তন করার পর গোঁফ ছাঁটাবেন এবং বগলের লোম পরিষ্কার করবেন। মাথা মুন্ডানো অথবা ছাঁটানোর পূর্বে অন্যান্য পশম পরিষ্কার করা দুরস্ত নাই। ক্ষৌর কার্যের পর নখ, চুল প্রভৃতি দাফন করা উত্তম। ক্ষৌর কার্যের পর যেসব কাজ ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ ছিল, সেসব হালাল হয়ে যাবে। **শুধু স্ত্রী হালাল হবে না**। অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস, চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি হালাল হবে না।

কোরবানী করার পূর্বে মাথা মুন্ডাবেন না। মাথা মুন্ডানোর পূর্বে গোসল করবেন না। মাথা মুন্ডানোর পর গোসল করে পোষাক পরিধান করে আতর লাগিয়ে তাওয়াফে জিয়ারত করার জন্য মক্কা শরীফ যাবেন।

তাওয়াফে জিয়ারত ও সাঈ -

অতঃপর মক্কা মুকাররমায় এসে তাওয়াফে যিয়ারত সমাপন করবেন। পূর্বের নিয়মে তাওয়াফে যিয়ারত (ফরজ), মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দুই রাকাত নামায (ওয়াজিব) ও সাফা-মারওয়া সাঈ করবেন (ওয়াজিব)। এরপর মীনায় প্রত্যাবর্তন করবেন।

১০ই যিলহজ্জ তাওয়াফ যিয়ারত করা উত্তম। তবে ১২ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই তাওয়াফের সময় বাকী থাকে। যদি তাওয়াফে কুদুমের সহিত সাঈ না করে থাকেন, তাহা হলে এই তাওয়াফে রমলও করবেন। যদি ইহরামের কাপড় খুলে সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করে থাকেন, তাহলে ইযতেবা করবেন না। নতুবা ইযতেবাও করবেন।

তাওয়াফে যিয়ারতের পর তাওয়াফের নামায পড়ে হাজারে আসওয়াদের চুম্বন করে বাবুস সাফার পথে বাহির হয়ে সাঈ সম্পন্ন করবেন। যদি তাওয়াফে কুদুমের সহিত সাঈ করে থাকেন, তাহলে এই তাওয়াফে রমল ও ইযতেবা কিছুই করবেন না এবং সাঈও করবেন না; বরং তাওয়াফের পরে মিনায় চলে আসবেন এবং মিনায় অবস্থান করবেন। **তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রী সহবাস প্রভৃতিও হালাল হয়ে যাবে।**

১১ই যিলহজ্জে করণীয় (শয়তানকে পাথর মারা) ঃ

১১ই যিলহজ্জ সূর্য হেলে পড়ার পর তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবেন। এর সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথম জামরায়ে উলা (ইহা মসজিদে খায়েফের নিকটে অবস্থিত)-এর প্রতি কংকর নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর জামরায়ে উসতা অর্থাৎ মাঝখানের জামরায় এবং সব শেষে জামরায়ে উখরায় অর্থাৎ তৃতীয় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবেন। জামরায়ে উলার রামি সমাপ্ত করে সামান্য সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কেবলামুখী হয়ে হাত তুলে দো'আ করবেন এবং যে পরিমাণ সময়ে ২০ আয়াত হতে পৌণে এক পারা কোরআন শরীফ পাঠ করা সম্ভব, সে পরিমাণ সময় দো'আ তাসবীহ তাকবীর, তাহলীল এবং ইস্তিগফার প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকবেন। এমনিভাবে জামরায়ে উসতার রামির পরেও দো'আ করবেন। কিন্তু জামরায়ে উখরার রামির পরে কোন দো'আ করবেন না। বরং রামি শেষ করে যথাশীঘ্র মীনায় নিজের অবস্থানে ফিরে আসবেন।

১২ই যিলহজ্জে করণীয় (শয়তানকে পাথর মারা ও মীনা ত্যাগ) ঃ

১২ তারিখেও সূর্য হেলে পড়ার পর একই পদ্ধতিতে তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবেন। ১২ তারিখের রামি সমাপ্ত করে মক্কা মুকাররমায় চলে যাবেন। কিন্তু ১২ তারিখে সূর্য হেলে পড়ার পর রামি সম্পন্ন করে তবেই মক্কা মুকাররমায় যাওয়া উত্তম। **কোন কারণবশতঃ যদি ১২ তারিখে 'মীনা' ত্যাগ করতে না পারেন এবং ১২ তারিখে রাতে মীনায় অবস্থান করেন, সেই অবস্থায় ১৩ তারিখে রমী ওয়াজিব হয়ে যাবে।**

মিনা হতে যখন ১২ অথবা ১৩ই যিলহজ্জ মক্কা মুকাররমায় আসবেন, তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে মক্কার দিকে অগ্রসর হবেন এবং ওয়াদিয়ে মুহাস্সাবের যা মিনার পথে মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত– যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়বেন। অতঃপর সেখানে

সামান্য সময়ের জন্য শুয়ে পড়বেন। তারপর মক্কায় ফিরে আসবেন। যদি এত সময় সেখানে থাকতে না পরেন, তবে অল্প কিছুক্ষণ হলেও সেখানে অবস্থান করবেন। চাই নিচে অবতরণ করে অথবা সওয়ারীর উপরে থেকে, যেভাবে সহজ মনে হয় করতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ্, আপনার হজ্জ সম্পন্ন হল। এখন যতদিন ইচ্ছা মক্কায় থাকতে পারবেন এবং খুব বেশী বেশী করে তাওয়াফ ও উমরা পালন করবেন। কিন্তু উমরা ১৩ তারিখের পরে করবেন। ৯ই যিলহজ্জ হতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত উমরা নিষিদ্ধ।

যখন মক্কা হতে রওয়ানার ইচ্ছা হবে, তখন তাওয়াফে বিদা’ অর্থাৎ বিদায় তাওয়াফ সম্পন্ন করবেন। এই তাওয়াফ ওয়াজিব। যদি কেহ না করে চলে যান, তাহলে মীকাত হতে বের হওয়ার পূর্বে ফিরে আসা ওয়াজিব হবে। মীকাত হতে বের হয়ে যাওয়ার পর ইচ্ছা করলে দমও পাঠিয়ে দিতে পারবেন অথবা ইহরাম বেঁধে ফিরে এসে প্রথমে উমরা এবং পরে তাওয়াফে বিদা’ সম্পন্ন করবেন। কিন্তু কেহ যদি তাওয়াফে যিয়ারতের পরে কোন নফল তাওয়াফ করে থাকেন, তাহলে তাহার তাওয়াফে বিদা’ আদায় হয়ে যাবে। যদিও ইহার কোন নিয়ত না থাকে। কিন্তু ঠিক বিদায় মুহূর্তেই এই তাওয়াফে বিদা’ পালন করবেন। তাওয়াফে বিদা’-এর পর মাকামে ইব্রাহীমের নিকটে তাওয়াফের দুই রাকআত নামায আদায় করে যমযম কূপে আগমন করতঃ কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পেট ভরে তিন শ্বাসে পানি পান করবেন এবং প্রত্যেক শ্বাসে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকাবেন। পানি পান করার সময় এই দো’আ পড়বেন–

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“বিস্‌মিল্লাহি ওয়াল্ হামদুলিল্লাহে ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।”

এবং সর্বশেষ চুমুকে এই দো’আ পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ عَمَلًا صَالِحًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

“আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা ইল্‌মান্ নাফিআন্ ওয়ারিয্‌ক্বান্ ওয়াসিআন্ ওয়া আমালান ছালেহাও্ ওয়াশিফাআম্ মিন্ কুল্লি দাইন্।”

তারপর অবশিষ্ট পানি মাথায়, মুখে এবং শরীরের উপরে ঢেলে দিবেন এবং মুলতাযামের নিকটে এসে নিজের বুক আর ডান গাল কা’বা শরীফের দেওয়ালের উপরে রাখবেন, ডান হাত দরজার চৌকাঠের দিকে বাড়াবেন এবং যেভাবে একজন দাসানুদাস তার প্রভুর জামার ঝুল ধরে নিজের অপরাধ মাফ করায়, তেমনিভাবে কা’বার পর্দা ধরে কান্নাকাটির সাথে ইস্তিগফার, তস্‌বীহ, তাহলীল, দো’আ-দরূদ প্রভৃতিতে দীর্ঘক্ষণ মশগুল থাকবেন। যদি কান্না না আসে, তবে রোদনকারীদের ন্যায় আকৃতি ধারণ করবেন। তারপর কা’বার চৌকাঠ চুম্বন করবেন এবং দো’আ প্রার্থনা করবেন। অতঃপর হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করে কা’বা শরীফের দিকে বেদনার্ত চোখে এতিমের মত তাকাতে তাকাতে, এর বিচ্ছেদের জন্য আফসোস করতে করতে, উল্টা পায়ে, কা’বার দিকে মুখ

রেখে বাবুল বিদা'র পথে বাইরে আসবেন। ফকীর-মিসকীনদেরকে সদকা-খয়রাত দিবেন এবং দো'আ প্রার্থনা করবেন। হায়েয ও নেফাসবতী মহিলা যদি রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত পাক না হন, তাহলে তার উপর হতে তওয়াফে বিদা' রহিত হয়ে যাবে। তিনি মসজিদের বাইরে বাবুল বিদা'র উপরে দাঁড়িয়ে আফসোস সহকারে ও বিনীতভাবে দো'আ প্রার্থনা করবেন। মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করবেন না।

হজ্জে তামাত্তু'র শর্ত সমূহ

১। তামাত্তু'-এর জন্য আফাকী অর্থাৎ মীকাতের বাইরে বসবাসকারী হওয়া শর্ত। মক্কা মুকাররমায় বসবাসকারী এবং মীকাতের ভেতরে বসবাসকারীদের জন্য তামাত্তু' জায়েয নেই।

২। পূর্ণ উমরাহ্ অথবা উমরাহ্র তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর হজ্জের মাস সমূহে সম্পন্ন করা, যদিও উমরাহর ইহরাম হজ্জের মাস সমূহের পূর্বেই বেঁধে থাকেন।

৩। হজ্জের ইহরামের পূর্বে উমরার সমগ্র তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ সমাপন করা। যদি কেউ পুরা তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ চক্কর সমাপ্ত করার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধেন তাহলে তামাত্তু' শুদ্ধ হবে না, ক্বিরান হবে।

৪। হজ্জ এবং উমরাহ্ একই বছরে সমাপন করতে হবে। যদি কেউ হজ্জের মাস সমূহে এক বছরে উমরাহ্র তাওয়াফ সমাপন করেন এবং দ্বিতীয় বছর হজ্জ সম্পন্ন করেন, তাহলে তামাত্তু' হবে না, যদি নিজের বাড়ী–ঘরে নাও গিয়ে থাকেন।

৫। হজ্জ এবং উমরা উভয়কে একই সফরে সমাপন করা। যদি কেউ হজ্জের মাস সমূহে উমরাহ সম্পন্ন করতঃ ইহরাম খুলে বাড়ী চলে যান এবং পরে হজ্জ সমাপন করেন, তাহলে তামাত্তু' হবে না। আর যদি তাওয়াফে উমরাহ্র পরে মাথা মুন্ডানের পূর্বেই বাড়ী চলে যান এবং তারপর ফিরে এসে হজ্জ সম্পন্ন করেন তবে 'তামাত্তু' হবে না। আর যদি তাওয়াফে উমরাহ্র পরে মাথা মুন্ডানের পরেই বাড়ী চলে যান এবং তারপর ফিরে এসে হজ্জ সম্পন্ন করেন তবে 'তামাত্তু' হয়ে যাবে। এভাবে যদি মাথা মুন্ডানোর পরে হরম থেকে বাইরে চলে যান, কিন্তু মীকাতের ভেতরে থাকেন আর ফিরে এসে হজ্জ সম্পন্ন করেন, তবে তাতেও তামাত্তু' হয়ে যাবে।

৬। উমরাহ্ ফাসেদ না করা। যদি কেউ উমরাহ ফাসেদ করে উমরাহ্র পরে হজ্জ করেন, তাহলে তামাত্তু' হবে না।

৭। হজ্জ ফাসেদ না করা। যদি কেউ উমরাহ্ ফাসেদ না করেন এবং হজ্জ ফাসেদ করে বসেন, তাহলেও তামাত্তু' হবে না।

হজ্জে তামাত্তু'র মাসআলা ঃ

১। তামাত্তু' পালনকারীর জন্য ক্বেরান-এর ন্যায় কোরবানী ওয়াজিব। জামরায়ে উখরায় রমী সম্পন্ন করার পরে যবেহ্ করতে হবে।

২। তামাত্তু’ পালনকারীর জন্য কোরবানীর পশু সঙ্গে করে আনা উত্তম। যদি কোরবানীর পশু সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাহলে প্রথম উমরার ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে এবং পরে কোরবানীর জন্তুকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৩। যদি কোরবানীর পশু গরু অথবা উট হয়, তবে এর গলায় মালা বা হার পরাতে হবে। হারের অর্থ- জুতা অথবা ঝুলির টুক্‌রা অথবা গাছের ছাল ইত্যাদি রশিতে বেঁধে পশুর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া।

৪। ইশ্‌আর করা মুস্তাহাব। তবে এই শর্ত যে, ইশ্‌আর করা জানতে হবে। নতুবা মাকরূহ। ইশ্‌আর এই যে, উটের কুঁজের নীচের অংশে এমন হালকা গর্ত করা যাতে শুধু চামড়া চিরিবে, কিন্তু গোশ্‌ত এবং হাঁড় পর্যন্ত গর্ত পৌঁছবে না। যখম হতে যে রক্ত ক্ষরণ হবে, তা দ্বারা পশুর কুঁজ রঞ্জিত করে দিতে হবে।

৫। কোরবানীর পশু সঙ্গে করে আনয়নকারী উমরা সমাপন না করে মাথা মুন্ডন করবে না। যদি মাথা মুন্ডায়ে ফেলেন অথবা ইহ্‌রামের আরো কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলেন, তাহলে ক্ষতিপূরণ (দম) ওয়াজিব হবে।

৬। কোরবানীর পশু সঙ্গে আনয়নকারী যখন রমী সম্পন্ন করতঃ দমে তামাত্তু’ যবেহ্ করে মাথা মুন্ডন করবেন, তখন উভয় ইহ্‌রাম হতে মুক্ত হয়ে যাবেন, কিন্তু এর পূর্ব পর্যন্ত উভয় ইহ্‌রামই বহাল থাকবে।

৭। তামাত্তু পালনকারী এক উমরার পরে হজ্জের পূর্বে দ্বিতীয় উমরাও করতে পারবেন।

৮। তামাত্তু’ পালনকারী ৮ই যিলহজ্জ তারিখে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবেন। বরং এর পূর্বেই বাঁধা উত্তম। হরমের যেখান হতে ইচ্ছা ইহ্‌রাম বাঁধতে পারবেন। কিন্তু মসজিদে হারাম হতে ইহরাম বাঁধা উত্তম। আর হাতীম হতে বাঁধা তদপেক্ষাও অধিকতর উত্তম।

৯। তামাত্তু’ সমাপনকারী যদি ৮ই যিলহজ্জ ইহ্‌রাম বেঁধে প্রথমেই হজ্জের সাঈ করতে চান, তবে রমল ও ইযতেবাসহ একটি নফল তাওয়াফ সম্পন্ন করে তবেই সাঈ করবেন। অন্যথায় তাওয়াফে যিয়ারতের পরে সাঈ করবেন।

১০। তামাত্তু’ পালনকারীর জন্য তাওয়াফে কুদুম ওয়াজিব নয়। উমরা পালন করার পর যত বেশী ইচ্ছা নফল তাওয়াফ করতে পারবেন।

ইফরাদ হজ্জ আদায়ের নিয়মাবলী

ইফরাদ হজ্জের বর্ণনা ঃ

ইফরাদ শব্দের অর্থ উমরা ছাড়া এককভাবে হজ্জ সম্পন্ন করা। এ হজ্জ আদায়কারীকে মুফরিদ বলে। মুফরিদ শব্দের পারিভাষিক অর্থ এককভাবে শুধু হজ্জ সমাপন করা। এর সাথে ক্বেরান অথবা তামাত্তো’-এর ন্যায় উমরা পালন করতে হয় না।

তারিখ অনুযায়ী ইফরাদ হজ্জের কার্যাবলী

১। শুধুমাত্র হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা (মীকাতা থেকে)।

২। তাওয়াফে কুদুম ইযতিবা ও রমল সহকারে করা, মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু'রাকআত ওয়াজিব নামায আদায় করা, তৎপর সাঈ করা কিন্তু মাথা মুন্ডানো বা চুল কাটা যাবে না।

৩। ৮ই যিলহজ্জ মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া (সুন্নাত) (৯ই যিলহজ্জ ফযরের নামাযসহ)।

৪। ৯ই যিলহজ্জ আরাফায় অবস্থান করা (ফরয)। সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় রওয়ানা দেওয়া। আরাফাতের গোসল করা (সুন্নত)।

৫। ৯ই যিলহজ্জ রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করা (ওয়াজিব) এবং রাতে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায়, সুবহে ছাদেক হলে ফজরের নামায আদায় ও পূর্ব আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা (ওয়াজিব)।

৬। ১০ই যিলহজ্জ দুপুরের পূর্বে বড় শয়তানকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করা। (ওয়াজিব)।

৭। কোরবানী করা।– (ইচ্ছাধীন)

৮। পুরুষের মাথা মুন্ডানো, মেয়ে লোকের এক ইঞ্চি পরিমাণ চুল কাটা।– (ওয়াজিব)

৯। তাওয়াফে যিয়ারত (ফরয) এবং সাঈ করা।– (ওয়াজিব)

১০। ১০ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত থেকে ১২ যিলহজ্জ রাত পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা (সুন্নাত) এবং ১০, ১১ ও ১২ তারিখ তিনটি শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা।– (ওয়াজিব)

১১। বিদায়ী তাওয়াফ করা।– (ওয়াজিব)

ইফরাদ হজ্জ সম্পাদন ঃ

ইফরাদ হজ্জ আদায়কারী মীকাতে পৌঁছিয়ে ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করবেন, নাভির নিম্নদেশের লোম পরিষ্কার করবেন, স্ত্রী সঙ্গে থাকলে এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তার সাথে সহবাসও সারতে পারেন। তারপর ইহরামের নিয়তে গোসল করবেন, ওযু করবেন। এই গোসল শুধু পরিচ্ছন্নতার জন্য। এই কারণে হায়েয ও নেফাসবর্তী মহিলা এবং শিশুদের জন্যও এই গোসল সুন্নত। গোসলের পর শরীর হতে সেলাইযুক্ত কাপড় খুলে ফেলবেন এবং একটি সেলাই বিহীন লুঙ্গি পরিধান করবেন ও একটি চাদর গায়ে জড়াবেন। যদি দুটি কাপড় না থাকে তাহলে একটিই যথেষ্ট। কাপড় সাদা, নতুন অথবা ধোলাইকৃত হওয়া মুস্তাহাব। অবশ্য একদম কোন প্রকার সেলাইযুক্ত না হওয়াই মুস্তাহাব। উহার পর শরীর ও কাপড়ে সুগন্ধি লাগাবেন। পুরুষের জন্য রং বিহীন সুগন্ধি উত্তম এবং মহিলাদের জন্য রং বিশিষ্ট। কিন্তু কাপড়ে এমন সুগন্ধি লাগাতে নেই যার চিহ্ন লাগানোর পরে অবশিষ্ট থাকে। এরপর দুই রাকআত নামায পড়বেন। তবে শর্ত এই যে, তা যেন মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়।

ইহরামের নামায ঃ

"নাওয়াইতুআন উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকয়াতায় ছলাতিল ইহরামে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শরিফাতে আল্লাহু আকবার।" ইহরামের নামাযে প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখলাস পাঠ করবেন। এই নামায মাথা আবৃত করে ইযতেবা ছাড়াই আদায় করবেন। সালাম ফিরানোর পর কেবলামুখী হয়ে বসে মাথা অনাবৃত করে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশা নিয়ে হজ্জের নিয়্যত করবেন। দাঁড়ায়ে অথবা সওয়ারের উপর বসেও নিয়ত করা জায়েয। তারপর মুখে বলবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

হজ্জের নিয়্যত করবেন– "আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল হাজ্জা ফাইয়াছছিরহুলি অতাকাব্বাল্‌হু মিননী"।

তারপর তালবিয়াহ পাঠ করবেন। তালবিয়াহ শব্দ সমূহ নিম্নরূপ–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

"লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান, নি'মাতা লাকা ওয়াল্ মুলক্, লা-শারীকা লাক।"

তালবিয়াহ্ তিনবার পাঠ করা মুস্তাহাব। পুরুষরা উচ্চস্বরে এবং মহিলারা নিম্নস্বরে পাঠ করবেন। এখন ইহরাম বাঁধা হল। এখন প্রচুর সংখ্যায় তালবিয়াহ্ পাঠ করতে থাকবেন। বিশেষভাবে অবস্থা পরিবর্তনের সময় ইহরাম বাঁধার পরে ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ হতে বিরত থাকবেন এবং এর ওয়াজিব ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এছাড়া আর কোন বিশেষ কাজ হরম শরীফে প্রবেশ করা পর্যন্ত করতে হবে না।

হরম শরীফ প্রবেশ ও তাওয়াফ ঃ

যখন হরমের সীমানায় প্রবেশ করবেন (যাহা জিদ্দার দিক হতে গমনকারীদের জন্য মক্কা শরীফ হতে দশ মাইলের দূরত্বে শুরু হয়। সেখানে দুইটি সাদা মিনার তৈরী রয়েছে) তখন সওয়ারী হতে অবতরণ করে নগ্ন পায়ে চলবেন। যদি বেশী দূর হাটতে না পারেন, তবে অল্প কিছু দূর হাটবেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে হরমে প্রবেশ করবেন। প্রচুর পরিমাণে তালবিয়াহ, তাকবীর, তাহলীল প্রভুতি পাঠ করবেন। যখন মক্কা মুকাররামার নিকটবর্তী হবেন, তখন মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বে গোসল করবেন এবং মক্কার কবরস্থান বাবুল মা'লার দিক হতে প্রবেশ করবেন এবং পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّىْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِىْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالًا

"আল্লাহুম্মায্ আল্লি বিহা ক্বারারাউওয়ার্ যুকনি ফিহা রিযক্বান হালালা।"

এবং মাদ'আ নামক স্থানে দো'আ প্রার্থনা করবেন। তারপর যদি মালপত্রের দিক হতে শান্তি ও স্থিরতা বজায় থাকে, তাহলে সোজা মসজিদে হারামে চলে যাবেন। নতুবা মালপত্র বাসায় রেখে পরে মসজিদে হারামে গমন করবেন। বাবুস সালামের পথে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন। প্রথমে ডান পা রাখবেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রবেশ করবেন। লাব্বায়েকা পড়ে اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ "আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্লী আব্ওয়াবা রহ্মাতিকা" পাঠ করবেন। যখন বায়তুল্লাহ শরীফ দৃষ্টিগোচর হবে তখন اَللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ "আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" পাঠ করবেন এবং দো'আ করবেন। এই সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়াও সুন্নাত–

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّبِرًّا

"আল্লাহুম্মা যিদ্ বাইতাকা হাজা তাশরীফান ওয়া তাকরীমান ওয়া তাযিমান ওয়া বিররান্।"

তারপর তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাওয়াফে কুদুম সম্পন্ন করবেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাওয়াফের কারণে ফরয নামাযের জামা'আত অথবা বিতর অথবা সুন্নতে মুয়াক্কাদা বাদ পড়ার আশঙ্কা দেখা না দেয়। যদি ভয় থাকে, তাহলে প্রথমে নামায আদায় করে নিবেন। তাওয়াফের জন্য হাজারে আসওয়াদের সামনে এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে ডান কাঁধ হাজারে আসওয়াদের বাম দিকের সামনে থাকে আর সমগ্র হাজারে আসওয়াদ বাম দিকে থাকে। তারপর তাওয়াফের নিয়্যত করিবেন। এই নিয়ত করা ফরয। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বাক্যটি মুখে বলাও উত্তম। ইহা তাওয়াফের মৌখিক নিয়্যত।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّيْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফা বাইতিকাল্ হারামি ছাব্য়াতা আশ্ওয়াতিন ফাইয়াস্সিরহু লী ওয়াতাক্বাব্বাল্হু মিন্নী।"

তারপর ডান দিকে কিঞ্চিৎ এমনভাবে সরে যাবেন যাতে হাজারে আসওয়াদ একদম সম্মুখে পড়ে। অতঃপর হাজারে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে বলবেন-

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ـ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আকবার্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালিল্লাহিল্ হামদু ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ঈমানাম্ বিকা ওয়াতাস্দীকাম্

বিকিতাবিকা ওয়াওয়াফাআম্ বিআহ্দিকা ওয়াইত্তিবাআল্ লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবেন। উভয় হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের উপরে স্থাপন করে দুই হাতের মাঝে মুখ রেখে মৃদুভাবে চুম্বন করতে হবে যেন চড় চড় শব্দ না হয়। কারো কারো মতে হাজারে আসওয়াদের উপরে তিনবার মাথা রাখা মুস্তাহাব। যদি ভিড়ের কারণে চুম্বন করা সম্ভব না হয়, তবে তা পরিহার করবেন। লোকজনকে কষ্ট দিবেন না। এক্ষেত্রে শুধু উভয় হাত হাজারে আসওয়াদের উপরে রেখে পরে হাত দুইটি চুম্বন করবেন। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে কোন কাঠের দ্বারা হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করে সেই কাঠটিতে চুমা খাবেন। যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে উভয় হাতকে এমনভাবে কান পর্যন্ত উঠাবেন যেন হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের দিকে এবং পিঠ নিজের মুখের দিকে থাকে; আর এই খেয়াল করবেন যে, হাতকে হাজারে আসওয়াদের উপরেই রেখেছেন। তারপর এই দো'আ পাঠ করবেন-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অলহামদুলিল্লাহ্ ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা ছাইয়েদেনীল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।"

এবং উভয় হাতে চুমা খাবেন। তাওয়াফ শুরু করার সামান্য পূর্বে ইযতেবা করবেন অর্থাৎ চাদরকে ডান বগলের নীচ দিয়ে পেঁচিয়ে বাম কাঁধের উপরে রাখবেন এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করবেন। অর্থাৎ সামান্য সদর্পে কাঁধ হেলিয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে বীরোচিত ভঙ্গিতে দ্রুত গতিতে চলবেন। তাওয়াফ আরম্ভ করার পর তালবিয়াহ পাঠ করবেন না। হাজারে আসওয়াদের ইস্তিলামের পর বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজার দিকে অর্থাৎ নিজের ডান দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাওয়াফের মধ্যে হাতীমকেও শামিল করবেন। যখন রুকনে ইয়ামানী অর্থাৎ বায়তুল্লাহর পশ্চিম দক্ষিণ কোণে পৌঁছবেন, তখন উহাতে শুধু উভয় হাত অথবা ডান হাত লাগাবেন; চুমা দিবেন না। ভিড় থাকলে সেখানে ইঙ্গিতও করবেন না। তারপর যখন হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছবেন, তখন এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন। সম্ভব হলে ১২৪ পৃষ্ঠায় তাওয়াফের অধ্যায় লিখিত তাওয়াফের দো'আ পড়ুন। সাত চক্কর সম্পূর্ণ করার পর অষ্টম বার হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবেন। তাওয়াফ সমাপ্ত হয়ে গেল। তারপর মাকামে ইব্রাহীম (যা বায়তুল্লাহ্র পূর্ব দিকে মাতাফের প্রান্তে অবস্থিত)-এর দিকে "ওয়াত্তাখেজু মিম মাকামে ইব্রাহীমা মুসল্লা" পড়তে পড়তে অগ্রসর হবেন এবং মাকামে ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহ ও নিজের মাঝখানে রেখে দুই রাকাআত নামায পড়বেন।

মাকামে ইব্রাহীমে নামায ঃ

"নাওয়াইতু আন উছল্লিয়ালিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতায় ছলাতি ওয়াজেবুত তাওয়াফে মুতাওয়াজিহান ইলাজিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতে আল্লাহু আকবার।" প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখলাস পাঠ করবেন। যদি সেখানে জায়গা পাওয়া না যায় তবে যেখানে সম্ভব হয় পড়বেন।

তাওয়াফের নামায সমাপ্ত করে মুলতাযামের নিকটে আসবেন এবং এটাকে জড়িয়ে ধরবেন। ডান গাল এবং কখনও বাম গাল এর উপরে রাখবেন এবং উভয় হাত উপরের দিকে উঠিয়ে বিনয় ও নম্রতার সাথে দো'আ করবেন। তারপর যমযম কূপের নিকটে আসবেন।

যম্‌যমের পানি পান ঃ

কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে খুব পরিতৃপ্তি সহকারে তিন নিঃশ্বাসে যম্‌যমের পানি পান করবেন এবং গায়েও কিছু পানি ঢালবেন এবং এই দো'আ পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ عَمَلًا صَالِحًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা ইল্‌মান্ নাফিআন্ ওয়ারিয্‌ক্বান্ ওয়াসিআন্ ওয়া আমালান ছালেহাও্‌ ওয়াশিফাআম্ মিন্ কুল্লি দাইন্।"

যম্‌যমের পানি পান করে বাবুস সাফার পথে সাঈ'র জন্য মসজিদে হারাম হতে বের হয়ে আসবেন এবং প্রথমে বাম পা রাখবেন। এই সময় اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ "আল্লাহুম্মাগ-ফির্‌লী যুনুবী ওয়াফ্ তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতিকা" পড়বেন।

সাফা-মারওয়া সাঈ ঃ

সাফার নিকটে পৌঁছে এই দো'আ পাঠ করবেন–

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

"আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি ইন্নাস্ সাফা ওয়াল্ মারওয়াতা মিন্ শাআ-ইরিল্লাহি।"

এবং সাফার এক তৃতীয়াংশ উপরে আরোহণ করবেন। অধিক উপরে উঠবেন না। কেবলামুখী হয়ে উভয় হাতকে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবেন, যেমন দো'আর জন্য উঠিয়ে থাকেন এবং তাকবীর, তাহলীল, হাম্‌দ প্রভৃতি তিন তিনবার পড়বেন।

সাঈর নিয়্যাত ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি উরীদুছ সাঈয়া বাইনাছ্‌ছাফা অলমারওয়াতা ছাবয়াতা আশওয়াতিন ফাইয়াছছিরহুলী অতাকাব্বাল্‌হু মিন্নী।" সাঈ-এর অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা- ১৩৫) যে সকল দো'আ লেখা হয়েছে, সেগুলি পাঠ করবেন। যদি সেসব দো'আ মুখস্থ না থাকে, তবে নিজের ভাষায় দো'আ প্রার্থনা করবেন এবং সেখানে

দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দো'আ করবেন। অতঃপর সাফা হতে নেমে প্রশান্ত চিত্তে মারওয়ার দিকে অগ্রসর হবেন। মসজিদের দেয়ালে স্থাপিত সবুজ বাতি যখন ৬ হাত পরিমাণ দূরে থাকবে, তখন সেখান হতে দ্বিতীয় সবুজ বাতি পর্যন্ত দৌঁড়িয়ে চলবেন। কিন্তু খুব দ্রুত দৌঁড়াবেন না। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে এই দো'আ পাঠ করবেন–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"রাব্বিগ্ফির ওয়ারহাম্ আন্তাল্ আআ'য্যুল্ আক্রাম।"

তারপর দ্বিতীয় সবুজ বাতি হতে এগিয়ে যাবার পর স্বাভাবিক গতিতে চলবেন এবং মারওয়ার উপরে আরোহণ করে সামান্য ডান দিকে ঝুঁকবেন যেন মুখ কেবলার দিকে হয়ে যায়। এখানেও হাত উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ সাফার অনুরূপ দো'আ প্রভৃতি পাঠ করবেন। এভাবে সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত সাঈর এক চক্কর সম্পূর্ণ হল এবং মারওয়া হতে সাফা পর্যন্ত দ্বিতীয় চক্কর হয়ে যাবে। এমনিভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন। সপ্তম চক্কর মারওয়াতে সমাপ্ত করবেন। প্রত্যেক চক্করে যে দো'আ ও তসবীহ মুখস্থ থাকলে এবং যা পাঠে একাগ্রতা আসে তাই পাঠ করবেন। সাঈ-এর পরে মাতাফের প্রান্তে এসে দুই রাকাআত নফল নামায পড়বেন।

হজ্জে এফরাদ পালনকারী তাওয়াফে কুদুম এবং সাঈ সম্পন্ন করার পর ইহরাম বাঁধা অবস্থায়ই মক্কা মুকাররামায় অবস্থান করবেন এবং যত অধিক সম্ভব নফল তাওয়াফ করতে থাকবেন এবং ইহরামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ হতে বিরত থাকবেন। কোন উমরা পালন করবেন না। ৭ই যিলহজ্জ ইমাম খোৎবা পড়লে উহা মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করবেন।

ইফরাদ হজ্জের ব্যস্ততম পাঁচ দিন

(৮ই যিলহজ্জ থেকে ১২ই যিলহজ্জ)

৮ই যিলহজ্জে করণীয় ঃ

৮ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর এমন সময় মিনায় (১৫৪ পৃষ্ঠা) পৌঁছবেন যাতে যোহরের নামায মুস্তাহাব ওয়াক্তে সেখানে আদায় করতে পারেন। রাত্রি মিনায় যাপন করবেন এবং যোহর হতে ৯ই যিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের নামায সেখানে পড়বেন।

৯ই যিলহজ্জে করণীয় ঃ

৯ই যিলহজ্জ ফজরের নামায পড়ে সূর্যের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর তালবিয়াহ্ ও তাকবীর পড়তে পড়তে 'যাব'-এর পথে আরাফাত অভিমুখে রওয়ানা হবেন। যখন জাবালে রহমত (আরাফাতের ময়দানের একটি পাহাড়) দৃষ্টিগোচর হবে, তখন দো'আ প্রার্থনা করবেন এবং তাকবীর, তাহলীল ও ইস্তিগফার পড়বেন।

মসজিদে নামিরা (যা আরাফাতের প্রান্তে মক্কা মুকাররামার দিকে অবস্থিত)-এর নিকটে অবস্থান করবেন। পানাহার শেষ করে সূর্য হেলে পড়ার পূর্বেই গোসল করবেন। তারপর মসজিদে নামিরায় গিয়ে বসবেন, ইমামের খোৎবা শ্রবণ করবেন এবং যোহরের

নির্ধারিত সময়ে যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়বেন। কিন্তু এতদূভয় নামায একত্রিত পড়ার কতিপয় শর্ত রয়েছে, যা বর্ণনা করা হবে।

নামায সমাপ্ত করে যথাশ্রীঘ্র আরাফাতের ময়দানে নিজের অবস্থান স্থলে গমন করবেন। যদি জাবালে রহমতের নিকটবর্তী যেখানে কালো পাথর বিছানো রয়েছে, সেখানে জায়গা পাওয়া যায়, তবে সেখানেই অবস্থান করবেন। এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবস্থান করার জায়গা। নতুবা যেখানে সম্ভব অবস্থান করবেন। জাবালে রহমতের যথাসম্ভব নিকটে থাকা উত্তম। জাবালে রহমতের উপরে আরোহণ করবেন না, এসময় নিজের অবস্থান স্থলে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। শয়ন, উপবেশন প্রভৃতিও জায়েয (১৫৫ পৃষ্ঠা পড়ুন)। যখন ইমাম খোৎবা পাঠ করবেন, তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করবেন এবং যেসব দো'আ মুখস্থ থাকবে তা অবস্থান স্থলে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়তে থাকবেন। ঘোরাঘুরি ও আনন্দ-তামাশায় সময় নষ্ট করবেন না। কিছুক্ষণ পরপর লাব্বায়কা পড়বেন এবং বেশী বেশী করে তওবা ও ইস্তিগফার করবেন।

আরাফাতের দিন হাজী সাহেবদের জন্য রোযা রাখাও জায়েয, কিন্তু রোযা না রাখাই উত্তম। রোযা না রাখা এবং অতিভোজন না করা উত্তম।

সূর্যাস্তের পরে লাব্বায়কা এবং দো'আ পাঠ করতে করতে ইমামের সাথে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথে মুযদালিফায় গমন করবেন এবং প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে চলবেন। **সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের সীমা অতিক্রম করা জায়েয নয়।** যদি কেহ করেন, তবে দম দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি রাস্তা প্রশস্ত হয় এবং লোকজনের কষ্ট না হয়, তবে সামান্য দ্রুত চলবেন, অন্যথায় মন্থর গতিতে চলবেন। কাউকেও কষ্ট দিবেন না। মুযদালিফায় এসে গোসল অথবা ওযূ করে নিবেন। মসজিদে মাশআরে হারামের নিকটে রাস্তার ডান দিকে অবতরণ করা উত্তম। পথে কোথাও অবস্থান করবেন না।

'ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সার' ব্যতীত মুযদালিফার (১৬১ পৃষ্ঠা দেখুন) যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করতে পারবেন। ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সারে অবস্থান করা জায়েয নেই। মাল-সামান নামানোর পূর্বে মাগরিব এবং এশার নামায এক আযান এবং এক তাকবীরের সাথে এশার সময়ে পড়বেন। দুই নামাযের মাঝে কোন প্রকার সুন্নত, নফল প্রভৃতি পড়বেন না; বরং তা পরে পড়বেন। এই দুই নামাযকে একত্রিত করে পড়ার শর্তসমূহও দেখে নিবেন। আরাফাতের ময়দানে অথবা রাস্তায় মাগরিব ও এশার নামায পড়া জায়েয নেই। যদি কেহ পড়েন, তবে পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে। যদি এশার পূর্বেই মুযদালিফায় পৌঁছে যান তবে এশার ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযও পড়বেন না।

মুযদালিফায় যত বেশী সম্ভব রাত্রি জাগরণ করে এবাদত-বন্দেগী করবেন। এই রজনী শবে-ক্বদর হতেও উত্তম। সুবহে সাদিকের পর অন্ধকার থাকতে প্রথম সময়ে ইমামের সহিত অথবা একাকী যেমন সুযোগ হয় ফজরের নামায পড়ে মাশআরে হারামের নিকটে কেবলামুখী হয়ে লাব্বায়কা অথবা তাসবীহ ও তাহলীল পড়বেন এবং দো'আর মত হাত উপরে তুলে দো'আয় লিপ্ত হবেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে দুই রাকাআত নামায পড়ার

পরিমিত সময় বাকী থাকতে মিনা অভিমুখে যাত্রা করবেন। ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সারে পৌঁছার পর দৌঁড়িয়ে এই স্থানটি পার হয়ে যাবেন।

মুযদালিফা হতে মটরশুটির সমান ৭০টি কংকর তুলে নিবেন। এইসব কংকর রাস্তা অথবা অন্য যে কোন স্থান হতে তোলাও জায়েয তবে জামরাতের নিকট হতে উঠাবেন না।

১০ই যিলহজ্জে করণীয় (শয়তানকে পাথর মারা ও কোরবানী) ঃ

মিনায় পৌঁছার পর মধ্যবর্তী পথে জামরাতুল উখরার নিকটে এসে নিম্নভূমিতে ৫ হাত অথবা তার চাইতেও বেশী দূরে এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে মিনা ডান দিকে এবং মক্কা মুকররমা বাম দিকে থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদত অঙ্গুলির সাহায্যে কংকর ধরে নিক্ষেপ করবেন এবং প্রথম কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়াহ্ পড়া মুলতবী করবেন। প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় এই দো'আটি পাঠ করবেন– **"বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার রগমাল লিশ্‌শায়তান ওয়া রাদিয়া লিররহমান"।**

কংকর নিক্ষেপের সময় হাত এত উপরে তুলবেন না যাতে বগল উন্মুক্ত হয়ে যায়। রামি শেষ করে সেখানে দাঁড়াবেন না, মীনায় নিজের থাকার জায়গায় ফিরে আসবেন।

১০ তারিখের রামির ওয়াক্ত হল সেই দিনের সুবহে সাদিক হতে ১১ তারিখের সুবহে সাদিক পর্যন্ত। কিন্তু সূর্যোদয়ের সময় হতে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত রামী করার সুন্নত সময়। এরপর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুবাহ্ এবং সূর্যাস্ত হতে ফজর পর্যন্ত মাকরূহ সময়। তবে মহিলা, অসুস্থ বা দূর্বলদের জন্য মাকরূহ হবে না।

রামি সমাপ্ত করে কোরবানী করবেন (ইচ্ছাধীন)। যদি নিজে যবেহ করতে পারেন, তবে নিজ হাতে যবেহ করাই উত্তম। নিজের কোরবানীকৃত গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। সুতরাং যতটা সম্ভব প্রয়োজনীয় কোরবানীর গোশত নিয়া নিবেন। সম্ভব হলে বাকী গোশত সদকা করে দিবেন।

কোরবানী করার পর কেবলামুখী হয়ে বসে মাথা মুন্ডন করে নিবেন অথবা চুল ছাঁটাবেন। তবে মাথা মুন্ডানোই উত্তম। এই ক্ষৌর কার্য ডানদিক হতে শুরু করবেন। ক্ষৌর কার্যের শুরুতে এবং পরে তাকবীর বলবেন। মহিলাদের জন্য মাথা মুন্ডন করা জায়েয নয়। সুতরাং তাদের সমস্ত চুলের গোছা ধরে আঙ্গুলের এক কর্ পরিমাণ চুল কেঁটে ফেলা অথবা নিজে কেঁটে ফেলাই তাদের জন্য যথেষ্ট। মহিলারা কোন বেগানা পুরুষকে দিয়ে চুল কাটাবেন না। চুল মুন্ডন বা কর্তন করার পর গোঁফ ছাঁটাবেন এবং বগলের লোম পরিষ্কার করবেন। মাথা মুন্ডানো অথবা ছাঁটানোর পূর্বে অন্যান্য পশম পরিষ্কার করা দুরস্ত নাই। ক্ষৌর কার্যের পর নখ, চুল প্রভৃতি দাফন করা উত্তম। ক্ষৌর কার্যের পর যেসব কাজ ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ ছিল, সেসব হালাল হয়ে যাবে। **শুধু স্ত্রী হালাল হবে না।** অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস, চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি হালাল হবে না।

তাওয়াফে জিয়ারত ও সাঈ–

অতঃপর মক্কা মুকাররমায় এসে তাওয়াফে যিয়ারত সমাপন করবেন। পূর্বের নিয়মে তাওয়াফে যিয়ারত (ফরজ) মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাকাত নামায (ওয়াজিব) ও সাফা-মারওয়া সাঈ করবেন (ওয়াজিব)। এরপর মীনায় প্রত্যাবর্তন করবেন।

১০ই যিলহজ্জ তাওয়াফ যিয়ারত করা উত্তম। তবে ১২ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই তাওয়াফের সময় বাকী থাকে। যদি তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ না করে থাকেন, তাহলে এই তাওয়াফে রমলও করবেন। যদি ইহরামের কাপড় খুলে সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করে থাকেন, তাহলে ইযতেবা করবেন না। নতুবা ইযতেবাও করবেন।

তাওয়াফে যিয়ারতের পর তাওয়াফের নামায পড়ে হাজারে আসওয়াদের চুম্বন করে বাবুস সাফার পথে বের হয়ে সাঈ সম্পন্ন করবেন। যদি তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ করে থাকেন, তাহলে এই তাওয়াফে রমল ও ইযতেবা কিছুই করবেন না এবং সাঈও করবেন না; বরং তাওয়াফের পরে মিনায় চলে আসবেন এবং মিনায় অবস্থান করবেন। **তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রী সহবাস প্রভৃতিও হালাল হয়ে যাবে।**

১১ই যিলহজ্জে করণীয় (শয়তানকে পাথর মারা) ঃ

১১ই যিলহজ্জ সূর্য হেলে পড়ার পর তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবেন। এর সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, প্রথম জামরায়ে উলা (ইহা মসজিদে খায়েফের নিকটে অবস্থিত)-এর প্রতি কংকর নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর জামরায়ে উসতা অর্থাৎ মাঝখানের জামরায় এবং সবশেষে জামরায়ে উখরায় অর্থাৎ তৃতীয় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবেন। জামরায়ে উলার রামি সমাপ্ত করে সামান্য সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কেবলামুখী হয়ে হাত তুলে দো'আ করবেন এবং যে পরিমাণ সময়ে ২০ আয়াত হতে পৌণে এক পারা কোরআন শরীফ পাঠ করা সম্ভব, সে পরিমাণ সময় দো'আ তাসবীহ তাকবীর, তাহলীল এবং ইস্তিগফার প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকবেন। এমনিভাবে জামরায়ে উসতার রামির পরেও দো'আ করবেন। কিন্তু জামরায়ে উখরার রামির পরে কোন দো'আ করবেন না। বরং রামি শেষ করে যথাশ্রীঘ্র মীনায় নিজের অবস্থানে ফিরে আসবেন।

১২ই যিলহজ্জে করণীয় (শয়তানকে পাথর মারা ও 'মীনা' ত্যাগ) ঃ

১২ তারিখেও সূর্য হেলে পড়ার পর একই পদ্ধতিতে তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবেন। ১২ তারিখের রামি সমাপ্ত করে মক্কা মুকাররমায় চলে যাবেন। কিন্তু ১২ তারিখে সূর্য হেলে পড়ার পর রামি সম্পন্ন করে তবেই মক্কা মুকাররমায় যাওয়া উত্তম। **কিন্তু কোন কারণ বশতঃ যদি ১২ তারিখে 'মীনা' ত্যাগ করতে না পারেন এবং ১২ তারিখে রাতে 'মীনা'য় অবস্থান করেন, সেই অবস্থায় ১৩ তারিখে রমী ওয়াজিব হয়ে যাবে।**

মিনা হতে যখন ১২ অথবা ১৩ই যিলহজ্জ মক্কা মুকাররমায় আসবেন, তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে মক্কার দিকে অগ্রসর হবেন এবং ওয়াদিয়ে মুহাস্সাবের যা মিনার পথে মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত– যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়বেন। অতঃপর সেখানে

সামান্য সময়ের জন্য শুয়ে পড়বেন। তারপর মক্কায় ফিরে আসবেন। যদি এত সময় সেখানে থাকতে না পারেন, তবে অল্প কিছুক্ষণ হলেও সেখানে অবস্থান করবেন। চাই নীচে অবতরণ করে অথবা সওয়ারীর উপরে থেকে, যেভাবে সহজ মনে হয় করতে পারেন। এভাবে আপনার হজ্জ সম্পন্ন হয়ে গেল। এখন যতদিন ইচ্ছা মক্কায় থাকতে পারবেন এবং খুব বেশী বেশী করে তাওয়াফ ও উমরা পালন করবেন। কিন্তু উমরা ১৩ তারিখের পরে করবেন। ৯ই যিলহজ্জ হতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত উমরা নিষিদ্ধ।

যখন মক্কা হতে রওয়ানার ইচ্ছা হবে, তখন তাওয়াফে বিদা' অর্থাৎ বিদায় তাওয়াফ সম্পন্ন করবেন। এই তাওয়াফ ওয়াজিব। যদি কেহ না করে চলে যান, তাহলে মীকাত হতে বের হওয়ার পূর্বে ফিরে আসা ওয়াজিব হবে। মীকাত হতে বের হয়ে যাওয়ার পর ইচ্ছা করলে দমও পাঠিয়ে দিতে পারবেন অথবা ইহরাম বেঁধে ফিরে এসে প্রথমে উমরা এবং পরে তাওয়াফে বিদা' সম্পন্ন করবেন। কিন্তু কেহ যদি তাওয়াফে যিয়ারতের পরে কোন নফল তাওয়াফ করে থাকেন, তাহলে তার তাওয়াফে বিদা' আদায় হয়ে যাবে। যদিও এর কোন নিয়ত না থাকে। কিন্তু ঠিক বিদায় মুহূর্তেই এই তাওয়াফে বিদা' পালন করবেন। তাওয়াফে বিদা'-এর পর মাকামে ইব্রাহীমের নিকটে তাওয়াফের দুই রাকআত নামায আদায় করে যমযম কূপে আগমন করতঃ কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পেট ভরে তিন শ্বাসে পানি পান করবেন এবং প্রত্যেক শ্বাসে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকাবেন। পানি পান করার সময় এই দো'আ পড়বেন–

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“বিস্মিল্লাহি ওয়াল্ হামদুলিল্লাহে ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।”

এবং সর্বশেষ চুমুকে এই দো'আ পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ عَمَلًا صَالِحًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

“আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ইল্মান্ নাফিআন্ ওয়ারিয্ক্বান্ ওয়াসিআন্ ওয়া আমালান ছালেহাও্ ওয়াশিফাআম্ মিন্ কুল্লি দাইন্।”

তারপর অবশিষ্ট পানি মাথায়, মুখে এবং শরীরের উপরে ঢেলে দিবেন এবং মুলতাযামের নিকটে এসে নিজের বুক আর ডান গাল কা'বা শরীফের দেওয়ালের উপরে রাখবেন, ডান হাত দরজার চৌকাঠের দিকে বাড়াবেন এবং যেভাবে একজন দাসানুদাস তার প্রভুর জামার ঝুল ধরে নিজের অপরাধ মাফ করায়, তেমনিভাবে কা'বার পর্দা ধরে কান্নাকাটির সাথে ইস্তিগফার, তস্বীহ, তাহলীল, দো'আ-দরূদ প্রভৃতিতে দীর্ঘক্ষণ মশগুল থাকবেন। যদি কান্না না আসে, তবে রোদনকারীদের ন্যায় আকৃতি ধারণ করবেন। তারপর কা'বার চৌকাঠ চুম্বন করবেন এবং দো'আ প্রার্থনা করবেন। অতঃপর হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করে কা'বা শরীফের দিকে বেদনার্ত চোখে এতিমের মত তাকাতে তাকাতে, উহার বিচ্ছেদের জন্য আফসোস করতে করতে, উল্টা

পায়ে, কা'বার দিকে মুখ রেখে বাবুল বিদা'র পথে বাইরে আসবেন। ফকীর-মিসকীনদেরকে সদকা-খয়রাত দিবেন এবং দো'আ প্রার্থনা করবেন। হায়েয ও নেফাসবতী মহিলা যদি রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত পাক না হন, তাহলে তার উপর হতে তওয়াফে বিদা' রহিত হয়ে যাবে। তিনি মসজিদের বাইরে বাবুল বিদা'র উপরে দাঁড়িয়ে আফসোস সহকারে ও বিনীতভাবে দো'আ প্রার্থনা করবেন। মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করবেন না।

ক্বিরান হজ্জ আদায়ের নিয়মাবলী

ক্বিরান হজ্জের বর্ণনা ঃ

ক্বিরান শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো দু'টি বস্তুকে একত্রিত করা। আর পারিভাষিক অর্থ হলো, হজ্জ ও উমরাহ্‌র ইহরাম একত্রে বেঁধে হজ্জ ও উমরাহ সমাপন করা। এ অবস্থায় হজ্জ ও উমরাহ উভয়কে একত্রিত করা হয়।

তারিখ অনুযায়ী ক্বিরান হজ্জের কার্যাবলী ঃ

১। একই সাথে হজ্জ ও উমরাহর নিয়তে ইহরাম বাঁধা। –(ফরজ)

২। উমরাহর তাওয়াফ (ফরজ)। তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীমে দু' রাক'আত নামায় (ওয়াজিব), তারপর জমজমের পানি পান করা।

৩। উমরাহর সায়ী করা (ওয়াজিব) কিন্তু মাথা মুন্ডানো বা চুল কাটা যাবে না।

৪। ৮ই যিলহজ্জ মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া (সুন্নত)। (৯ যিলহজ্জের ফযর নামাযসহ।)

৫। ৯ই যিলহজ্জ আরাফায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা (ফরয)। আরাফাতে গোসল করা। –(সুন্নত)

৬। রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করা এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া। –(ওয়াজিব)

৭। সুবহে ছাদেক হলে ফযরের নামায আদায় ও পূর্ব আকাশ ফর্সা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। –(ওয়াজিব)

৮। ১০ই যিলহজ্জ বড় শয়তানকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ। –(ওয়াজিব)

৯। কোরবানী করা। –(ওয়াজিব)

১০। পুরুষের মাথা মুন্ডানো বা মেয়ে লোকদের চুল এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটা। –(ওয়াজিব)

১১। তাওয়াফে যিয়ারত (ফরয) এবং সায়ী করা। –(ওয়াজিব)

১২। ১০ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত থেকে ১২ যিলহজ্জ তারিখ রাত পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা (সুন্নত) এবং ১১ ও ১২ তারিখ তিনটি শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা। –(ওয়াজিব)

১৩। বিদায় তাওয়াফ। –(ওয়াজিব)

ক্বিরান হজ্জ সম্পাদন ঃ

ক্বিরান হজ্জ আদায়কারী মীকাতে পৌঁছিয়ে ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করবেন, নাভির নিম্নদেশের লোম পরিষ্কার করবেন, স্ত্রী সঙ্গে থাকলে এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তার সাথে সহবাসও সারতে পারেন। তারপর ইহরামের নিয়তে গোসল করবেন, ওযু করবেন। এই গোসল শুধু পরিচ্ছন্নতার জন্য। এই কারণে হায়েয ও নেফাসবর্তী মহিলা এবং শিশুদের জন্যও এই গোসল সুন্নত। গোসলের পর শরীর হতে সেলাইযুক্ত কাপড় খুলে ফেলবেন এবং একটি সেলাই বিহীন লুঙ্গি পরিধান করবেন ও একটি চাদর গায়ে জড়াবেন। যদি দুটি কাপড় না থাকে তাহলে একটিই যথেষ্ট। কাপড় সাদা, নতুন অথবা ধোলাইকৃত হওয়া মুস্তাহাব। অবশ্য একদম কোন প্রকার সেলাইযুক্ত না হওয়াই মুস্তাহাব। উহার পর শরীর ও কাপড়ে সুগন্ধি লাগাবেন। পুরুষের জন্য রং বিহীন সুগন্ধি উত্তম এবং মহিলাদের জন্য রং বিশিষ্ট। কিন্তু কাপড়ে এমন সুগন্ধি লাগাতে নেই যার চিহ্ন লাগানোর পরে অবশিষ্ট থাকে। এরপর দুই রাকআত নামায পড়বেন। তবে শর্ত এই যে, তা যেন মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়।

ইহরামের নামায ঃ

"নাওয়াইতুআন উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকয়াতায় ছলাতিল ইহরামে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শরিফাতে আল্লাহু আকবার।" ইহরামের নামাযে প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখলাস পাঠ করবেন। এই নামায মাথা আবৃত করে ইযতেবা ছাড়াই আদায় করবেন। সালাম ফিরানোর পর কেবলামুখী হয়ে বসে মাথা অনাবৃত করে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশা নিয়ে হজ্জ ও উমরার নিয়্যত করবেন। দাঁড়ায়ে অথবা সওয়ারের উপর বসেও নিয়ত করা জায়েয। তারপর মুখে বলবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِيْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّيْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী উরিদুল উমরাতা ওয়াল হাজ্জা ফাইয়াসসিরহুমা লি ওয়া তাকাব্বাল হুমা মিন্নী। আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'আমাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারীকা লাকা।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি উমরাহ ও হজ্জ একসাথে পালন করার নিয়ত করলাম। তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবুল করুন"।

অতঃপর আবার পড়বেন ঃ

لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَّعُمْرَةٍ - اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ الخ

"লাব্বাইকা বিহাজ্জিতিন ওয়া উমরাতিন আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা।"

তারপর তালবিয়াহ পাঠ করবেন। তালবিয়াহ শব্দ সমূহ নিম্নরূপ–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

“লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান, নি’মাতা লাকা ওয়াল্ মুলক্, লা-শারীকা লাক।”

তালবিয়াহ্ তিনবার পাঠ করা মুস্তাহাব। পুরুষরা উচ্চস্বরে এবং মহিলারা নিম্নস্বরে পাঠ করবেন। এখন ইহরাম বাঁধা হল। এখন প্রচুর সংখ্যায় তালবিয়াহ্ পাঠ করতে থাকবেন। বিশেষভাবে অবস্থা পরিবর্তনের সময় ইহরাম বাঁধার পরে ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ হতে বিরত থাকবেন এবং উহার ওয়াজিব ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এছাড়া আর কোন বিশেষ কাজ হরম শরীফে প্রবেশ করা পর্যন্ত করতে হবে না।

হরম শরীফ প্রবেশ ও তাওয়াফ ঃ

যখন হরমের সীমানায় প্রবেশ করবেন (যাহা জিদ্দার দিক হতে গমনকারীদের জন্য মক্কা শরীফ হতে দশ মাইলের দূরত্বে শুরু হয়। সেখানে দুইটি সাদা মিনার তৈরী রয়েছে) তখন সওয়ারী হতে অবতরণ করে নগ্ন পায়ে চলবেন। যদি বেশী দূর হাটতে না পারেন, তবে অল্প কিছু দূর হাটবেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে হরমে প্রবেশ করবেন। প্রচুর পরিমাণে তালবিয়াহ, তাকবীর, তাহলীল প্রভৃতি পাঠ করবেন। যখন মক্কা মুকাররামার নিকটবর্তী হবেন, তখন মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বে গোসল করবেন এবং মক্কার কবরস্থান বাবুল মা’লার দিক হতে প্রবেশ করবেন এবং পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِيْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالًا

“আল্লাহুম্মায্ আল্লি বিহা ক্কারারাউওয়ার্ যুকনি ফিহা রিযক্কান হালালা।”

এবং মাদ’আ নামক স্থানে দো’আ প্রার্থনা করবেন। তারপর যদি মালপত্রের দিক হতে শান্তি ও স্থিরতা বজায় থাকে, তাহলে সোজা মসজিদে হারামে চলে যাবেন। নতুবা মালপত্র বাসায় রেখে পরে মসজিদে হারামে গমন করবেন। বাবুস সালামের পথে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন। প্রথমে ডান পা রাখবেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রবেশ করবেন। লাব্বায়েকা পড়ে اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (“আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্লী আব্ওয়াবা রহ্মাতিকা”) পাঠ করবেন। যখন বায়তুল্লাহ শরীফ দৃষ্টিগোচর হবে তখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (“আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার”) পাঠ করবেন এবং দো’আ করবেন। এই সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়াও সুন্নাত–

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّبِرًّا

“আল্লাহুম্মা যিদ্ বাইতাকা হাজা তাশরীফান ওয়া তাকরীমান ওয়া তাযিমান ওয়া বিররান্।”

তারপর তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাওয়াফে কুদুম সম্পন্ন করবেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাওয়াফের কারণে ফরয নামাযের জামা'আত অথবা বিতর অথবা সুন্নতে মুয়াক্কাদা বাদ পড়ার আশঙ্কা দেখা না দেয়। যদি ভয় থাকে, তাহলে প্রথমে নামায আদায় করে নিবেন। তাওয়াফের জন্য হাজারে আসওয়াদের সামনে এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে ডান কাঁধ হাজারে আসওয়াদের বাম দিকের সামনে থাকে আর সমগ্র হাজারে আসওয়াদ বাম দিকে থাকে। তারপর তাওয়াফের নিয়্যত করবেন। এই নিয়ত করা ফরয। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বাক্যটি মুখে বলাও উত্তম–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফা বাইতিকাল্ হারামি ছাব্য়াতা আশ্ওয়াতিন ফাইয়াস্সিরহু লী ওয়াতাক্কাব্বাল্হু মিন্নী।"

তারপর ডান দিকে কিঞ্চিৎ এমনভাবে সরে যাবেন যাতে হাজারে আসওয়াদ একদম সম্মুখে পড়ে। অতঃপর হাজারে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে বলবেন-

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ ـ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ـ
اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আকবার্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালিল্লাহিল্ হামদু ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ঈমানাম্ বিকা ওয়াতাস্দীকাম্ বিকিতাবিকা ওয়াওয়াফাআম্ বিআহ্দিকা ওয়াইত্তিবাআল্ লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবেন। উভয় হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের উপরে স্থাপন করে দুই হাতের মাঝে মুখ রেখে মৃদুভাবে চুম্বন করতে হবে যেন চড় চড় শব্দ না হয়। কারো কারো মতে হাজারে আসওয়াদের উপরে তিনবার মাথা রাখা মুস্তাহাব। যদি ভিড়ের কারণে চুম্বন করা সম্ভব না হয়, তবে তা পরিহার করবেন। লোকজনকে কষ্ট দিবেন না। এক্ষেত্রে শুধু উভয় হাত হাজারে আসওয়াদের উপরে রেখে পরে হাত দুইটি চুম্বন করবেন। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে কোন কাঠের দ্বারা হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করে সেই কাঠটিতে চুমা খাবেন। যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে উভয় হাতকে এমনভাবে কান পর্যন্ত উঠাবেন যেন হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের দিকে এবং পিঠ নিজের মুখের দিকে থাকে; আর এই খেয়াল করবেন যে, হাতকে হাজারে আসওয়াদের উপরেই রেখেছেন। তারপর এই দো'আ পাঠ করবেন-

اَللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আল্লাহু আকবার্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অলহামদুলিল্লাহ্ ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা ছাইয়েদেনীল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।"

এবং উভয় হাতে চুমা খাবেন। তাওয়াফ শুরু করার সামান্য পূর্বে ইযতেবা করবেন অর্থাৎ চাদরকে ডান বগলের নীচ দিয়ে পেঁচিয়ে বাম কাঁধের উপরে রাখবেন এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করবেন। অর্থাৎ সামান্য সদর্পে কাঁধ হেলিয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে বীরোচিত ভঙ্গিতে দ্রুত গতিতে চলবেন। তাওয়াফ আরম্ভ করার পর তালবিয়াহ পাঠ করবেন না। হাজারে আসওয়াদের ইস্তিলামের পর বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজার দিকে অর্থাৎ নিজের ডান দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাওয়াফের মধ্যে হাতীমকেও শামিল করবেন। যখন রুকনে ইয়ামানী অর্থাৎ বায়তুল্লাহর পশ্চিম দক্ষিণ কোণে পৌঁছবেন, তখন এতে শুধু উভয় হাত অথবা ডান হাত লাগাবেন; চুমা দিবেন না। ভিড় থাকলে সেখানে ইঙ্গিতও করবেন না। তারপর যখন হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছবেন, তখন এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন। সম্ভব হলে ১২৪ পৃষ্ঠায় তাওয়াফের অধ্যায় লিখিত তাওয়াফের দো'আ পড়ুন। সাত চক্কর সম্পূর্ণ করার পর অষ্টম বার হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবেন। তাওয়াফ সমাপ্ত হয়ে গেল। তারপর মাকামে ইব্রাহীম (যা বায়তুল্লাহ্র পূর্ব দিকে মাতাফের প্রান্তে অবস্থিত)-এর দিকে "ওয়াত্তাখেজু মিম মাকামে ইব্রাহীমা মুসল্লা" পড়তে পড়তে অগ্রসর হবেন এবং মাকামে ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহ ও নিজের মাঝখানে রেখে দুই রাকাআত নামায পড়বেন।

মাকামে ইব্রাহীমে নামায ঃ

"নাওয়াইতু আন উছল্লিয়ালিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতায় ছলাতি ওয়াজেবুত তাওয়াফে মুতাওয়াজিহান ইলাজিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতে আল্লাহু আকবার।" প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখলাস পাঠ করবেন। যদি সেখানে জায়গা পাওয়া না যায় তবে যেখানে সম্ভব হয় পড়বেন।

তাওয়াফের নামায সমাপ্ত করে মুলতাযামের নিকটে আসবেন এবং এটাকে জড়িয়ে ধরবেন। ডান গাল এবং কখনও বাম গাল এর উপরে রাখবেন এবং উভয় হাত উপরের দিকে উঠিয়ে বিনয় ও নম্রতার সাথে দো'আ করবেন। তারপর যমযম কূপের নিকটে আসবেন।

যম্যমের পানি পান ঃ

কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে খুব পরিতৃপ্তিসহ তিন নিঃশ্বাসে যমযমের পানি পান করবেন এবং গায়েও কিছু পানি ঢালবেন এবং এই দো'আ পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ عَمَلًا صَالِحًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ইল্মান্ নাফিআন্ ওয়ারিয্ক্বান্ ওয়াসিআন্ ওয়া আমালান ছালেহাও্ ওয়াশিফাআম্ মিন্ কুল্লি দাইন্।"

যম্যমের পানি পান করে বাবুস সাফার পথে সাঈ'র জন্য মসজিদে হারাম হতে বের হয়ে আসবেন এবং প্রথমে বাম পা রাখবেন। এই সময় اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ পড়বেন।

"আল্লাহুম্মাগ-ফির্লী যুনুবী ওয়াফ্ তাহ্লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিকা।"

সাফা-মারওয়া সাঈ ঃ

সাফার নিকটে পৌঁছে এই দো'আ পাঠ করবেন–

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

"আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি ইন্নাস্ সাফা ওয়াল্ মারওয়াতা মিন্ শাআ-ইরিল্লাহি।"

এবং সাফার এক তৃতীয়াংশ উপরে আরোহণ করবেন। অধিক উপরে উঠবেন না। কেবলামুখী হয়ে উভয় হাতকে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবেন, যেমন দো'আর জন্য উঠিয়ে থাকেন এবং তাকবীর, তাহলীল, হাম্দ প্রভৃতি তিন তিনবার পড়বেন।

সাঈ'র নিয়্যাত ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি উরীদুছ সাঈয়া বাইনাছ্ছাফা অলমারওয়াতা ছাবয়াতা আশওয়াতিন ফাইয়াছছিরহুলী অতাকাব্বাল্হু মিন্নী।" সাঈ-এর অধ্যায়ে (১৩৫ পৃষ্ঠা) যে সকল দো'আ লেখা হয়েছে, সেগুলি পাঠ করবেন। যদি সেসব দো'আ মুখস্থ না থাকে, তবে নিজের ভাষায় দো'আ প্রার্থনা করবেন এবং সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দো'আ করবেন। অতঃপর সাফা হতে নেমে প্রশান্ত চিত্তে মারওয়ার দিকে অগ্রসর হবেন। মসজিদের দেয়ালে স্থাপিত সবুজ বাতি যখন ৬ হাত পরিমাণ দূরে থাকবে, তখন সেখান হতে দ্বিতীয় সবুজ বাতি পর্যন্ত দৌড়িয়ে চলবেন। কিন্তু খুব দ্রুত দৌড়াবেন না। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে এই দো'আ পাঠ করবেন–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

"রাব্বিগ্ফির ওয়ারহাম্ আন্তাল্ আআ'য্যুল্ আক্রাম।"

তারপর দ্বিতীয় সবুজ বাতি হতে এগিয়ে যাবার পর স্বাভাবিক গতিতে চলবেন এবং মারওয়ার উপরে আরোহণ করে সামান্য ডান দিকে ঝুঁকবেন যেন মুখ কেবলার দিকে হয়ে যায়। এখানেও হাত উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ সাফার অনুরূপ দো'আ প্রভৃতি পাঠ করবেন। এভাবে সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত সাঈর এক চক্কর সম্পূর্ণ হল এবং মারওয়া হতে সাফা পর্যন্ত দ্বিতীয় চক্কর হয়ে যাবে। এমনিভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন। সপ্তম চক্কর মারওয়াতে সমাপ্ত করবেন। প্রত্যেক চক্করে যে দো'আ ও তসবীহ মুখস্থ থাকলে

এবং যা পাঠে একাগ্রতা আসে তাই পাঠ করবেন। সাঈ-এর পরে মাতাফের প্রান্তে এসে দুই রাকাআত নফল নামায পড়বেন।

হজ্জে ক্বিরান পালনকারী তাওয়াফে কুদুম এবং সাঈ সম্পন্ন করার পর ইহরাম বাঁধা অবস্থায়ই মক্কা মুকাররামায় অবস্থান করবেন এবং যত অধিক সম্ভব নফল তাওয়াফ করতে থাকবেন এবং ইহরামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ হতে বিরত থাকবেন। কোন উমরা পালন করবেন না। ৭ই যিলহজ্জ ইমাম খোৎবা পড়লে উহা মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করবেন।

ক্বিরান হজ্জের ব্যস্ততম পাঁচ দিন

(৮ই যিলহজ্জ থেকে ১২ই যিলহজ্জ)

৮ই যিলহজ্জে করণীয় ঃ

৮ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর এমন সময় মিনায় (১৫৪ পৃষ্ঠা) পৌঁছবেন যাতে যোহরের নামায মুস্তাহাব ওয়াক্তে সেখানে আদায় করতে পারেন। রাত্রি মিনায় যাপন করবেন এবং যোহর হতে ৯ই যিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের নামায সেখানে পড়বেন।

৯ই যিলহজ্জে করণীয় ঃ

৯ই যিলহজ্জ ফজরের নামায পড়ে সূর্যের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর তালবিয়াহ্ ও তাকবীর পড়তে পড়তে 'যাব'-এর পথে আরাফাত অভিমুখে রওয়ানা হবেন। যখন জাবালে রহমত (আরাফাতের ময়দানের একটি পাহাড়) দৃষ্টিগোচর হবে, তখন দো'আ প্রার্থনা করবেন এবং তাকবীর, তাহলীল ও ইস্তিগফার পড়বেন।

মসজিদে নামিরা (যা আরাফাতের প্রান্তে মক্কা মুকাররামার দিকে অবস্থিত)-এর নিকটে অবস্থান করবেন। পানাহার শেষ করে সূর্য হেলে পড়ার পূর্বেই গোসল করবেন। তারপর মসজিদে নামিরায় গিয়ে বসবেন, ইমামের খোৎবা শ্রবণ করবেন এবং যোহরের নির্ধারিত সময়ে যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়বেন। কিন্তু এতদূভয় নামায একত্রিত পড়ার কতিপয় শর্ত রয়েছে, যা বর্ণনা করা হবে।

নামায সমাপ্ত করে যথাশ্রীঘ্র আরাফাতের ময়দানে নিজের অবস্থান স্থলে গমন করবেন। যদি জাবালে রহমতের নিকটবর্তী যেখানে কালো পাথর বিছানো রয়েছে, সেখানে জায়গা পাওয়া যায়, তবে সেখানেই অবস্থান করবেন। এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবস্থান করার জায়গা। নতুবা যেখানে সম্ভব অবস্থান করবেন। জাবালে রহমতের যথাসম্ভব নিকটে থাকা উত্তম। জাবালে রহমতের উপরে আরোহণ করবেন না, এসময় নিজের অবস্থান স্থলে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। শয়ন, উপবেশন প্রভৃতিও জায়েয (১৫৫ পৃষ্ঠা দেখুন)। যখন ইমাম খোৎবা পাঠ করবেন, তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করবেন এবং যেসব দো'আ মুখস্থ থাকবে তা অবস্থান স্থলে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়তে থাকবেন। ঘোরাঘুরি ও আনন্দ-তামাশায় সময় নষ্ট করবেন না। কিছুক্ষণ পরপর লাব্বায়কা পড়বেন এবং বেশি বেশি করে তওবা ও ইস্তিগফার করবেন।

আরাফাতের দিন হাজী সাহেবদের জন্য রোযা রাখাও জায়েয, কিন্তু রোযা না রাখাই উত্তম। রোযা না রাখা এবং অতিভোজন না করা উত্তম।

সূর্যাস্তের পরে লাব্বায়কা এবং দো'আ পাঠ করতে করতে ইমামের সাথে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথে মুযদালিফায় গমন করবেন এবং প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে চলবেন। **সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের সীমা অতিক্রম করা জায়েয নয়।** যদি কেহ করেন, তবে দম দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি রাস্তা প্রশস্ত হয় এবং লোকজনের কষ্ট না হয়, তবে সামান্য দ্রুত চলবেন, অন্যথায় মন্থর গতিতে চলবেন। কাউকেও কষ্ট দিবেন না। মুযদালিফায় এসে গোসল অথবা ওযূ করে নিবেন। মসজিদে মাশআরে হারামের নিকটে রাস্তার ডান দিকে অবতরণ করা উত্তম। পথে কোথাও অবস্থান করবেন না।

'ওয়াদিয়ে মুহাস্সার' ব্যতীত মুযদালিফার (১৬১ পৃষ্ঠা) যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করতে পারবেন। ওয়াদিয়ে মুহাস্সারে অবস্থান করা জায়েয নেই। মাল-সামান নামানোর পূর্বে মাগরিব এবং এশার নামায এক আযান এবং এক তাকবীরের সাথে এশার সময়ে পড়বেন। দুই নামাযের মাঝে কোন প্রকার সুন্নত, নফল প্রভৃতি পড়বেন না; বরং তা পরে পড়বেন। এই দুই নামাযকে একত্রিত করে পড়ার শর্তসমূহও দেখে নিবেন। আরাফাতের ময়দানে অথবা রাস্তায় মাগরিব ও এশার নামায পড়া জায়েয নেই। যদি কেহ পড়েন, তবে পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে। যদি এশার পূর্বেই মুযদালিফায় পৌঁছে যান তবে এশার ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযও পড়বেন না।

মুযদালিফায় যত বেশী সম্ভব রাত্রি জাগরণ করে এবাদত-বন্দেগী করবেন। এই রজনী শবে-ক্বদর হতেও উত্তম। সুবহে সাদিকের পর অন্ধকার থাকতে প্রথম সময়ে ইমামের সহিত অথবা একাকী যেমন সুযোগ হয় ফজরের নামায পড়ে মাশআরে হারামের নিকটে কেবলামুখী হয়ে লাব্বায়কা অথবা তাসবীহ ও তাহলীল পড়বেন এবং দো'আর মত হাত উপরে তুলে দো'আয় লিপ্ত হবেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে দুই রাকাআত নামায পড়ার পরিমিত সময় বাকী থাকতে মিনা অভিমুখে যাত্রা করবেন। ওয়াদিয়ে মুহাস্সারে পৌঁছার পর দৌঁড়ায়ে এই স্থানটি পার হয়ে যাবেন।

মুযদালিফা হতে মটরশুটির সমান ৭০টি কংকর তুলে নিবেন। এইসব কংকর রাস্তা অথবা অন্য যে কোন স্থান হতে তোলাও জায়েয তবে জামরাতের নিকট হতে উঠাবেন না।

১০ই যিলহজ্জে করণীয় (শয়তানকে পাথর মারা ও কোরবানী) ঃ

মিনায় পৌঁছার পর মধ্যবর্তী পথে জামরাতুল উখরার নিকটে এসে নিম্নভূমিতে ৫ হাত অথবা তার চাইতেও বেশী দূরে এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে মিনা ডান দিকে এবং মক্কা মুকররমা বাম দিকে থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদত অঙ্গুলির সাহায্যে কংকর ধরে নিক্ষেপ করবেন এবং প্রথম কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়াহ্ পড়া মুলতবী করবেন। প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় এই দো'আটি পাঠ করবেন– **"বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার রগমাল লিশ্শায়তান ওয়া রাদিয়া লিররহমান"**।

কংকর নিক্ষেপের সময় হাত এত উপরে তুলবেন না যাতে বগল উন্মুক্ত হয়ে যায়। রামি শেষ করে সেখানে দাঁড়াবেন না, মীনায় নিজের থাকার জায়গায় ফিরে আসবেন।

১০ তারিখের রামির ওয়াক্ত হল সেই দিনের সুবহে সাদিক হতে ১১ তারিখের সুবহে সাদিক পর্যন্ত। কিন্তু সূর্যোদয়ের সময় হতে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত রামী করার সুন্নত সময়। এরপর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুবাহ্ এবং সূর্যাস্ত হতে ফজর পর্যন্ত মাকরূহ সময়। তবে মহিলা, অসুস্থ বা দূর্বলদের জন্য মাকরূহ হবে না।

রামি সমাপ্ত করে কোরবানী করবেন। যদি নিজে যবেহ করতে পারেন, তবে নিজ হাতে যবেহ করাই উত্তম। নিজের কোরবানীকৃত গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। সুতরাং যতটা সম্ভব প্রয়োজনীয় কোরবানীর গোশত নিয়ে নিবেন। সম্ভব হলে বাকী গোশত সদকা করে দিবেন।

কোরবানী করার পর কেবলামুখী হয়ে বসে মাথা মুন্ডন করে নিবেন অথবা চুল ছাঁটাবেন। তবে মাথা মুন্ডানোই উত্তম। এই ক্ষৌর কার্য ডানদিক হতে শুরু করবেন। ক্ষৌর কার্যের শুরুতে এবং পরে তাকবীর বলবেন। মহিলাদের জন্য মাথা মুন্ডন করা জায়েয নয়। সুতরাং তাদের সমস্ত চুলের গোছা ধরে অঙ্গুলের এক কর্ পরিমাণ চুল কেঁটে ফেলা অথবা নিজে কেঁটে ফেলাই তাদের জন্য যথেষ্ট। মহিলারা কোন বেগানা পুরুষকে দিয়ে চুল কাটাবেন না। চুল মুন্ডন বা কর্তন করার পর গোঁফ ছাঁটাবেন এবং বগলের লোম পরিষ্কার করবেন। মাথা মুন্ডানো অথবা ছাঁটানোর পূর্বে অন্যান্য পশম পরিষ্কার করা দুরস্ত নাই। ক্ষৌর কার্যের পর নখ, চুল প্রভৃতি দাফন করা উত্তম। ক্ষৌর কার্যের পর যেসব কাজ ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ ছিল, সেসব হালাল হয়ে যাবে। **শুধু স্ত্রী হালাল হবে না।** অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস, চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি হালাল হবে না।

তাওয়াফে জিয়ারত ও সাঈ–

অতঃপর মক্কা মুকাররমায় এসে তাওয়াফে যিয়ারত সমাপন করবেন। পূর্বের নিয়মে তাওয়াফে যিয়ারত (ফরজ) মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাকাত নামায (ওয়াজিব) ও সাফা-মারওয়া সাঈ করবেন (ওয়াজিব)। এরপর মীনায় প্রত্যাবর্তন করবেন।

১০ই যিলহজ্জ তাওয়াফ যিয়ারত করা উত্তম। তবে ১২ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই তাওয়াফের সময় বাকী থাকে। যদি তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ না করে থাকেন, তাহলে এই তাওয়াফে রমলও করবেন। যদি ইহরামের কাপড় খুলে সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করে থাকেন, তাহলে ইযতেবা করবেন না। নতুবা ইযতেবাও করবেন।

তাওয়াফে যিয়ারতের পর তাওয়াফের নামায পড়ে হাজারে আসওয়াদের চুম্বন করে বাবুস সাফার পথে বের হয়ে সাঈ সম্পন্ন করবেন। যদি তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ করে থাকেন, তাহলে এই তাওয়াফে রমল ও ইযতেবা কিছুই করবেন না এবং সাঈও করবেন না; বরং তাওয়াফের পরে মিনায় চলে আসবেন এবং মিনায় অবস্থান করবেন। **তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রী সহবাস প্রভৃতিও হালাল হয়ে যাবে।**

১১ই যিলহজ্জে করণীয় (শয়তানকে পাথর মারা) ঃ

১১ই যিলহজ্জ সূর্য হেলে পড়ার পর তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবেন। এর সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, প্রথম জামরায়ে উলা (ইহা মসজিদে খায়েফের নিকটে অবস্থিত)-এর প্রতি কংকর নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর জামরায়ে উসতা অর্থাৎ মাঝখানের জামরায় এবং সবশেষে জামরায়ে উখরায় অর্থাৎ তৃতীয় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবেন। জামরায়ে উলার রামি সমাপ্ত করে সামান্য সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কেবলামুখী হয়ে হাত তুলে দো'আ করবেন এবং যে পরিমাণ সময়ে ২০ আয়াত হতে পৌণে এক পারা কোরআন শরীফ পাঠ করা সম্ভব, সে পরিমাণ সময় দো'আ তাসবীহ তাকবীর, তাহলীল এবং ইস্তিগফার প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকবেন। এমনিভাবে জামরায়ে উসতার রামির পরেও দো'আ করবেন। কিন্তু জামরায়ে উখরার রামির পরে কোন দো'আ করবেন না। বরং রামি শেষ করে যথাশ্রীঘ্র মীনায় নিজের অবস্থানে ফিরে আসবেন।

১২ই যিলহজ্জে করণীয় (শয়তানকে পাথর মারা ও 'মীনা' ত্যাগ) ঃ

১২ তারিখেও সূর্য হেলে পড়ার পর একই পদ্ধতিতে তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবেন। ১২ তারিখের রামি সমাপ্ত করে মক্কা মুকাররমায় চলে যাবেন। কিন্তু ১২ তারিখে সূর্য হেলে পড়ার পর রামি সম্পন্ন করে তবেই মক্কা মুকাররমায় যাওয়া উত্তম। **কিন্তু কোন কারণ বশতঃ যদি ১২ তারিখে 'মীনা' ত্যাগ করতে না পারেন এবং ১২ তারিখে রাতে 'মীনা'য় অবস্থান করেন, সেই অবস্থায় ১৩ তারিখে রমী ওয়াজিব হয়ে যাবে।**

মিনা হতে যখন ১২ অথবা ১৩ই যিলহজ্জ মক্কা মুকাররমায় আসবেন, তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে মক্কার দিকে অগ্রসর হবেন এবং ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সাবের যা মিনার পথে মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত– যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়বেন। অতঃপর সেখানে সামান্য সময়ের জন্য শুয়ে পড়বেন। তারপর মক্কায় ফিরে আসবেন। যদি এত সময় সেখানে থাকতে না পারেন, তবে অল্প কিছুক্ষণ হলেও সেখানে অবস্থান করবেন। চাই নীচে অবতরণ করে অথবা সওয়ারীর উপরে থেকে, যেভাবে সহজ মনে হয় করতে পারেন। এভাবে আপনার হজ্জ সম্পন্ন হয়ে গেল। এখন যতদিন ইচ্ছা মক্কায় থাকতে পারবেন এবং খুব বেশী বেশী করে তাওয়াফ ও উমরা পালন করবেন। কিন্তু উমরা ১৩ তারিখের পরে করবেন। ৯ই যিলহজ্জ হতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত উমরা নিষিদ্ধ।

যখন মক্কা হতে রওয়ানার ইচ্ছা হবে, তখন তাওয়াফে বিদা' অর্থাৎ বিদায় তাওয়াফ সম্পন্ন করবেন। এই তাওয়াফ ওয়াজিব। যদি কেহ না করে চলে যান, তাহলে মীকাত হতে বের হওয়ার পূর্বে ফিরে আসা ওয়াজিব হবে। মীকাত হতে বের হয়ে যাওয়ার পর ইচ্ছা করলে দমও পাঠিয়ে দিতে পারবেন অথবা ইহরাম বেঁধে ফিরে এসে প্রথমে উমরা এবং পরে তাওয়াফে বিদা' সম্পন্ন করবেন। কিন্তু কেহ যদি তাওয়াফে যিয়ারতের পরে কোন নফল তাওয়াফ করে থাকেন, তাহলে তার তাওয়াফে বিদা' আদায় হয়ে যাবে। যদিও এর কোন নিয়ত না থাকে। কিন্তু ঠিক বিদায় মুহূর্তেই এই তাওয়াফে বিদা' পালন করবেন। তাওয়াফে বিদা'-এর পর মাকামে ইব্রাহীমের

নিকটে তাওয়াফের দুই রাকআত নামায আদায় করে যমযম কূপে আগমন করতঃ কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পেট ভরে তিন শ্বাসে পানি পান করবেন এবং প্রত্যেক শ্বাসে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকাবেন। পানি পান করার সময় এই দো'আ পড়বেন–

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"বিস্‌মিল্লাহি ওয়াল্ হামদুলিল্লাহে ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।"

এবং সর্বশেষ চুমুকে এই দো'আ পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ عَمَلًا صَالِحًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা ইল্‌মান্ নাফিআন্ ওয়ারিয্‌ক্বান্ ওয়াসিআন্ ওয়া আমালান ছালেহাও্ ওয়াশিফাআম্ মিন্ কুল্লি দাইন্।"

তারপর অবশিষ্ট পানি মাথায়, মুখে এবং শরীরের উপরে ঢেলে দিবেন এবং মুলতাযামের নিকটে এসে নিজের বুক আর ডান গাল কা'বা শরীফের দেওয়ালের উপরে রাখবেন, ডান হাত দরজার চৌকাঠের দিকে বাড়াবেন এবং যেভাবে একজন দাসানুদাস তার প্রভুর জামার ঝুল ধরে নিজের অপরাধ মাফ করায়, তেমনিভাবে কা'বার পর্দা ধরে কান্নাকাটির সাথে ইস্তিগফার, তস্‌বীহ, তাহলীল, দো'আ-দরূদ প্রভৃতিতে দীর্ঘক্ষণ মশগুল থাকবেন। যদি কান্না না আসে, তবে রোদনকারীদের ন্যায় আকৃতি ধারণ করবেন। তারপর কা'বার চৌকাঠ চুম্বন করবেন এবং দো'আ প্রার্থনা করবেন। অতঃপর হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করে কা'বা শরীফের দিকে বেদনার্ত চোখে এতিমের মত তাকাতে তাকাতে, উহার বিচ্ছেদের জন্য আফসোস করতে করতে, উল্টা পায়ে, কা'বার দিকে মুখ রেখে বাবুল বিদা'র পথে বাইরে আসবেন। ফকীর-মিসকীনদেরকে সদকা-খয়রাত দিবেন এবং দো'আ প্রার্থনা করবেন। হায়েয ও নেফাসবতী মহিলা যদি রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত পাক না হন, তাহলে তাহার উপর হতে তওয়াফে বিদা' রহিত হয়ে যাবে। তিনি মসজিদের বাইরে বাবুল বিদা'র উপরে দাঁড়িয়ে আফসোস সহকারে ও বিনীতভাবে দো'আ প্রার্থনা করবেন। মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করবেন না।

ক্বিরান হজ্জের শর্তসমূহ

শরীয়তসিদ্ধ ক্বিরান হজ্জের জন্য ৫টি শর্ত রয়েছে। যথা ঃ

১। উমরাহর পুরা তাওয়াফ অর্থাৎ সাত চক্কর হজ্জের মাসসমূহে সমাপন করা। যদি হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হয়, তাহলে ক্বিরানে শরয়ী আদায় হবে না।

২। উমরাহর পুরা তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ অকুফে আরাফার পূর্বে করা। যদি কেউ উমরাহর তাওয়াফ করার পূর্বেই অকুফে আরাফা করেন, তবে উমরাহ বাদ পড়ে যাবে। আইয়ামে তাশরীকের পরে তার কাযা করতে হবে এবং একটি দমও

দিতে হবে। উমরাহ ছুটে যাওয়ার কারণে ক্বিরান বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্বিরানের দমও রহিত হয়ে যাবে।

৩। উমরাহর পুরা তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ সমাপন করার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধা। যদি কেউ উমরাহর অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর হজ্জের ইহরাম বাঁধেন, তাহলে তিনি আর ক্বারেন থাকবেন না। তামাত্তু' পালনকারী হয়ে যাবেন। তবে শর্ত হলো উমরার তাওয়াফের অধিকাংশ হজ্জের মাসসমূহে সমাপন করতে হবে। আর যদি হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে করে থাকেন, তাহলে তামাত্তু' পালনকারীও হবে না; বরং মুফরিদ হয়ে যাবেন।

৪। উমরাহ ফাসেদ করার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধা। যদি কোনো ব্যক্তি উমরাহ ফাসেদ হওয়ার পর হজ্জের ইহরাম বাঁধেন, তাহলে তা ক্বিরান হবে না; বরং ইফরাদ হবে।

৫। হজ্জ এবং উমরাহকে স্ত্রী সহবাস এবং স্ব-ধর্মত্যাগ দ্বারা ফাসেদ না করা। যদি কেউ উমরাহর অধিকাংশ তাওয়াফ সমাপন করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস দ্বারা উমরাহ ফাসেদ করে দেন অথবা অকুফে আরাফার পূর্বে স্ত্রী সহবাস দ্বারা হজ্জ ফাসেদ করে দেন, তাহলে ক্বিরান বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্বিরানের দমও রহিত হয়ে যাবে।

ক্বিরান হজ্জের মাসআলা

মাসআলা ঃ

১। ক্বিরানের উপরে জামরাতুল উলায় রমী (কংকর নিক্ষেপের) পরে ক্বিরানের শুকরিয়াস্বরূপ একটি দম বা কোরবানী করা ওয়াজিব। তাকে 'দমে ক্বিরান' অথবা 'দমে শোকর' বলা হয়।

২। দমে ক্বিরানের শর্তাবলী ঠিক কোরবানীর শর্ত সমূহেরই অনুরূপ।

৩। দমে ক্বিরান থেকে ক্বারেনের জন্য খাওয়া জায়েয। কোরবানীর মত এক তৃতীয়াংশ ফকীর-মিসকীনদের প্রদান করা মুস্তাহাব। এক তৃতীয়াংশ বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বণ্টন করবেন এবং এক তৃতীয়াংশ নিজের কাজে লাগাবেন অথবা অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করবেন। এ কোরবানীর গোশ্ত সদ্‌কা করা ওয়াজিব নয়।

৪। দমে ক্বেরানের নিয়ত করা আবশ্যক। নিয়তের মাধ্যমেই এটি জেনায়াতের দম থেকে পৃথক হয়ে যাবে। নিয়ত ছাড়া দমে ক্বেরান আদায় হবে না।

৫। দমে ক্বিরান ওয়াজিব হওয়ার জন্য ক্বিরান শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। পশু অথবা তার মূল্যের উপর সক্ষম হওয়া এবং ক্বারেনের আকেল, বালেগ ও আযাদ হওয়া শর্ত। গোলাম এবং না-বালেগের উপরে দম ওয়াজিব নয়। গোলামের উপরে এর পরিবর্তে রোযা ওয়াজিব হবে।

৬। দমে ক্বিরানকে হরমে যবেহ করা জরুরী। যদি কেউ হরমের পরিবর্তে অন্য কোথাও যবেহ করেন, তা হলে আদায় হবে না। এমনিভাবে আইয়ামে নহর অর্থাৎ ১০

হতে ১২ই যিলহজ্জের মধ্যে যবেহ করা ওয়াজিব। উক্ত দিবসসমূহের পূর্বে যবেহ করা জায়েয নয়। পরে জায়েয আছে, কিনতু তাতে ওয়াজিব তরক হবে।

৭। যবেহ করার প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক; আর সুন্নত ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের পর। ক্বারেনের জন্য রমি এবং ক্ষৌর কার্যের মধ্যবর্তী সময়ে যবেহ করা ওয়াজিব।

৮। ক্বারেন বা মুতামাত্তে' যদি কোরবানী যবেহ করার পূর্বে মারা যায়, তবে যবেহ করার ওসিয়াত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। ওসিয়ত করে গেলে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে তা পূরণ করা হবে। ওছিয়ত না করলে উত্তরাধিকারীদের উপর তা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি তারা মৃতের পক্ষ থেকে যবেহ করে দেন, তবে মৃত ব্যক্তি দম হতে মুক্ত হয়ে যাবে।

৯। ক্বারেনের জন্য যথাক্রমে রমি, যবেহ এবং ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করা ওয়াজিব। অর্থাৎ প্রথমে রমি, তারপর যবেহ এবং তারপর ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করতে হবে। তাওয়াফে যিয়ারতের ক্ষেত্রে ক্রমানুবর্তিতা ওয়াজিব নয়। যদি কেউ সেই তিন কাজের পূর্বে, পরে অথবা মাঝখানে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, তবুও জায়েয। তবে ক্ষৌর কার্যের পরই তাওয়াফে যিয়ারত করা সুন্নত। মুফরিদের জন্য যবেহ ওয়াজিব নয়। কিন্ত রমি এবং ক্ষৌর কার্যের মধ্যে তার জন্যও ক্রমানুবর্তিতা রক্ষা করা ওয়াজিব।

এক নজরে পবিত্র হজ্জে তামাত্তো

তারিখ	মক্কা শরীফ - মিনা - আরাফাত - মুযদালিফা - মক্কা শরীফ
উমরা সম্পাদন	বাংলাদেশ থেকে অথবা মিকাতে পৌঁছে ইহরাম বাঁধার জন্য মোচ, চুল, নখ, নাক, বগল ও নাভীর নিচ পরিষ্কার করে অজু-গোসল করবেন। ইহরামের কাপড় পরিধান করে ছালাতুল ইহরাম ২ রাকাত নামাজ পড়বেন। ওমরার নিয়ত করে ৩ বার তালবিয়া পড়ে মুনাজাত করবেন। মক্কা শরীফ পৌঁছে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করে, মাকামে ইব্রাহীমে তাওয়াফের নামায পড়ে সাফা-মারওয়া দৌঁড়ায়ে মাথা মুন্ডায়ে হালাল হবেন। ওমরা শেষ হলো। যত বেশি পারেন উমরা আদায় করবেন। কা'বা শরীফ তাওয়াফ করবেন। মক্কা শরীফ অবস্থান করবেন।
৭ই জিলহজ্জ	মিনায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হউন।
৮ই জিলহজ্জ	গোছল বা অজু করে ইহরামের দু'রাকাত নামায পড়ে, হজ্জের নিয়্যাত করে, উচ্চস্বরে তিন বার তালবিয়া পাঠ করুন তারপর সময় সুযোগে তাওয়াফ করুন, মিনার পথে যাত্রা শুরু করুন। যোহরের পূর্বেই মিনায় পৌঁছে অবস্থান করবেন।
৯ই যিলহজ্জ	ফজর থেকে তাকবীর পড়া শুরু করবেন। সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে রওয়ানা করে সূর্য হেলার পূর্বেই আরাফাতে পৌঁছিবেন। মসজিদে নামেরায় জামাতে একত্রে যোহর ও আছর পড়ুন। সম্ভব না হলে তাবুতে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আছরের ওয়াক্তে আছর পড়ুন। অবশ্যই আরাফাত মাঠের সীমার মধ্যে থাকুন। আরাফাত হতে সূর্য ডোবার পর মুযদালিফার দিকে অবশ্যই যাত্রা করুন। মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একসাথে পড়ুন। মুযদালিফা হতে জামরাতে নিক্ষেপের জন্য ৭০টি কংকর সংগ্রহ করুন। অবশ্যই মুযদালিফায় সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অবস্থান করুন। ঠিক সূর্য উঠার আগে মিনার পথে যাত্রা করুন।
১০ই জিলহজ্জ	মিনায় পৌঁছে পাথর মারার পূর্ব মুহুর্তেই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করুন, জামারা আল-আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করুন, কোরবানী করুন, চুল কাটুন, গোসল করুন, ইহরামের লেবাস ছেড়ে স্বাভাবিক কাপড় পরিধান করুন। মক্কা শরীফে পৌঁছে তাওয়াফে যিয়ারত করুন, মাকামে ইব্রাহীমে নামায পড়ুন, সাফা-মারওয়ায় সাঈ করুন। মীনায় ফিরে আসুন।
১১ই জিলহজ্জ	মিনায় অবস্থান করুন। তিন জামরাতে ক্রম অনুসারে– (জামরাত আল-উলা, জামরাত আল-উস্‌তা, জামরাত আল-আকাবা) কংকর নিক্ষেপ করুন।
১২ই জিলহজ্জ	তিন জামরাতে ক্রম অনুসারে– (জামরাত আল-উলা, জামরাত আল-উস্‌তা, জামরাত আল-আকাবা) কংকর নিক্ষেপ করুন সূর্য ডোবার পূর্বেই মিনার সীমানা ত্যাগ করুন।
বিদায়	মক্কা শরীফ ত্যাগের সময় বিদায়ী তওয়াফ করুন।

এক নজরে পবিত্র হজ্জে ইফরাদ

তারিখ	মক্কা শরীফ - মিনা - আরাফাত - মুযদালিফা - মক্কা শরীফ
বাংলাদেশ থেকে মক্কা শরীফ	বাংলাদেশ থেকে অথবা মিকাতে পৌঁছে ইহরাম বাঁধার জন্য মোচ, চুল, নখ, নাক, বগল ও নাভীর নিচ পরিষ্কার করে অজু-গোসল করবেন। ইহরামের কাপড় পরিধান করে ছালাতুল ইহরাম ২ রাকাত নামাজ পড়বেন। হজ্জের নিয়ত করে ৩ বার তালবিয়া পড়ে মুনাজাত করবেন। মক্কা শরীফ পৌঁছে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করে, মাকামে ইব্রাহীমে তাওয়াফের নামায পড়বেন। যম্‌যমের পানি পান করবেন। যদি ইচ্ছা করেন সাফা-মারওয়া দৌঁড়াবেন। সাঈ সম্পন্ন করার পর ইহরাম বাঁধা অবস্থায়ই মক্কা শরীফ অবস্থান করবেন। ইহরামের নিষিদ্ধ কর্ম সমূহ হতে বিরত থাকবেন। কোন উমরা পালন করবেন না। যত বেশি পারেন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করবেন।
৭ই জিলহজ্জ	মিনায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হউন।
৮ই জিলহজ্জ	যোহরের পূর্বেই মিনায় পৌঁছে অবস্থান করবেন।
৯ই যিলহজ্জ	ফজর থেকে তাকবীর পড়া শুরু করবেন। সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে রওয়ানা করে সূর্য হেলার পূর্বেই আরাফাতে পৌঁছিবেন। মসজিদে নামেরায় জামাতে একত্রে যোহর ও আছর পড়ুন। সম্ভব না হলে তাবুতে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আছরের ওয়াক্তে আছর পড়ুন। অবশ্যই আরাফাত মাঠের সীমার মধ্যে থাকুন। আরাফাত হতে সূর্য ডোবার পর মুযদালিফার দিকে অবশ্যই যাত্রা করুন। মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একসাথে পড়ুন। মুযদালিফা হতে জামরাতে নিক্ষেপের জন্য ৭০টি কংকর সংগ্রহ করুন। অবশ্যই মুযদালিফায় সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অবস্থান করুন। ঠিক সূর্য উঠার আগে মিনার পথে যাত্রা করুন।
১০ই জিলহজ্জ	মিনায় পৌঁছে পাথর মারার পূর্ব মুহূর্তেই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করুন, জামারা আল-আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করুন, কোরবানী করুন (ঐচ্ছিক), চুল কাটুন, গোসল করুন, কাপড় পরিধান করুন। মক্কা শরীফে পৌঁছে তাওয়াফে যিয়ারত করুন, মাকামে ইব্রাহীমে নামায পড়ুন, যদি তাওয়াফে কুদুম এর সাথে সাঈ করে থাকেন তাহলে সাঈ করবেন না। যদি না করে থাকেন তবে অবশ্যই সাঈ করবেন। মীনায় ফিরে আসুন।
১১ই জিলহজ্জ	মিনায় অবস্থান করুন। তিন জামরাতে ক্রম অনুসারে– (জামরাত আল-উলা, জামরাত আল-উস্‌তা, জামরাত আল-আকাবা) কংকর নিক্ষেপ করুন।
১২ই জিলহজ্জ	তিন জামরাতে ক্রম অনুসারে– (জামরাত আল-উলা, জামরাত আল-উস্‌তা, জামরাত আল-আকাবা) কংকর নিক্ষেপ করুন সূর্য ডোবার পূর্বেই মিনার সীমানা ত্যাগ করুন।
বিদায়	মক্কা শরীফ ত্যাগের সময় বিদায়ী তওয়াফ করুন।

এক নজরে পবিত্র হজ্জে ক্বিরান

তারিখ	মক্কা শরীফ - মিনা - আরাফাত - মুযদালিফা - মক্কা শরীফ
বাংলাদেশ থেকে মক্কা শরীফ	বাংলাদেশ থেকে অথবা মিকাতে পৌঁছে ইহরাম বাঁধার জন্য মোচ, চুল, নখ, নাক, বগল ও নাভীর নিচ পরিষ্কার করে অজু-গোসল করবেন। ইহরামের কাপড় পরিধান করে ছালাতুল ইহরাম ২ রাকাত নামাজ পড়বেন। হজ্জ ও উমরার নিয়ত করে ৩ বার তালবিয়া পড়ে মুনাজাত করবেন। মক্কা শরীফ পৌঁছে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করে, মাকামে ইব্রাহীমে তাওয়াফের নামায পড়বেন। যম্যমের পানি পান করবেন। সাফা-মারওয়া দৌঁড়াবেন। সাঈ সম্পন্ন করার পর ইহরাম বাঁধা অবস্থায়ই মক্কা শরীফ অবস্থান করবেন। ইহরামের নিষিদ্ধ কর্ম সমূহ হতে বিরত থাকবেন। কোন উমরা পালন করবেন না। যত বেশি পারেন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করবেন।
৭ই জিলহজ্জ	মিনায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হউন।
৮ই জিলহজ্জ	যোহরের পূর্বেই মিনায় পৌঁছে অবস্থান করবেন।
৯ই যিলহজ্জ	ফজর থেকে তাকবীর পড়া শুরু করবেন। সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে রওয়ানা করে সূর্য হেলার পূর্বেই আরাফাতে পৌঁছিবেন। মসজিদে নামেরায় জামাতে একত্রে যোহর ও আছর পড়ুন। সম্ভব না হলে তাবুতে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আছরের ওয়াক্তে আছর পড়ুন। অবশ্যই আরাফাত মাঠের সীমার মধ্যে থাকুন। আরাফাত হতে সূর্য ডোবার পর মুযদালিফার দিকে অবশ্যই যাত্রা করুন। মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একসাথে পড়ুন। মুযদালিফা হতে জামরাতে নিক্ষেপের জন্য ৭০টি কংকর সংগ্রহ করুন। অবশ্যই মুযদালিফায় সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অবস্থান করুন। ঠিক সূর্য উঠার আগে মিনার পথে যাত্রা করুন।
১০ই জিলহজ্জ	মিনায় পৌঁছে পাথর মারার পূর্ব মুহুর্তেই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করুন, জামারা আল-আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করুন, কোরবানী করুন, চুল কাটুন, গোসল করুন, কাপড় পরিধান করুন। মক্কা শরীফে পৌঁছে তাওয়াফে যিয়ারত করুন, মাকামে ইব্রাহীমে নামায পড়ুন। সাফা-মারওয়া সাঈ করুন। মীনায় ফিরে আসুন।
১১ই জিলহজ্জ	মিনায় অবস্থান করুন। তিন জামরাতে ক্রম অনুসারে– (জামরাত আল-উলা, জামরাত আল-উস্তা, জামরাত আল-আকাবা) কংকর নিক্ষেপ করুন।
১২ই জিলহজ্জ	তিন জামরাতে ক্রম অনুসারে– (জামরাত আল-উলা, জামরাত আল-উস্তা, জামরাত আল-আকাবা) কংকর নিক্ষেপ করুন সূর্য ডোবার পূর্বেই মিনার সীমানা ত্যাগ করুন।
বিদায়	মক্কা শরীফ ত্যাগের সময় বিদায়ী তওয়াফ করুন।

উমরাহ্ এবং হজ্জের পার্থক্য

মাসআলা ঃ

উমরার শর্তাবলী হজ্জের শর্তাবলীর অনুরূপ এবং এর ইহরামের আহকামও হজ্জের ইহরামেরই মত। হজ্জের ইহরামের পর যেসব বিষয় হারাম, মাকরূহ, সুন্নত এবং মুবাহ্– এখানে উমরার বেলায়ও সে সকল বিষয়ই হারাম, মাকরূহ্, সুন্নত এবং মুবাহ। অবশ্য নিম্নবর্ণিত ব্যাপারে হজ্জ ও উমরার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

১। হজ্জের জন্য বিশেষ সময় নির্ধারিত রয়েছে, কিন্তু উমরাহ্ বৎসরের যে কোন সময়ে করা যায়। অবশ্য শুধু ৫ দিনে অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ হতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত উমরাহ্ পালন করা নিষেধ; মাকরূহে তাহরীমী।

২। হজ্জ ফরয, কিন্তু উমরা ফরয নয়।

৩। হজ্জ ফওত (বাতিল) হতে পারে, কিন্তু উমরাহ্ ফওত (বাতিল) হয় না।

৪। হজ্জে আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান, দুই নামাযের একত্রীকরণ, খোৎবা প্রভৃতি আছে, কিন্তু উমরায় এসব কিছুই নেই।

৫। হজ্জের বেলায় তাওয়াফে কুদুম এবং তাওয়াফে বিদা' প্রভৃতি অপরিহার্য, কিন্তু উমরায় তা নেই।

৬। উমরা ফাসেদ করলে অথবা নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত করার অবস্থায় তাওয়াফ করলে উমরার মধ্যে বকরী যবেহ করলেই যথেষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু হজ্জের বেলায় তা যথেষ্ট হয় না।

৭। উমরার মীকাত সকল লোকের জন্যই 'হিল্ল' এলাকা। কিন্তু হজ্জ এর বিপরীত। মক্কাবাসীকে হরম হতে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে হয়। অবশ্য বাইরের কোন লোক যখন আগমন করেন এবং উমরাহ পালনের ইচ্ছা করেন, তখন তারা নিজ নিজ মীকাত হতেই ইহরাম বেঁধে আসবেন।

৮। উমরার ক্ষেত্রে তাওয়াফ শুরু করার সাথে সাথেই তালবিয়াহ্ পাঠ মুলতবী করতে হয়, কিন্তু হজ্জের ক্ষেত্রে জামরায়ে উখরার রামি আরম্ভ করার সময় হতে মুলতবী করতে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাওয়াফ-এ বাইতুল্লাহ্

তাওয়াফ অর্থ ঃ

তাওয়াফের শাব্দিক অর্থ হলো কোন কিছুর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করা। হজ্জে তাওয়াফের অর্থ কা'বা শরীফের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা। হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাতীম সহ কাবা ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে পুনরায় হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত একবার প্রদক্ষিণ করা হয়। এভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ করলে এক তাওয়াফ হয়।

তাওয়াফের ফযীলত ঃ

তাওয়াফের বহুবিধ ফযীলত রয়েছে এবং কোরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে এর প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কা'বা শরীফ-কে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ ঘর বলে অভিহিত করে তাওয়াফ কারীদের মর্যাদায় হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কে নির্দেশ দেন–

أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"তোমরা দু-জনে পবিত্র কর, আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য।"– সূরা বাকারা-২ঃ১২৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (দ:) বলেছেন, আল্লাহ্, তা'আলা বায়তুল্লাহ্ শরীফের উপর প্রত্যহ একশ' বিশটি রহমত নাযিল করেন। তন্মধ্যে ষাটটি রহমত তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি নামায আদায়কারীদের জন্য এবং বিশটি বায়তুল্লাহ্ শরীফের দর্শনার্থীদের জন্য। অন্য আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করেন, তার এক কদম উঠিয়ে আরেক কদম রাখার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা একটি পাপ ক্ষমা করে দেন, একটি নেকী লিখে দেন, আর একটি মর্যাদা বুলন্দ করেন।

বর্ণিত আছে, তাওয়াফের সাত চক্করের একটি চক্কর এক উমরার তুল্য এবং তিনটি উমরা এক হজ্জের তুল্য। হাদীসে শরীফে আছে, "আল্লাহ্র এ ঘরকে তুলে নেওয়ার পূর্বে যত বেশী পার এর তাওয়াফ করে নাও।"

মক্কা মুকাররামায় অবস্থানকালে যত বেশী সম্ভব তাওয়াফ সম্পন্ন করা উচিত। কেননা, এই নিয়ামত সর্বদা নসীব হবে না। অধিকাংশ সময় হরম শরীফেই অতিবাহিত করবেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফকে প্রাণ ভরে দেখবেন। বায়তুল্লাহ শরীফকে দেখাও এবাদত।

তাওয়াফের সংক্ষিপ্ত দোয়া ঃ

যারা তাওয়াফের শব্দ মুখস্থ করতে পারছেন না তারা নিম্নের দোয়া পাঠ করবেন।
হাজরে আসওয়াদ বরাবর হলে পড়বেন–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

"বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালিল্লা-হিল হামদু ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালা-মু আ'লা রাসুলিল্লাহি।"

চক্করের সময় পড়বেন–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ–
وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ– وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

"সুবহানাল্লাহি ওয়াল্‌হামদুলিল্লাহি ওয়া-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল্ আলিইল্ আজীম্। ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

রোকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে পড়বেন–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ
النَّارِ– وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ– يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ–

"রাব্বানা আতিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল্ আখিরাতি হাছানাতাও ওয়াক্বিনা আজাবান্‌নার। ওয়া আদখিল্‌নাল জান্নাতা মা'আল আব্‌রার, ইয়া আজিজু ইয়া গাফ্‌ফারু, ইয়া রাব্বাল্ আলামীন।"

তাওয়াফের সহজ দোয়া ঃ

তাওয়াফের নিয়ত করে যখন মুলতাযামের সামনে আসবেন, তখন এই দোয়া পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

"আল্লাহুম্মা ঈমানাম্ বিকা ওয়াতাস্‌দীকাম্ বিকিতাবিকা ওয়াওয়াফাআম্ বিআহ্‌দিকা ওয়াইত্তিবাআল্ লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

অতঃপর যখন মাকামে ইব্রাহীমের সামনে আসবেন, তখন এই দোয়া পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَ الْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ
النَّارِ فَاَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

"আল্লাহুম্মা ইন্না হা-যাল্ বাইতা বাইতুকা, ওয়াল্ হারামা হারামুকা, ওয়াল্‌আম্‌না আম্‌নুকা, ওয়াহা-যা মাকামুল্ আ-ইযি বিকা মিনান্‌নারি, ফাআজিরনী মিনান্ নারি।"

তারপর যখন রুকনে শামীর (উত্তর-পূর্ব কোণ) বরবার পৌঁছাবেন, তখন এই দোয়া পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ سُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ
الْمُنْقَلَبِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَ الْوَلَدِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আঊযুবিকা মিনাশ্ শাক্কি, ওয়াশ্শিরকি, ওয়াশ্ শিক্বাকি, ওয়ান্নিফাক্বি, ওয়াসূ'ইল্ আখ্লাক্বি, ওয়াসূ'ইল্ মুন্ক্বালাবি ফিল্আহ্লি ওয়াল্মালি ওয়াল্ওয়ালাদি।"

আর যখন মীযাবে রহমত বরাবর পৌঁছাবেন, তখন এই দোয়া পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِیْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَلَا بَاقِیَ اِلَّا وَجْهُكَ وَ اَسْقِنِیْ

مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ شَرْبَةً هَنِيْئَةً لَا اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا

"আল্লাহুম্মা! আযিল্লানী তাহ্তা যিল্লি আরশিকা, ইয়াওমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুকা, ওয়ালা বাক্বিয়া ইল্লা ওয়াজ্হুকা, ওয়াআস্ক্বিনী মিন্ হাওযি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শার্বাতান্ হানীআতাল্ লা-আযমাউ বা'দাহা আবাদা।"

রুকনে ইয়ামানী হতে বের হয়ে এই দোয়া পড়বেন–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্য়া হাসানাতান্ ওয়াফিল্আ-খিরাতি হাসানাতান্ ওয়াক্বিনা আযাবান্ নারি।"

তাওয়াফের মধ্যে এই দোয়াটিও পাঠ করার কথা বর্ণিত হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِیْ بِمَا رَزَقْتَنِیْ وَ بَارِكْ لِیْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰی كُلِّ غَائِبَةٍ لِّیْ بِخَيْرٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ

"আল্লাহুম্মা ক্বান্নি'অনী বিমা রাযাক্তানী ওয়াবারিক্ লী ফীহি ওয়াখ্লুফ্ আলা কুল্লি গায়িবাতিল্ লী বিখাইরিন্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শরীকা লাহু লাহুল্ মুল্ক ওয়ালাহুল্ হাম্দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।"

তাওয়াফের মধ্যে নিম্নোক্ত দোয়াটিও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে প্রমাণিত রয়েছে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকার রা-হাতা ইন্দাল্ মাওতি ওয়াল্ আফ্ওয়া ইন্দাল্ হিসাবি।"

রুকনে ইয়ামানীর নিকট পৌঁছে এই দোয়াটিও পাঠ করা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে প্রমাণিত আছে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْیِ فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল্ কুফ্রি ওয়াল্ফাক্বাতি ওয়ামাওয়াক্বিফিল্ খিযয়ী ফিদ্দুন্য়া ওয়াল্আখিরাতি।"

মুলতাযামে দাঁড়িয়ে যে দোয়া ইচ্ছা প্রার্থনা করবেন। এই জায়গায় দোয়া কবুল

হয়ে থাকে। এখানে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ وَ اَعِذْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَنَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى نَعْمَائِكَ وَاَفْضَلُ صَلَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ اَنْبِيَائِكَ وَجَمِيْعِ رُسُلِكَ وَاَصْفِيَائِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَ اَوْلِيَائِكَ

“আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যাল্ বাইতিল্ আতীকি, আত্‌তিক রিক্বাবানা মিনান্ নারি ওয়া আইযনা মিনাশ্ শাইতানির রাজীম। ওয়াবারিক লানা ফীমা আ’তাইতানা-আল্লাহুম্মাজআল্‌না মিন্ আক্‌রামি ওফ্‌দিকা আলাইকা। আল্লাহুম্মা লাকাল্ হামদু আলা না’মায়িকা ওয়াআফ্‌যালু সালাতিকা আলা সাইয়্যিদি আম্বিয়াইকা ওয়াজামিই রুসুলিকা ওয়াআস্‌ফিয়াইকা ওয়াআলা আ’লিহি ওয়াআসহাবিহি ওয়াআওলিয়াইকা।”

তাওয়াফের প্রকারভেদ

তাওয়াফ ০৭ (সাত) প্রকার। যথা–

(১) তাওয়াফে কুদুম ঃ অর্থাৎ পবিত্র মক্কায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম তাওয়াফ। এটাকে তাওয়াফে তাহিয়্যাহ, তাওয়াফুল-লিক্বা এবং তাওয়াফুল ওয়ারূদও বলা হয়। এটা মক্কার বাইরের সেসব লোকের জন্য সুন্নত যারা শুধু হজ্জ অথবা ক্বেরান আদায় করবেন। তামাত্তো’ ও উমরা পালনকারীদের জন্য সুন্নত নয়। এমনিভাবে তা মক্কার অধিবাসীদের জন্যও সুন্নত নয়। মক্কায় প্রবেশের সময়টিই হচ্ছে এর আউয়াল ওয়াক্ত।

(২) তাওয়াফে যিয়ারত ঃ এটাকে তাওয়াফে রুকন, তাওয়াফে হজ্জ এবং তাওয়াফে ফরযও বলা হয়। এটা হজ্জের অন্যতম রুকন। এটা বাদ পড়লে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। এর সময় ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক হতে আরম্ভ হয় এবং কোরবানীর দিবস সমূহ অর্থাৎ ১০ হতে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব সময় পর্যন্ত সম্পন্ন করা ফরয।

(৩) তাওয়াফে সদর ঃ অর্থাৎ, বায়তুল্লাহ শরীফ হতে প্রত্যাবর্তনের তাওয়াফ। একে তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফও বলা হয়। এটা বহিরাগতদের উপর ওয়াযিব। মক্কার অধিবাসী এবং বহিরাগত যেসব লোক স্থায়ীভাবে মক্কায় বসবাস করেন তাদের উপর ওয়াজিব নয়। এই তাওয়াফে রমল অথবা ইযতেবা করতে হয় না এবং এর পরে সাঈও নেই। উপরোল্লিখিত তাওয়াফ তিন প্রকার হজ্জের সাথেই সম্পর্কযুক্ত।

(৪) তাওয়াফে উমরা ঃ এটা উমরার ক্ষেত্রে রুকন ও ফরয। এতে ইযতেবা এবং রমল করতে হয়। আর পরে সাঈও করতে হয়।

(৫) তাওয়াফে নযর ঃ এটা মান্নত হজ্জকারীদের উপর ওয়াজিব।

(৬) তাওয়াফে তাহিয়্যাহ ঃ এটা মসজিদে হারামে প্রবেশকারীদের জন্য

মুস্তাহাব। তবে যদি কেউ অন্য কোন প্রকার তাওয়াফ করে থাকেন, তাহলে সেটিই এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে।

(৭) তাওয়াফে নফল ঃ এটা যখন ইচ্ছা সম্পন্ন করা যায়।

তাওয়াফের আহকাম (ফরয) ঃ

নামায আদায় করার জন্য ওযু করা ফরয। আর ওযুর মধ্যে ৪টি ফরয। তেমনি ভাবে হজ্জ ও উমরা আদায়ে তাওয়াফ করা ফরয। আর তাওয়াফ সম্পাদনের জন্য ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদি বিধান রয়েছে।

তাওয়াফের আরকান (ফরয) ঃ

তাওয়াফের ফরয ৪টি। যথা ঃ

(১) তাওয়াফের জন্য নিয়্যত করা।

(২) তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর পূর্ণ করা।

(৩) তাওয়াফ বায়তুল্লাহকে ঘিরে চতুস্পার্শে, মসজিদে হারামের ভিতরে করা।

(৪) নিজে তাওয়াফ করা। কোন কিছুর উপরে আরোহণ করে হলেও। কিন্তু বে-হুশ ব্যক্তি এই নিয়মের বাইরে। তার পক্ষ হতে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিও তাওয়াফ করতে পারেন।

হজ্জের তাওয়াফের শর্ত (ফরয) **৩টি ঃ**

(১) বিশেষ সময় হওয়া।

(২) তাওয়াফের পূর্বে ইহরাম বাঁধা।

(৩) অকুফে আরাফা পাওয়া।

হজ্জ ব্যতীত অন্য সকল তাওয়াফের শর্ত (ফরয) **৩টি ঃ**

(১) মুসলমান হওয়া।

(২) নিয়ত করা।

(৩) মসজিদে হারামের ভিতরে তাওয়াফ করা।

তাওয়াফের জন্য নিয়ত শর্ত। নিয়ত ছাড়া যদি কেউ বায়তুল্লাহ শরীফের চারদিকে সাতবারও প্রদক্ষিণ করেন, তা হলে তাওয়াফ আদায় হবে না।

যদি কোন ব্যক্তির বায়তুল্লাহ শরীফের খবর না থাকে এবং সাতবার প্রদক্ষিণ করে ফেলেন, তা হলে এই তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না।

শুধু তাওয়াফের নিয়তই তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কোন ধরনের তাওয়াফ সমাপন করছেন, তা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়। এটা শুধু মুস্তাহাব অথবা সুন্নত। সুতরাং যদি কারও উপরে কোন বিশেষ সময় কোন তাওয়াফ ওয়াজিব হয়ে থাকে এবং তিনি তা নির্দিষ্ট করে অথবা নির্দিষ্ট না করেই ঐ সময়ে আদায় করে নেন, তাহলেও যথেষ্ট হয়ে যাবে।

তাওয়াফের ওয়াজিব সমূহ ঃ

তাওয়াফের ওয়াজিব ৮টি। যথা–

(১) পবিত্রতা অর্থাৎ, হাদাসে আছ্‌গর ও হাদাসে আকবর (ওযু প্রয়োজন বা গোসল ফরয হওয়া) হতে পাক হওয়া।

(২) সতরে আওরাত করা-নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহ আবৃত করা।

(৩) যারা পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতে পারে তাদের জন্য পদব্রজে তাওয়াফ করা।

(৪) নিজের ডান দিক হতে তাওয়াফ শুরু করা।

(৫) হাতীমকে কা'বা শরীফের অন্তর্ভূক্ত করে তাওয়াফ করা।

(৬) "হাজারে আসওয়াদ" হতে তাওয়াফ আরম্ভ করা। তবে এই ব্যাপারে মত-ভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে এটা সুন্নত। যাহেরী রেওয়ায়তও তাই।

(৭) পূর্ণ তাওয়াফ (৭ চক্কর) সমাপন করা। অর্থাৎ, অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করা তো রুকনই বটে, অধিকাংশ হতে বেশী সম্পন্ন করা ওয়াজিব।

(৮) তাওয়াফের পরে দুই রাকাআত নামায আদায় করা। কেউ কেউ এটাকে পৃথক ওয়াজিব গণ্য করেছেন।

তাওয়াফের ওয়াজিবের হুকুম ঃ

তাওয়াফের ওয়াজিবের হুকুম এই যে, যদি কেউ কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেন, তবে তাকে পুনরায় তাওয়াফ করতে হবে। যদি তা না করেন, তবে দম বা কোরবানী ওয়াজিব হবে। যার বিস্তারিত বর্ণনা 'অপরাধ' অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

তাওয়াফের সুন্নাতসমূহ ঃ

তাওয়াফের সুন্নাত ১০টি। যথা–

(১) হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা।

(২) ইযতেবা করা।

(৩) প্রথম তিন চক্করে রমল করা।

(৪) অবশিষ্ট চক্করগুলিতে রমল না করা বরং ধীরে-সুস্থে তাওয়াফ করা।

(৫) সাঈ এবং তাওয়াফের মাঝে ইস্তিলাম করা। (এটা সে ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি তাওয়াফের পরে সাঈ করেন)।

(৬) হাজারে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার সময় উভয় হাত তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় উপরে ওঠানো।

(৭) হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ আরম্ভ করা। (এটা অধিকাংশের মতে সুন্নত এবং কেউ কেউ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন)।

(৮) তাওয়াফ শুরু করার সময় হাজারে আসওয়ারে দিকে মুখ করা।

(৯) সকল চক্কর ক্রমাগত বিরতিহীনভাবে সম্পন্ন করা।

(১০) শরীর এবং কাপড়-চোপড় নাজাসাতে হাকীকী হতে পাক হওয়া।

তাওয়াফের মুস্তাহাব সমূহ ঃ

তাওয়াফের মুস্তাহাব ১২টি। যথা–

(১) তাওয়াফ "হাজারে আসওয়াদ"-এর ডান দিক হতে এমনভাবে শুরু করতে হবে যেন তাওয়াফকারীর সম্পূর্ণ দেহ হাজারে আসওয়াদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময় এর বরাবর হয়ে যায়।

(২) "হাজারে আসওয়াদ"-কে তিনবার চুম্বন করা এবং এর উপর তিনবার সিজদা করা।

(৩) তাওয়াফ করার সময় দোআ মাসুরাসমূহ পাঠ করা।

(৪) ভীড় না থাকলে এবং কারও কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে পুরুষের জন্য বায়তুল্লাহর যথাসম্ভব নিকটবর্তী হয়ে তাওয়াফ করা।

(৫) মহিলাদের জন্য রাত্রে তাওয়াফ করা।

(৬) তাওয়াফের মধ্যে বায়তুল্লাহর দেওয়ালের নিম্নভাগকেও অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া।

(৭) যদি কেউ মাঝপথে তাওয়াফ পরিত্যাগ করে থাকেন অথবা মাকরূহ পন্থায় তাওয়াফ সম্পন্ন করে থাকেন, তাহলে তা পুনরায় প্রথম হতে সম্পন্ন করা।

(৮) মুবাহ কথা-বার্তাও বর্জন করা।

(৯) যে কাজ একাগ্রতার বিঘ্ন ঘটায় তা না করা।

(১০) দোআ এবং যিকর-আযকার আস্তে আস্তে পাঠ করা।

(১১) রুকনে ইয়ামানীর ইস্তিলাম করা।

(১২) আকর্ষনীয় বস্তু-সামগ্রী দর্শন করা হতে চক্ষুকে সংযত রাখা।

তাওয়াফের মুবাহ্ কাজ সমূহ ঃ

তাওয়াফের মধ্যে যে সকল কাজ মুবাহ তা নিম্নে প্রদত্ত হল–

(১) সালাম করা।

(২) হাঁচি দেওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলা।

(৩) শরীয়ত-সম্পর্কিত মাসআলা বলে দেয়া এবং জানতে চাওয়া।

(৪) প্রয়োজন বশতঃ কথা বলা।

(৫) কোন কিছু পান করা।

(৬) দোআ তরক করা।

(৭) ভালো ভালো কবিতা আবৃত্তি করা।

(৮) পাক-পবিত্র জুতা পরিধান করে তাওয়াফ করা।

(৯) ওযর বশতঃ সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করা।

(১০) মনে মনে কোরআন তেলাওয়াত করা।

তাওয়াফের নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ ঃ

তাওয়াফের মধ্যে যে সকল কাজ নিষিদ্ধ সে বিষয়গুলি নিম্নরূপ−

(১) নাপাক অবস্থায় তাওয়াফ করা অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায় অথবা হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় পাক না হয়ে তাওয়াফ করা।

(২) বিনা-ওযরে কারও কাঁধে চড়ে এবং সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করা।

(৩) বিনা ওযুতে তাওয়াফ করা।

(৪) বিনা ওযরে হাঁটুর উপর ভর দিয়া অথবা উল্টা হয়ে তাওয়াফ করা।

(৫) তাওয়াফ করার সময় হাতীম এবং বায়তুল্লাহ্‌র মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা দিয়া বের হয়ে যাওয়া অর্থাৎ, হাতীমকে বাদ দিয়ে তাওয়াফ করা।

(৬) তাওয়াফের কোন চক্কর অথবা তা হতে কম ছেড়ে দেয়া।

(৭) "হাজারে আসওয়াদ" ছাড়া অন্য কোন স্থান হতে তাওয়াফ শুরু করা।

(৮) তাওয়াফের মধ্যে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করা। অবশ্য তাওয়াফের শুরুতে হাজারে আসওয়াদকে সামনে করার সময় এটা জায়েয আছে।

(৯) তাওয়াফের ওয়াজিব সমূহ হতে কোন একটি ছুটে যাওয় বা ত্যাগ করা।

তাওয়াফের মাকরূহ বিষয় সমূহ ঃ

তাওয়াফে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি মাকরূহ−

(১) বেহুদা ও অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলা।

(২) ক্রয়-বিক্রয় অথবা ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কথা-বার্তা বলা।

(৩) হামদ ও নাতবিহীন কবিতা আবৃতি করা। কেউ কেউ সাধারণভাবে কবিতা আবৃতিকে মাকরূহ বলেছেন।

(৪) দোআ অথবা কোরআন শরীফ এত উচ্চ স্বরে পাঠ করা যাতে অন্যান্য তাওয়াফকারী ও নামাযীদের অসুবিধা হতে পারে।

(৫) অপবিত্র কাপড়ে তাওয়াফ করা।

(৬) বিনা ওযরে রমল অথবা ইযতেবা ছেড়ে দেয়া।

(৭) হাজারে আসওয়াদের চুম্বন ছেড়ে দেয়া (সহ্যাতিত ভীড়ের কারণ ছাড়া)।

(৮) তাওয়াফের চক্করসমূহের মধ্যে অধিক বিরতি দেয়া।

(৯) তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায আদায় না করে দুই তাওয়াফকে মিলায়ে ফেলা। তবে যদি সে সময় নামায পড়া মাকরূহ হয়, তবে এক তাওয়াফের পরে কোন বিরতি না দিয়ে আরেক তাওয়াফ সম্পন্ন করা জায়েয।

(১০) তাওয়াফের নিয়ত করবার সময় তাকবীর না বলেই উভয় হাত উপরে ওঠানো।

(১১) খুৎবা অথবা ফরয নামাযের জামায়াত শুরু হওয়ার সময় তাওয়াফ করা।

(১২) তাওয়াফের মাঝে কোন কিছু খাওয়া। কেউ কেউ পান করাকেও মাকরূপ বলেছেন।

(১৩) পেশাব-পায়খানার বেগ হওয়ার পরও তাওয়াফ করতে থাকা।

(১৪) ক্ষুধা এবং রাগের অবস্থায় তাওয়াফ করা।

(১৫) তাওয়াফ করার সময় নামাযের মত হাত বাঁধা অথবা কাঁধের উপর হাত তুলে রাখা।

মহিলাদের তাওয়াফ

মাসআলা ঃ

১। মহিলারা তাওয়াফের সময় কখনোও ইযতেবা এবং রমল করবেন না এবং সাঈ করার সময় সবুজ বাতি দুইটির মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ায়ে চলবেন না; বরং নিজেদের স্বাভাবিক গতিতে চলবেন এবং যখন খুব ভিড় হবে তখন সাফা ও মারওয়ার উপরে আরোহণ করবেন না। এমনিভাবে পুরুষদের ভিড়ের সময় হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতেও যাবেন না, এমন কি একে হাত দ্বারা স্পর্শও করবেন না এবং মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে তাওয়াফের দুই রাকাআত নামাযও পড়বেন না। দূরে পড়বেন।

২। মহিলাদের জন্য মাথা মুন্ডন করা নিষিদ্ধ। সুতরাং ইহরাম খোলার পর সমস্ত চুলের ঝুঁটি ধরে এর অগ্রভাগ হতে অঙ্গুলের এক কড়া পরিমাণ চুল নিজের হাতে কেটে ফেলতে হবে। কোন বেগানা পুরুষকে দিয়ে কাটানো নিষিদ্ধ। তারা কখনো যেন মাথা মুন্ডন না করেন এবং অঙ্গুলির এক কড়ার চেয়ে যেন সামান্য বেশী করে কাটেন, তা হলেই সমগ্র চুলের অধিকাংশই কাটা হয়ে যাবে।

৩। মহিলাদের জন্য হায়েযের অবস্থায়ও হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা জায়েয; শুধু তাওয়াফ নিষিদ্ধ। যদি ইহরামের পূর্বে হায়েয দেখা দেয়, তা হলে গোসল করে ইহরাম বেঁধে হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করবেন, কিন্তু সাঈ এবং তাওয়াফ করবেন না।

৪। যদি হায়েযজনিত কারণে যথাসময়ে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়, তা হলে 'দম' ওয়াজিব হবে না। কিন্তু পবিত্র হওয়ার পর বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করে তবেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সাঈ'র বিস্তারিত বিবরণ

সাঈ'র অর্থ ঃ

'সাঈ' শব্দের আভিধানিক অর্থ দৌঁড়ানো। হজ্জের পরিভাষায় সাঈ হচ্ছে, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাত চক্কর দৌঁড়ানো। এটা হজ্জের অন্যতম ওয়াজিব। সাঈ পায়ে হেঁটে করতে হয়। ওযর বশতঃ বাহনের সাহায্যও নেয়া যায়। তবে বিনা ওযরে বাহন ব্যবহার করলে দম দেয়া ওয়াজিব হবে। সাফা ও মারওয়া বাইতুল্লাহ্ শরীফ সংলগ্ন দুটি পাহাড়। হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর জন্য পানি অন্বেষনে হযরত হাজেরা (আঃ) এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে দৌঁড়িয়ে ছিলেন। এটাকে স্মরণ

করেই সাঈ। সাঈ করার সময় সেখান থেকে বাইতুল্লাহ শরীফ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। পাহাড় দুটির দূরত্ব প্রায় ৭৫০ গজ অন্য বর্ণনায় ৭৬৬ গজ।

সাঈ'র সুন্নাত তরীকা ঃ

যে তাওয়াফের পর সাঈ করতে হবে উক্ত তাওয়াফ শেষ করে, তাওয়াফের নামায পড়ে, যম্‌যমের পানি পান করে, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবেন। এ চুম্বন করা মুস্তাহাব তারপর সাঈ'র জন্যে 'বাবুস সাফা' দিয়ে মসজিদ থেকে বের হবেন। তখন পড়বেন–

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

"বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা ফাযলিকা।"

প্রথমে সাফা পাহাড়ের নিকটে পৌঁছে–

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

"আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি ইন্নাস্ সাফা ওয়াল্ মারওয়াতা মিন্ শাআ-ইরিল্লাহি।"

(আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমিও তা দিয়েই শুরু করেছি। সাফা ও মারওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্যতম) বলে সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে নিয়ত করে কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে তিনবার হামদ্ ও সানা পাঠ করে উচ্চস্বরে তিনবার তাকবীর ও তাহ্‌লীল (আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) উচ্চরণ করবেন। তারপর দরূদ শরীফ পাঠ করবেন। তারপর নিজের জন্য ও সকলের জন্য দু'আ পাঠ করবেন।

নিম্নরূপে দু'আ করলে একত্রে সবগুলো আদায় হয়ে যেতে পারে ঃ

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى
مَا اَوْلَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَلْهَمَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ
هَدَانَا اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَ هُوَ حَىٌّ
لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ اَللّٰهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِىْ
لِلْاِسْلَامِ اَسْئَلُكَ اَنْ لَا تَنْزِعَهٗ مِنِّىْ حَتّٰى تَوَفَّانِىْ وَ اَنَا مُسْلِمٌ سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ
اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَشَائِخِىْ
وَلِلْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আল্লাহু আক্‌বারু আল্লাহু আক্‌বারু আল্লাহু আক্‌বারু ওয়াল্লিাহিল হাম্‌দু আল্‌হামদু লিল্লাহি আলা মা হাদানা আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি আলা মা আওয়াইনা আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি আলা মা আল্‌হামানা আল্‌হাম্‌দু ল্লিাহিল্লাযী হাদানা লিহা-যা ওয়ামা কুন্না লিনাহ্‌তাদিয়া লাওলা আন্ হাদানাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু য়ুহ্‌য়ী ওয়ায়ুমীতু ওয়াহুয়া হাইয়্যুল্ লা য়ামুতু বিইয়াদিহিল্ খায়রু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু সাদাকা ও'অদাহু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখ্‌লিসীনা লাহুদ্ দ্বীনা ওয়ালাও কারিহাল্ কাফিরূন্। আল্লাহুম্মা কামা হাদাইতানী লিল্ ইসলামি আস্‌আলুকা আন্ লা তান্‌যি'আহু মিন্নী হাত্তা তাওয়াফ্‌ফানী ওয়াআনা মুস্‌লিমুন। সুবহানাল্লহি ওয়ালহাম্‌দু লিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আযিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়াআলা আলিহি ওয়াসাহ্‌বিহি ওয়াআত্‌বাইহি ইলা ইয়াওমিদ্ দ্বীনি। আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ালিওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিমাশাইখী ওয়ালিল্ মুস্‌লিমীনা আজ্‌মাঈন্, ওয়াসালামুন্ আলাল্ মুর্‌সালীনা ওয়াল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল্ আলামীন্।"

এছাড়া প্রয়োজনীয় অন্যান্য দু'আ পাঠ করা যায়। পঁচিশ আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ সময় সেখানে দাঁড়াবেন। তারপর দু'আ দরূদ করতে করতে স্বাভাবিক গতিতে সাঈ শুরু করবেন। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ চিহ্নিত স্থানে পৌঁছে গতি দ্রুত করবেন এবং এ দু'আটি পাঠ করবেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"রাব্বিগ্‌ফির ওয়ারহাম্ অআন্‌তাল্ আআ'য্‌যুল্ আক্‌রাম।"

তবে মহিলাদের জন্যে এখানে দ্রুত গতিতে দৌড়ের মত অতিক্রম করার এ বিধান প্রযোজ্য নয়। সবুজ চিহ্নিত স্থানটুকু অতিক্রম করার পর পুনরায় স্বাভাবিক গতিতে অবশিষ্ট স্থান অতিক্রম করে মারওয়া পর্যন্ত পৌঁছবেন। তারপর পাহাড়ের উপরে আরোহণ করে একটু ডান দিকে ঝুকে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন এবং সেখানেও সাফা পাহাড়ের কার্যাদির ন্যায় করবেন। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গমনে একটি চক্কর তারপর পুনরায় সাফায়, পুনরায় মারওয়ায় এরূপ সাতবার সম্পন্ন করার পর মসজিদুল হারামে গিয়ে দু'রাক'আত নামায আদায় করবেন।

এ নামায মাতাফ বা তাওয়াফের স্থানের নিকটে আদায় করা মুস্তাহাব।

জ্ঞাতব্য ঃ সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ কালে একেবারে শীর্ষ দেওয়াল পর্যন্ত ওঠা মাকরূহ। হজ্জের সাঈ তাওয়াফে কুদূমের পরে এবং তামাত্তুর সাঈতে তালবিয়া পাঠ করবেন না।

সাঈ চলাকালে নামাযের জামা'আত বা জানাযা শুরু হলে সাঈ অপূর্ণ রেখেই তাতে যোগ দিতে হবে। অসম্পূর্ণ সাঈ পরে পূর্ণ করবেন। সাঈ সমূহের মধ্যে তেমন ব্যবধান সৃষ্টি করে না এমন পানাহার বা একাগ্রতা নষ্ট করে না তেমন প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ

মুবাহ বা বৈধ।

সাঈ'র জন্য জানাবাত এবং হায়েয ও নেফাস হতে পবিত্র থাকা শর্ত বা ওয়াজিব নহে। সাঈ হজ্জের হোক বা উমরার হোক। তবে পবিত্র হওয়া সুন্নাত।

সাঈ'র সংক্ষিপ্ত দোয়া ঃ

সাফা হতে মারওয়ায় যাওয়ার সময় পড়বেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ، اَللّٰهُمَّ
حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ
وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ–

"আল্লাহু আক্বার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আক্বার। ওয়ালিল্লাহিল্ হামদ্, আল্লাহুম্মা হব্বিব ইলাইনাল ঈমানা ওয়াকাররিহ্ ইলাইনাল কুফরা ওয়াল্ ফুছুকা ওয়াল্ ইছ্ইয়ানা ওয়াজ্আল্না মিন্ ইবাদিকাছ্ ছোয়ালিহীন্।"

মারওয়া হতে যাওয়ার পড়ে পড়বেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَلَانَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ– رَبِّ
اغْفِرْ وَارْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ– اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ
مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ– فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ
يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ–

"আল্লাহু আক্বার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আক্বার। ওয়ালিল্লাহিল হামদ্। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু ছদাকা ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা আব্দাহু। ওয়া হাজামাল আহ্জাবা ওয়াহ্দাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা এইয়্যাহু মুখলিছিনা লাহুদ্দীনা ও'লাও কারিহাল্ কাফিরুন্। রাব্বিগ্ফির্ ওয়ার্হাম্ ইন্নাকা আন্তাল্লাহুল আ'আজ্জুল আক্রাম। ইন্নাস্সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন্ শা'আইরিল্লাহ্। ফামান্ হাজ্জাল্ বাইতা আও ইতামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আই-ইয়াত্ তাওয়াফা বিহিমা ওয়ামান তাত্বাওয়াআ খাইরান্, ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।"

সাঈ'র শেষের দোয়া–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ– وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ– وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ
وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ–

"রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাছ্ ছামিউল আলীম্। ওয়াতুব্ আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়াবুর্ রাহীম। ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলা খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদেউ ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজ্মাইন ওয়ার্হাম্না মা'য়াহুম বিরাহ্মাতিকা ইয়া আর্হামার্ রাহিমীন্।"

সাঈ'র বিস্তারিত দোয়া

সাফা পাহাড়ে উঠতে উঠতে পড়বেন ঃ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ
اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

"ইন্নাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লাহ্ ফামান হাজ্জাল বাইতা আয়ি তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আইঁ-ইয়াত্তাওওয়াফা বিহিমা, ওয়ামান তাতাওয়াআ খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।"

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লায় হজ্জ কিংবা উমরা করবেন এই দু'টির তাওয়াফ-এ (সায়ীতে) তার জন্য দোষ নাই, কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয় আল্লাহ্ পুরষ্কারদাতা সর্বজ্ঞ।

সাফা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহ্র দিকে ফিরে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে এ দোয়া পড়বেন ঃ

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ
يُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়ালা হুল হাম্দু য়ুহ্য়ী ওয়ায়ুমীতু বিয়াদিহিল খাইরু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।"

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। বিশ্বময় তাঁর রাজত্ব-আধিপত্য। সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। আর তিনি সর্বশক্তিমান।

সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার সময় সবুজ পিলারদ্বয়ের মাঝে দ্রুত চলার সময়ের দোয়া ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"রাব্বিগফির্ ওয়ারহাম ওয়া আন্তাল আ'আয্যুল আকরাম।"

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, তুমি মহাপরাক্রমশীল, মহাসম্মানী।

প্রথম সাঈ'র দোয়া ঃ

اللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ
وَبِحَمْدِهِ الْكَرِيْمِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْلَهُ وَسَبِّحْهُ
لَيْلاً طَوِيْلاً لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ
الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لاَ شَيْءَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ
دَائِمٌ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ
اللهُ تَعْلَمُ مَالاَ نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ، رَبِّ نَجِّنَا مِنَ
النَّارِ سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ فَرِحِيْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ مَعَ عِبَادِكَ
الصَّالِحِيْنَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ، وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا ،
ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفٰى بِاللهِ عَلِيْمًا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ حَقًّا حَقًّا
لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ تَعَبُّدًا وَّرِقًّا ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

"আল্লাহু আকবারু কাবীরাঁন ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসীরা। ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযীমি ওয়া বিহামদিহিল কারীমি বুকরাতান ওয়া আসীলা ওয়া মিনাল লাইলি ফাস্‌জুদ লাহু ওয়া সাববিহ্‌হু লাইলান তাবীলা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু আন্‌জাযা ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহ্‌যাবা ওয়াহ্‌দাহু লা শাইয়া কাব্‌লাহু ওয়া লা বা'দাহ্ য়ুহ্‌য়ী ওয়া য়ুমীতু ওয়া হুয়া হাইয়ুন দাইমুন লাইয়ামূতু বিয়াদিহিল খায়রু ওয়া ইলাইহিল মাসীর, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর। **রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু**

ওয়া তাকাররাম ওয়া তাজাওয়াজ আম্মা তা'লাম ইন্নাকাল্লাহু তা'লামু মালা নালাম ইন্নাকা আন্তাল আআযযুল আকরাম। রাব্বি নাজ্‌জিনা মিনান্নারি সালিমীনা গা-নিমীনা, ফারিহীন, মুসতাবশিরীনা মাআ ইবাদিকাস্ সালিহীনা মা'আল্লাযীনা আন'আমাল্লাহু আলাইহিম মিনান্নাবিয়্যীনা ওয়াস সিদ্দিকীনা ওয়াশ্ শুহাদা-ই ওয়াস্ সালিহীন। ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফীকা। যালিকালফাদ্‌লু মিনাল্লাহি ওয়াকাফা বিল্লাহি আলীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হাক্কান হাক্কা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তা'আব্বুদাওঁ ওয়া রিক্কা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা নাবুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন ওয়া লাও কারিহাল কাফিরূন।" *(চিহ্নিত অংশটুকু বার বার পড়তে হয়। বিশেষত সবুজ চিহ্নিত পিলারদ্বয়ের মধ্যখানে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে তা পড়তে হয়।)*

অর্থ ঃ আল্লাহ্ অতি মহান আর অগণিত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বয়ান করছি, দয়াল আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনার সাহায্যে সন্ধ্যা ও সকালে, (হে মানব) রাতের কোন সময়ে উঠে তাঁর দরবারে সিজ্‌দা কর। আর দীর্ঘ রাত ধরে পবিত্রতার বয়ান কর। আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য আর কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। (অতীতে) তিনি ওয়াদা পালন করেছেন, তাঁর বান্দা [মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)]-কে একাই তিনি সাহায্য করেছেন আর পরাজিত করেছেন কাফিরদের দলগুলিকে। তিনি অনাদি, অনন্ত, তিনিই জীবন দেন এবং নেন, তিনি চিরঞ্জীব, অক্ষয়, অমর, তিনি কল্যাণময়, ফিরে যেতে হবে তাঁরই নিকট সকলকে আর সব কিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিহত। প্রভু! ক্ষমা কর, দয়া কর, গুনাহ্ মাফ কর, অনুগ্রহ কর, আর তুমি যা জান, তা মার্জনা কর। হে আল্লাহ্! তুমি সবই জান, যা আমরা জানি না তাও জান, তোমার শক্তি আর অনুগ্রহের তুলনা নেই। প্রভু! দোযখ হতে আমাদিগকে বাঁচাও। নিরাপদ, সফলকাম, আনন্দময় রাখ, তোমার নেক বান্দাদের সঙ্গে এবং তোমার নিয়ামতপ্রাপ্তগণ অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদান আর অন্যান্য নেক বান্দার সঙ্গে, তাঁরাই হচ্ছেন উত্তম বন্ধু; এ কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানেন। সত্য মনে বলছি, উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই, নেই কোন উপাস্য, আল্লাহ্ ছাড়া বন্দেগীর যোগ্য। (স্বীকার করছি) উপাস্য আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই। ইবাদত করি শুধু তাঁরই, সত্যিকার আনুগত্য শুধু তাঁরই জন্য যদিও কাফেররা তা পছন্দ করে না।

সাফা হতে মারওয়া পৌঁছলে সাঈ'র এক শাওত (চক্কর) হয়। মারওয়ায় উঠে বায়তুল্লাহ'র দিকে ফিরে সাফা'র অনুরূপ দোয়া করুন এবং দ্বিতীয় সাঈ শুরু করুন।

দ্বিতীয় সাঈ’র দোয়া ঃ

لَاۤ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ، اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِيْ كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ، دَعَوْنَاكَ رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا كَمَا وَعَدْتَّنَا إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ، رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ، رَبَّنَا فَغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ، رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَاوَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ اَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ، رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল আহাদুল ফারদুস্ সামাদুল্লাযী লাম ইয়াত্তাখিয্ সাহেবাতান ওয়া-লা ওলাদান ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু শারীকুন ফিল্ মুলকি ওয়া-লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালিউম-মিনায্‌যুল্লি ওয়া কাব্বিরহু তাকবীরা। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা কুলতা ফী কিতাবিকাল মুনায্‌যালি উদ‘উনি আস্তাজিব্ লাকুম। দা‘আওনাকা রাব্বানা, ফাগ্‌ফির লানা কামা ওয়া‘আদ্‌তানা, ইন্নাকা লা তুখ্‌লিফুল মী‘আদ। রাব্বানা ইন্নানা সামি‘য়না মুনাদিয়াইঁ য়ূনাদী লিল ঈমানি আন আমিনু বিরাাব্বিকুম ফা-আ-মান্না। রাব্বানা ফাগ্‌ফির লানা যূনুবানা ওয়াকাফ্‌ফির ‘আন্না সায়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মা‘আল আব্-রার। রাব্বানা ওয়া আ-তিনা মা ওয়া‘আদ্‌তানা আলা রুসূলিকা ওয়ালা তুখ্‌যিনা ইয়াওমাল কিয়ামা ইন্নাকা লা তুখ্‌লিফুল মী‘আদ। রাব্বানা ‘আলাইকা তাওয়াক্‌কালনা ওয়া ইলাইকা আনাব্‌না ওয়া ইলাইকাল মাসীর। রাব্বানাগ্‌ফির লানা ওয়ালি ইখ্‌ওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকুনা বিলঈমানি ওয়ালা তাজ্‌আল ফী কুলূবিনা গিল্লাললিল্লাযীনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহীম।”

অর্থ ঃ উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি (কাকে) পত্নীও বানাননি, পুত্রও বানাননি, বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর কোন অংশীদার নেই, আর কোন দূর্বলতাও নেই যে তাঁর জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। (হে

মানুষ)! তুমিও তাঁর মহত্ত্ব ভাল করে বর্ণনা কর। হে আল্লাহ্! তোমার প্রেরিত কিতাবে তুমি বলেছ, "আমাকে ডাক, আমি সাড়া দিব"। আমরা তোমাকে ডাকছি, সুতরাং আমাদের গুনাহ্ মাফ কর, আর তুমি তো ওয়াদা খিলাফ কর না। হে পরওয়ারদিগার! আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে বলতে শুনেছি, "তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন।" তাই আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমার প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ্ মাফ কর, আমাদের সব অন্যায় অনাচার মোচন করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও সৎ লোকদের সঙ্গে, আর তা-ই আমাদিগকে দান কর– যার ওয়াদা করেছ তুমি তোমার নবী-রাসূলগণের নিকট, আর লজ্জিত করো না আমাদিগকে কিয়ামতের দিনে; নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না। হে আমাদের প্রতিপালক! ভরসা করছি শুধু তোমারই উপর, আর এসেছি তোমারই নিকট এবং তোমার নিকটই ফিরে যেতে হবে; সুতরাং হে প্রভু! ক্ষমা কর আমাদিগকে আর আমাদের সেই ভাইদেরকে যারা ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অগ্রবর্তী; বিদ্বেষ দিও না আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি, যারা ঈমান এনেছে। প্রভু! তুমি সত্যই বড় দয়ালু।

তৃতীয় সাঈ'র দোয়া ঃ

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَـــىْءٍ قَدِيْـرٌ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ عَاجِلَهُ وَاٰجِلَهُ وَاَعُوْذُبِــــكَ مِـنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِـىْ وَاَسْـئَلُكَ رَحْمَتَـكَ ، اَللّٰهُمَّ رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَلاَ تُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ وَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَـذَابِ الْقَـبْرِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّـىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ، اَللّٰـــهُمَّ اِنِّـىْ اَعُـوْذُ بِرِضَـاكَ مِـنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِـــكَ مِنْـكَ لاَ اُحْصِـىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ فَلَـــكَ الْحَمْـدُ حَتّٰى تَـرْضٰى

“রাব্বানা আত্‌মিম লানা নূরানা ওয়াগ্‌ফির লানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল খায়রা কুল্লাহু ‘আ-জিলাহু ওয়া আজিলাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাশ্‌-শার্‌রি কুল্লিহী ‘আ-জিলিহী ওয়া আজিলিহী, আস্তাগফিরুকা লিযামবী ওয়া আস্‌আলুকা রাহমাতাক। আল্লাহুম্মা রাব্বি যিদ্‌নী ইল্‌মান ওয়া-লা তুযিগ কালবী বা‘দা ইয্‌ হাদায়তানী ওয়া হাব্‌লী মিল্‌ লাদুনকা রাহমাতান্‌ ইন্নাকা আন্‌তাল ওয়াহ্‌হাব। আল্লাহুম্মা আফিনী ফী সাম্‌‘ঈ ওয়া বাসারী লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিন্‌ আযাবিল কাব্‌রী লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায যা-লিমীন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিনাল কুফ্‌রি ওয়াল ফাক্‌র। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘ঊযু বিরিদাকা মিন্‌ সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন ‘উকূবাতিকা ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিন্‌কা লা উহ্‌সী সানাআন আলাইকা আন্‌তা কামা আস্‌ নাইতা ‘আলা নাফ্‌সিকা ফালাকাল হামদু হাত্তা তারদা।”

অর্থ ঃ প্রভু! আমাদের (ঈমানের) নূরকে পরিপূর্ণ কর আর ক্ষমা কর আমাদেরকে, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমাণ। হে দয়ালু! তোমার নিকট প্রার্থনা করছি সব রকম কল্যাণ, যা তাড়াতাড়ি আসে তাও, যা দেরিতে আসে তাও। আশ্রয় চাচ্ছি তোমারই সব রকম অকল্যাণ হতে তা আশু লভ্য হোক কিংবা গৌণে লভ্য; মার্জনা চাচ্ছি আমার গুনাহের, আর ভিক্ষা চাচ্ছি তোমার রহমতের। হে আল্লাহ্! হে প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, বিভ্রান্ত করো না আমার অন্তরকে সত্য পথ দেখবার পর, দান কর আমাকে তোমার খাস রহমত, নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা। হে আল্লাহ্! নির্দোষ কর আমার কান আর চক্ষুকে, উপাস্য তুমি ব্যতীত আর কেউ নেই। হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার নিকট কবরের আযাব হতে, উপাস্য তুমি ব্যতীত আর কেউ নেই। পবিত্র তোমার সত্তা, নিশ্চয়ই আমি পাপী-তাপী। হে আল্লাহ্! তোমার নিকট পানাহ্ চাচ্ছি কুফ্‌র আর দারিদ্র হতে। হে আল্লাহ্! আশ্রয় চাচ্ছি তোমার তুষ্টির দ্বারা তোমার রোষানল হতে, তোমার বখশিশের দ্বারা তোমার শাস্তি হতে আর তোমার নিকট থেকে তোমারই আশ্রয় চাচ্ছি। কুলিয়ে উঠতে পারি না তোমার প্রশংসা করে। তুমি ঠিক তেমনি, যেমনটি তুমি নিজে বর্ণনা করেছ। সব প্রশংসাই তোমার যতক্ষণ না তুমি খুশী হও।

চতুর্থ সাঈ’র দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا
تَعْلَمُ اِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ، لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ،
مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ الصَّادِقُ الْوَعْدِ الْاَمِيْنُ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ
كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لاَّ تَنْزِعَهُ مِنِّىْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِىْ عَلَيْهِ وَاَنَا
مُسْلِمٌ ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَفِىْ

بَصَرِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاَعُوْذُبِكَ
مِنْ شَرِّ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اَللّٰهُمَّ
اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِىْ اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَالِجُ فِىْ
النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَهُبُّ الرِّيَاحُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، سُبْحَانَكَ
مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ يَا اللهُ ، سُبْحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ
ذِكْرِكَ يَا اَللهُ –

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন্ খায়রি মা তা'লামু ওয়াস্তাগ্ফিরুকা মিন কুল্লি মা তা'লামু ইন্নাকা 'আল্লামুল গুয়ূব। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবীন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহিস্ সাদিকুল ও'য়াদিল আমীন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা কামা হাদাইতানী লিল্ ইসলামি আল্ লা তানযি'আহু মিন্নী হাত্তা তাতাওয়াফ্ফানী 'আলাইহি ওয়া আনা মসলিম। আল্লাহুম্মাজ্'আল ফী কালবী নূরান ওয়া ফী সাম'ঈ নূরান ওয়া ফী বাসারী নূরা। আল্লাহুম্মাশ্রাহ্ লী সাদ্রী ওয়া ইয়াস্সিরলী আমরী ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্রি ওয়াসায়িসিস্ সাদ্রি ওয়া শাতাতিল আম্রি ওয়া ফিত্নাতিল কাব্র। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শার্রি মা ইয়ালিজু ফিল্লাইলি ওয়া মিন্ শার্রি মা ইয়ালিজু ফিন্নাহারি ওয়া মিন শার্রি মা তাহুব্বুররিয়াহু ইয়া আরহামার রাহিমীন। সুবহানাকা মা 'আবাদ্নাকা হাক্কা ইবাদাতিকা ইয়া আল্লাহ্! সুবহানাকা মা যাকার্নাকা হাক্কা যিক্রিকা ইয়া আল্লাহ্!"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার নিকট চাচ্ছি সব জিনিসের মঙ্গল, যা তোমার জানা আছে। আর মাফ চাচ্ছি সব গুনাহ্ হতে যা তুমি জান, কেবল তুমি তো গায়েব সম্পর্কে জান। নাই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ছাড়া–যিনি সবার সম্রাট, সত্য সুস্পষ্ট, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, বিশ্বাসী। ইয়া আল্লাহ্! তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, যেমন করে ইসলামের পথ আমাকে দেখিয়েছ, তেমনি আমার নিকট হতে তা ছিনিয়ে নিও না মরণ পর্যন্ত, আর মরণ যেন হয় আমার মুসলিম হিসাবে। হে আল্লাহ্! আলো দাও আমার অন্তরে, শ্রবণে আর দৃষ্টিতে। আল্লাহ্! উন্মুক্ত করে দাও আমার বক্ষ, সহজ করে দাও আমার কাজ, আর পানাহ্ চাচ্ছি তোমার নিকট, মনের সন্দেহ বিকারের অনিষ্ট হতে, বিষয় কর্মের পেরেশানী হতে আর কবরের ফিতনা হতে। হে আল্লাহ! তোমার নিকট পানাহ্ চাচ্ছি সেই সব জিনিসের অনিষ্ট হতে–যা রাত্রে আর যা দিনে আসে এবং যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে আসে। হে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার উপযুক্ত বন্দেগী করতে পারিনি। হে আল্লাহ্! তুমি পাক-পবিত্র। স্মরণ করিনি তোমাকে তেমন করে ঠিক যেমন করে করা উচিত, হে আল্লাহ্!

পঞ্চম সাঈ'র দোয়া ঃ

سُبْحَانَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ يَا اَللهُ ، سُبْحَانَكَ مَا
قَصَدْنَاكَ حَقَّ قَصْدِكَ يَا اَللهُ ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ
فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ
عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ قِنَا عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ،
اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ بِالْهُدٰى وَنَقِّنِىْ بِالتَّقْوٰى وَاغْفِرْلِىْ فِى الْاٰخِرَةِ
وَالْاُوْلٰى ، اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ
وَرِزْقِكَ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِىْ لَا يَحُوْلُ
وَلَا يَزُوْلُ اَبَدًا ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا ، وَفِىْ سَمْعِىْ
نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا
وَمِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا وَعَظِّمْ لِىْ نُوْرًا رَبِّ
اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ ، اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ
شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ
بِهِمَا ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

"সুবহানাকা মা শাকারনাকা হাক্কা শুকরিকা ইয়া আল্লাহ্! সুবহানাকা মা কাসাদনাকা হাক্কা কাসদিকা ইয়া আল্লাহ্! আল্লাহুম্মা হাব্বিব্ ইলাইনাল ঈমানা ওয়া যাইয়িন্হু ফি কুলূবিনা ওয়া কার্রিহ্ ইলাইনাল কুফরা ওয়াল ফুসূকা ওয়াল ইস্ইয়ান, ওয়াজ্'আলনা মিন ইবাদিকাস সালিহীন। আল্লাহুম্মা কিনা আযাবাকা ইঁয়াওমা তাব'আসু, ইবাদাকা 'আল্লাহুম্মাহদিনী বিল্হুদা ওয়া নাক্কিনী বিত্ তাক্ওয়া ওয়াগফির্লী ফিল আখিরাতি ওয়াল উলা। আল্লাহুম্-মাব্সুত 'আলাইনা মিন বারাকাতিকা ওয়া রাহ্মাতিকা ওয়া ফাদলিকা ওয়া রিয্কিক। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকান না-ঈমাল মুকীমাললাযী লা ইয়াহুলু ওয়ালা ইয়াযুলু আবাদা। আল্লাহুম্মাজ আল ফী কাল্বী নূরান, ওয়া ফী সাম'ঈ নূরান, ওয়া ফী বাসারী নূরান, ওয়া ফী লিসানী নূরান, ওয়া আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া মিন ফাওকী নূরান ওয়াজআল ফী নাফ্সী নূরান, ওয়া আয্যিম লী নূরা। রাব্বিশ্ রাহ্লী সাদ্রী ওয়া ইয়াস্সির লী আম্রী। ইন্নাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল্ বায়তা আবি'তামারা ফালা

জুনাহা আলায়হি আঁইয়াত্ তাওওয়াফা বিহিমা, ওয়া মান তাতাওওয়া'আ খায়রান ফা-ইন্নাল্লাহা শা-কিরুন আলীম।”

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি পাক-পবিত্র, তোমার শোকর আদায় তেমনি করি নাই–যেমনটি করা উচিত। হে আল্লাহ! তুমি পাক-পবিত্র, তোমাকে চাওয়ার মত চাইনি। হে আল্লাহ্! ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় করে দাও আর আমাদের অন্তরে একে সুশোভিত করে দাও এবং আমাদের নিকট ঘৃণ্য করে দাও কুফ্রকে, দুস্কৃতি আর অবাধ্যতাকে এবং আমাদিগকে শামিল কর তোমার নেককার বান্দাদের মধ্যে। হে আল্লাহ্! বাঁচাও আমাদের তোমার আযাব হতে সে দিন, যেদিন তুমি আবার উঠাবে তোমার বান্দাদেরকে। হে আল্লাহ্! দেখাও আমাকে সরল পথ, নিষ্পাপ কর আমাকে তাকওয়ার সাহায্যে। আমাকে মাগফিরাত কর দুনিয়া আর আখিরাতে। হে আল্লাহ্! ছড়িয়ে দাও আমাদের উপর তোমার বরকত, ফযল আর রিযিক। হে আল্লাহ্! তোমার নিকট সে নিয়ামত চাচ্ছি, যা স্থায়ী হবে এবং হাতছাড়া কিংবা বিনাশ হবে না কখনও। হে আল্লাহ! আমার হৃদয়কে, আমার শ্রবণ শক্তিকে, আমার দৃষ্টি শক্তিকে, আমার যবানকে, আমার সম্মুখে এবং উপরকে তোমার নূরের আলোকে আলোকিত করে দাও। হে প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রসারিত করে দাও এবং কর্মসমূহকে সহজ করে দাও। নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। সুতরাং যে খানা-ই-কা'বার হজ্জ করে কিংবা উমরা করে, তার পক্ষে নিদর্শন দু'টির তাওয়াফ (সাঈ) করায় কোন দোষ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুরষ্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

ষষ্ঠ সাঈ'র দোয়া ঃ

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ، لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ
وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الاَحْزَابَ وَحْدَهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ
اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ،
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافُ وَالْغِنٰى اَللّٰهُمَّ
لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ نَقُوْلُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُوْلُ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ
اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ وَمَا
يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ ، اَللّٰهُمَّ بِنُوْرِكَ اهْتَدَيْنَا
وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْنَا وَفِىْ كَنَفِكَ وَاِنْعَامِكَ وَعَطَائِكَ وَاِحْسَانِكَ

أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَالْآخِرُ فَلَا بَعْدَكَ شَيْءٌ وَالظَّاهِرُ فَلَا شَيْءٌ فَوْقَكَ وَالْبَاطِنُ فَلَا شَيْءٌ دُوْنَكَ ، نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَلْسِ وَالْكَسْلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْغِنٰى وَنَسْئَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَالَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ، إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু সাদাকা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্‌দাহ্। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখ্‌লিসীনা লাহুদ্দীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল হুদা ওয়াত্‌তুকা ওয়াল আফাফা ওাল গিনা, আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কাল্লাযী নাকুলু ওয়া খাইরাম মিম্মা নাকুলু। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা রিদাকা ওয়াল জান্নাতা ওয়া আ'উযুবিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান্‌নার' ওয়া মা ইয়ূকার্‌রিবুনী ইলাইহা মিন কাওলিন আও ফি'লিন আও 'আমাল। আল্লাহুম্মা বিনূরিকাহ্ তাদাইনা ওয়া বিফাদ্‌লিকাস তা'আন্না ওয়া ফী কুন্‌ফিকা ওয়া ইন্'আমিকা ওয়া 'আতাইকা ওয়া ইহ্‌সানিকা আস্‌বাহ্‌না ওয়া আমসাইনা, আন্‌তাল আউয়ালু ফালা কাব্‌লাকা শাইয়ূন, ওয়াল আখিরু ফালা বা'দাকা শাইয়ুন ওয়ায্‌যাহিরু ফালা শাইয়ুন ফাওকাকা, ওয়াল বাতিনু ফালা শাইয়ুন দূনাক। না'উযুবিকা মিনাল্ ফাল্‌সি ওয়াল কাসলি ওয়া আযাবিল কাবরি ওয়া ফিত্‌নাতিল গিনা ওয়ানাস্‌আলুকাল ফাউযা বিল জান্নাহ্। রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়াতাকার্‌রাম্ ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'আমু ইন্নাকা তা'লামু মা লা-না'লামু ইন্নাকা আন্‌তাল্লাহুল আ'আয্‌যুল আকরাম। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল্ বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা আলায়হি আঁইয়াত্ তাওওয়াফা বিহিমা, ওয়া মান তাতাওওয়া'আ খাইরান ফা-ইন্নাল্লাহা শা-কিরুন আলীম।"

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর ওয়াদা চিরসত্য। তিনি তাঁর

বান্দাকে (নবীকে) সাহায্য করেছেন, কাফিরদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন। তিনি এক এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, যদিও বিধর্মীগণ এই সত্য ধর্মকে অস্বীকার করে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট চাচ্ছি হিদায়াত, তাকওয়া, শান্তি এবং ঐশ্বর্য! হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা যা আমরা করি এবং যতটুকু আমরা করি, তা হতে তুমি অনেক ঊর্ধ্বে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার সন্তুষ্টি এবং বেহেশ্‌ত চাচ্ছি এবং আশ্রয় চাচ্ছি তোমার ক্রোধ ও দোযখ হতে এবং যে সমস্ত কথা ও কার্যক্রম দোযখের নিকটবর্তী করে, ঐ সমস্ত কথা ও কার্যক্রম হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তোমার নূরের আলোকে আমাদিগকে আলোকিত কর, তোমার রহমত দ্বারা আমাদিগকে পরিপূর্ণ কর। তোমারই নিয়ামতসমূহ এবং ইহ্সানের মধ্যে আমরা সকাল বিকাল অতিবাহিত করি। তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কেউ নেই এবং তুমিই শেষ, তোমার পরেও কেউ নেই। তুমিই যাহির এবং তুমিই বাতিন। আমরা তোমার নিকট দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, কবরের আযাব এবং প্রাচুর্য্যের ফিতনা হতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং তোমার নিকট বেহেশ্‌ত লাভের সাফল্য কামনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর, দয়া কর এবং মেহেরবানী কর। নিশ্চয়ই আমরা যা করছি, সব তোমার জানা আছে। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্ মহাসম্মানী। নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং যে খানা-ই-কা'বার হজ্জ করে কিংবা উমরা করে, তার জন্য এ নিদর্শন দু'টির তাওয়াফ (সাঈ) করায় কোন দোষ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুরষ্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

সপ্তম সাঈ'র দোয়া ঃ

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ قَلْبِيْ وَكَرِّهْ اِلَيَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الرَّاشِدِيْنَ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَالاَ نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ اللهُ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ، اَللّٰهُمَّ اخْتِمْ بِالْخَيْرَاتِ اٰجَالَنَا وَ حَقِّقْ بِفَضْلِكَ اٰمَالَنَا وَ سَهِّلْ لِبُلُوْغِ رِضَاكَ سُبُلَنَا وَ حَسِّنْ فِيْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ اَعْمَالَنَا يَا مُنْقِذَ الْغَرْقٰى يَا مُنْجِيَ الْهَلْكٰى ، يَاشَاهِدَ كُلِّ نَجْوٰى يَا مُنْتَهٰى كُلِّ شَكْوٰى يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ يَا دَائِمَ الْمَعْرُوْفِ يَامَنْ لَاغِنٰى بِشَيْءٍ عَنْهُ وَلَا بُدَّ بِكُلِّ

شَيْءٍ مِّنْهُ ، يَامَنْ رِزْقُ كُلِّ شَيْئٍ عَلَيْهِ وَمَصِيْرُ كُلِّ شَـيْءٍ اِلَيْهِ ،
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَائِذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا اَعْطَيْتَنَـا وَمِـنْ شَـرِّ مَـا مَنَعْتَنَـا ،
اَللّٰهُمَّ تَـوَفَّـنَا مُسْلِمِيْنَ وَالْحِقْنَا بِـالصَّالِحِيْنَ غَيْـرَ خَـزَايَا
وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ ، رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ رَبِّ اَتْمِمْ بِـالْخَيْرِ ، اِنَّ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَـرَ فَـلاَ
جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَـنْ تَطَـوَّعَ خَـيْرًا فَـاِنَّ اللهَ شَـاكِرٌ
عَلِيْمٌ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবারু কাবীরান ওয়াল হাম্দু লিল্লাহি কাসীরা। আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইয়াল ঈমানা ওয়াযায়্যিন্হু ফী কাল্বী ওয়া কার্রিহ্ ইলাইয়াল কুফ্রা ওয়াল ফুসূকা ওয়াল ইস্ইয়ান ওয়াজআলনী মিনার রা-শিদীনা। রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়া তাকার্রাম ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা না'লাম ইন্নাকা আন্তাল্লাহুল আ'আযযুল আকরাম। আল্লাহুম্মাখ্তিম বিল খায়রাতি আজালনা ওয়া হাক্কিক বি ফাদলিকা আ-মালানা ওয়াসাহ্হিল লিবুলুগি রিদাকা সুবুলানা ওয়া হাস্সিন ফী জামীইল আহ্ওয়ালি আ'মালানা, ইয়া মুন্কিযাল গার্কা, ইয়া মুন্জিয়াল হাল্কা। ইয়া-শাহিদা কুল্লি নাজ্ওয়া, ইয়া মুনতাহা কুল্লি শাক্ওয়া ইয়া কাদীমাল ইহ্সানি ইয়া দায়িমাল্ মা'রূফ, ইয়া মান্ লা গিনান্ বিশাইয়িন আন্হু ওয়ালা বুদ্দা বিকুল্লি শাইইন মিন্হু, ইয়ামার রিয্কু কুল্লি শাইয়িন আলাইহি, ওয়ামাসীরু কুল্লি শাইয়িন ইলায়হি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আ-য়িযুবিকা মিন্ শার্রি মাআ'তাইতানা ওয়া মিন শার্রি মা মানা'তানা আল্লাহুম্মা তাওয়াফ্ফানা মুসলিমীনা ওয়া আলহিক্না বিস্সালিহীন, গায়রা খাযায়া ওয়ালা মাফ্তুনীন। রাব্বি ইয়াস্সির ওয়ালা তু'আস্সির রাব্বি আত্মিম্ বিল খায়র। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আঁইয়াত্ তাওওয়াফা বিহিমা ওয়া মান তাতাওওয়া খায়রান ফাইন্নাল্লাহা শা-কিরুন আলীম।"

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। হে আল্লাহ্! আমার মধ্যে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। আমার অন্তরে একে সুষমামন্ডিত কর। আমার অন্তর হতে কুফর, পাপাচার এবং গুনাহসমূহ দূর কর এবং আমাকে সুপথে পরিচালিত কর। হে পরওয়ারদিগার! আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর, মেহেরবাণী কর এবং সম্মানিত কর। আমাদের (গুনাহ্) সম্পর্কে যা তুমি জান, তা ক্ষমা

করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি তা জান, যা আমরা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্ মহা-পরাক্রমশালী মহা-সম্মানী। হে আল্লাহ! আমাদের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল, আমাদের আশা আকাঙ্খাকে তোমার দয়ায় পূর্ণ কর । তোমার সন্তুষ্টি লাভের পথকে সহজ করে দাও এবং কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৌন্দর্য দান কর। হে ডুবন্তকে উদ্ধারকারী! হে ধ্বংস এবং মৃত্যু হতে রক্ষাকারী! হে প্রতিটি গোপন কথা নিরীক্ষাকারী! হে ফরিয়াদকারীর শেষ আশ্রয়স্থল! হে অনাদি অনুগ্রহকারী! হে সর্বকালের মঙ্গলকারী! হে ঐ সত্তা–যাঁর দরজায় না যেয়ে কারো উপায় নেই। সমস্ত বস্তু তাঁরই নিকট হতে আসে। হে ঐ সত্তা–যাঁর উপর প্রতিটি প্রাণীর রিযিক নির্ভর করে। প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকটে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা দান করেছ এবং যা দান করনি, সকল কিছুর অশুভ হতে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে আল্লাহ্! আমাদিগকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান করে নেক বান্দাদের সাথে আমাদের মিলন করে দাও। হে আমার প্রতিপালক! আমার সমস্ত কর্মকে সহজ করে দাও এবং কিছুই কঠিন করো না। হে আমার প্রতিপালক! আমার কর্মকে সুসম্পন্ন করে দাও। নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনস্বরূপ, সুতরাং যে খানা-ই-কা'বার হজ্জ করে কিংবা উমরা করে, তার পক্ষে এই নিদর্শন দু'টির তাওয়াফ (সাঈ) করায় কোন দোষ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুরষ্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

সবুজ দুই পিলারদ্বয়ের মাঝে জোরে চলবেন এবং পড়বেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

"রাব্বিগ্ফির ওয়ারহাম্ আন্তাল্ আআ'য্যুল্ আক্রাম।"

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, তুমি মহা-পরাক্রমশালী, মহা-সম্মানী।

৭ম চক্করে মারওয়ায় পৌঁছে সাঈ পূর্ণ হল। এবার মনের আকুতিসহ নিজের মকসুদের জন্য দোয়া করুন। এরপর উমরা পালনকারী বা হজ্জে তামাত্তু পালনকারী মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করে ইহ্রাম হতে হালাল হয়ে যাবেন। কিন্তু ইফরাদ ও ক্বিরান পালনকারী তা না করে ইহরামের উপর কায়েম থাকবেন।

সাঈ'র আহকাম

সাঈ'র ফরয সমূহ ঃ

সাঈ'র ফরয ৮টি। যথা–

১। সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করাই সাঈ-র ফরয। যদি কেউ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ না করে এদিক ওদিক করে, তবে সাঈ সহীহ্ হবে না।

২। নিজেই সাঈ করা। অবশ্য কারো কাঁধে চড়ে (কোন পশুর উপর সাওয়ার হয়ে)

অথবা অন্য কোন বাহনে আরোহণ করে সাঈ করলেও শর্ত পূর্ণ হয়ে যাবে। সাঈ'র মধ্যে প্রতিনিধিত্ব জায়েয নেই। তবে কেউ যদি ইহরামের পূর্বে সংজ্ঞাহীন হয়ে যায় এবং সাঈ'র সময় পর্যন্ত সংজ্ঞা ফিরে না পায়, তাহলে তার পক্ষ হতে অপর কোন ব্যক্তি সাঈ করতে পারবে।

৩। পূর্ণ তাওয়াফ অথবা তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন করার পর সাঈ করা। যদি কেউ তাওয়াফের চার চক্কর পূর্ণ করার পূর্বে সাঈ করে তবে উক্ত সাঈ সহীহ্ হবে না।

৪। সাঈ'র চার চক্কর পূর্ণ করতে হবে।

৫। সাঈ'র পূর্বে হজ্জ অথবা উমরার ইহরাম বাঁধতে হবে। যদি কেউ ইহরামের পূর্বে সাঈ করে নেয়, তবে তা তাওয়াফের পরে হলেও সহীহ্ হবে না।

৬। সাঈ সাফা হতে আরম্ভ করে মারওয়াতে শেষ করতে হবে। যদি কেউ মারওয়া হতে আরম্ভ করে, তবে প্রথম চক্কর সাঈ হিসাবে গণ্য হবে না।

৭। সাঈ'র অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন করা। যদি কেউ অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন না করে তবে সাঈ আদায় হবে না।

৮। সাঈ'র নির্ধারিত সময়ে সাঈ সম্পন্ন করা। এটি হজ্জের সাঈ এর জন্য শর্ত; কিন্তু উমরার সাঈ এর জন্য শর্ত নয়। অবশ্য যদি হজ্জে কিরান বা তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তি উমরা পালন করে, তবে তার উমরার সাঈ এর জন্যও নির্ধারিত সময় হওয়া শর্ত। হজ্জের সাঈ এর সময় হচ্ছে হজ্জের মাস সমূহে আরম্ভ হওয়া।

সাঈ'র ওয়াজিব সমূহ ঃ

সাঈ'র ওয়াজিব ৬টি। যথা–

১। এমন তাওয়াফের পর "সাঈ" করা যা জানাবাত অথবা হায়িয ও নিফাস হতে পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

২। "সাঈ" সাফা হতে আরম্ভ করা এবং মারওয়াতে শেষ করা।

৩। যদি কোন ওযর না থাকে, তবে পায়ে হেঁটে সাঈ করা। বিনা ওযরে সাওয়ার অবস্থায় সাঈ করলে দম ওয়াজিব হবে।

৪। সাত চক্কর পূর্ণ করা। অর্থাৎ ফরয চার চক্করের পর আরো তিন চক্কর পূর্ণ করা। যদি কেউ এই তিন চক্কর ছেড়ে দেয়, তবে সাঈ সহীহ্ হবে, কিন্তু প্রতি চক্করের পরিবর্তে পৌঁনে দুই সের গম অথবা এর মূল্য সাদাকা করা ওয়াজিব।

৫। উমরার সাঈ এর ক্ষেত্রে উমরার ইহরাম সাঈ সমাপ্ত করা পর্যন্ত বহাল থাকা।

৬। সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করা।

সাঈ’র সুন্নাত সমূহ ঃ

সাঈ’র সুন্নাত ৯টি। যথা–

১। হাজরে আসওয়াদের ইস্তিলাম করে সাঈ এর উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে রেব হওয়া।

২। তাওয়াফের পর পরই সাঈ করা।

৩। সাফা ও মারওয়ার পাহাড়ের উপরে আরোহন করা।

৪। সাফা ও মারওয়ার উপরে আরোহন করে কিবলামুখী হওয়া।

৫। সাঈ এর চক্কর সমূহ পর পর সমাপন করা।

৬। জানাবত এবং হায়িয থেকে পবিত্র হওয়া।

৭। এমন তাওয়াফের পরে সাঈ করা যা পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কাপড়, শরীর ও তাওয়াফের জায়গাও পবিত্র ছিল আর ওযূও বহাল ছিল।

৮। সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত চলা (কেবল পুরুষের জন্য)।

৯। সতর ঢাকা।

সাঈ’র মুস্তাহাব সমূহ ঃ

সাঈ’র মুস্তাহাব ৫টি। যথা-

১। নিয়্যত করা।

২। সাফা ও মারওয়ার উপরে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা।

৩। বিনয় ও নম্রতা সহকারে তিন তিনবার করে যিকির ও দু’আ পাঠ করা।

৪। সাঈ এর চক্কর সমূহের মধ্যে যদি বিনা ওযরে বেশী ব্যবধান হয়ে যায় অথবা কোন চক্করে বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে নতুন করে সাঈ আরম্ভ করা।

৫। সাঈ সমাপ্ত করার পরে মসজিদে গিয়ে দুই রাকা’আত নফল নামায আদায় করা।

সাঈ’র মাকরূহ কাজ সমূহ ঃ

১। সাঈ এর অবস্থায় এমন ধরনের ক্রয়-বিক্রয় এবং কথা-বার্তা বলা, যার দরুন মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় এবং দু’আ কালাম করতে অসুবিধা হয় অথবা সাঈ এর চক্কর সমূহ লাগাতার সমাপন করা সম্ভব হয় না।

২। সাফা ও মারওয়া এর উপর আরোহণ না করা।

৩। বিনা ওযরে সাঈ’কে তাওয়াফ হতে অথবা কুরবানীর দিনসমূহ হতে বিলম্বিত করা।

৪। সতর খোলা অবস্থায় সাঈ করা।

৫। সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যখানে দ্রুত না চলা।

৬। চক্কর সমূহের মধ্যে অধিক ব্যবধান করা।

মাথা মুন্ডান

হলক ও কসর ঃ

হলক হচ্ছে মাথা মুন্ডানো এবং কসর হচ্ছে চুল ছাঁটা। হলক কেবল পুরুষের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। **মহিলাদের জন্য মাথা মুন্ডন করা হারাম।** চুল ছাটা নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই বৈধ। সম্পূর্ণ মাথার চুল এক আঙ্গুল পরিমাণ ছাঁটতে হয়। এক-চতুর্থাংশ চুল মুন্ডন করা বা ছাঁটা ওয়াজিব। সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডন করা মুস্তাহাব। হলক করাতে যেহেতু পূর্ণ বিনয় প্রকাশ পায় তাই 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, পুরুষের জন্য পূর্ণ মাথায় হলক করা উত্তম।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও মাথা মুন্ডায়েছেন। যারা মাথা মুন্ডিয়েছেন তাদের জন্য তিনবার দোয়া করেছিলেন। যারা মাথা না মুন্ডায়ে সমস্ত মাথার চুল ছেঁটে ছিলেন তাদের জন্য মাত্র একবার দোয়া করেছিলেন। অতএব, মাথা মুন্ডানই উত্তম।

মাসআলা ঃ

১। স্ত্রী লোকদের মাথা মুন্ডান বা পুরুষদের বাবরীর মত খাট করে ফেলান হারাম। ইহরাম খুলবার জন্য তাদের সমস্ত মাথার চুল একত্র করে অগ্রভাগ হতে মাত্র এক ইঞ্চি পরিমাণ কেঁটে ফেলতে হবে। স্ত্রী লোকের মাথার চুল নিজে বা অন্য কোন স্ত্রী লোক বা স্বামী সঙ্গে থাকলে তিনি কাঁটবেন। ভিন্ন পুরুষ দ্বারা মেয়েদের চুল কাঁটা জায়েজ নেই।

২। মিনাতে বসেই মাথা মুন্ডানো সুন্নত (হজ্জের সম্পর্কিত)।

৩। যদিও মাথা মুন্ডালেই ইহরাম খুলে যাবে, তথাপি মাথা মুন্ডানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যাবতীয় ক্ষৌর কাজও করা উচিত।

হলক ও কসরের পর নখ কাঁটবেন এবং বগল প্রভৃতির লোমও পরিষ্কার করবেন। যদি হলক অথবা কসরের পূর্বে নখ প্রভৃতি কাটেন, তাহলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। এইজন্য হলক অথবা কসরের পূর্বে নখ ইত্যাদি কাটা নিষিদ্ধ।

৪। ৮ই যিলহজ্জ তারিখে হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর ১০ই যিলহজ্জে জামারাতুল আকাবায় শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ ও কুরবানী আদায়ের পর মাথা মুন্ডন করে বা চুল ছেঁটে ইহরাম মুক্ত হওয়া বিধেয়। কুরবানী না দিয়ে হলক করা বা চুল ছাঁটা জায়েজ নেই। হলক করা বা চুল ছাঁটা ১২ তারিখ পর্যন্ত বিলম্বিত করাও জায়েজ। কুরবানী ও হলক বা কসর করে ইহরাম মুক্ত হলেও ১২ তারিখের মধ্যে তাওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত যৌন সম্ভোগ করা জায়েজ নাই। যদি কেউ ইহার বিপরীত করে, যেমন কোরবানীর পূর্বে মাথা মুন্ডালো বা রমীর আগে কোরবানী করল বা রমীর আগে মাথা মুন্ডালো, তবে দম দিতে হবে। মাথা মুন্ডানোর পর গোসল করে পাক-ছাফ হয়ে আচকান-পায়জামা, পিরহান, টুপি,

পাগড়ী, ইত্যাদি পোষাক পরিধান করে আতর খুশবু লাগিয়ে আল্লাহ্র ঘরের দিকে হজ্জের যে রোকন ফরজ তাওয়াফ, সেই তাওয়াফ করবার জন্য রওয়ানা হবেন।

৫। ক্ষৌর কার্যের জন্য শর্ত এই যে, উহা কোরবানীর দিবসসমূহ অর্থাৎ ১০ হতে ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত করতে হবে। চাই দিনে হউক অথবা রাত্রে। ক্ষৌর কার্য হরমের ভিতরে করানো জরুরী। যদি উপরোক্ত সময় ও স্থান ব্যতীত কেউ অন্য কোন সময় ও স্থানে ক্ষৌর কার্য করান, তাহলে হালাল হয়ে যাবে বটে, কিন্তু দম ওয়াজিব হবে।

৬। যদি মাথা মুন্ডাতে কোন ওযর থাকে যেমন– ক্ষুর না থাকে অথবা ক্ষৌরি করার কোন লোক না থাকে অথবা মাথায় যখম ইত্যাদি থাকে তাহলে চুল ছাঁটানোই ওয়াজিব। আর যদি ছাঁটাতে না পারেন যেমন– চুল খুব ছোট এবং মাথায় কোন যখমও নাই– তাহলে মাথা মুন্ডানোই ওয়াজিব।

৭। যদি কেউ মাথার চুল উঠিয়ে ফেলেন কিংবা চুনা অথবা লোমনাশক প্রভৃতি দ্বারা উঠিয়ে ফেলেন অথবা মারা-মারি করতে গিয়ে উঠে যায়,তবে তাই যথেষ্ট হবে। তা নিজ কর্ম-দোষে উঠুক অথবা অন্য কেউ উঠিয়ে ফেলুক।

৮। যদি কারোও মাথায় টাক থাকে অথবা তার মাথায় মোটেও চুল না থাকে, অথবা মাথায় যদি যখম থাকে, তবে এর উপরে শুধু ক্ষুর চালানোই ওয়াজিব। আর যদি যখমের জন্য ক্ষুর চালানোও সম্ভব না হয়, তবে তার উপর হতে এই ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে এবং ক্ষৌর কার্য ছাড়াই হালাল হয়ে যাবেন।

৯। হজ্জের ইহরামে ক্ষৌর কার্যের সময় ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিকের পর হতে শুরু হয় এবং ১২ই যিলহজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্ত বহাল থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে ক্ষৌর কার্য করানো ওয়াজিব।

১০। উমরার ইহরামে সাঈ-এর পরে ক্ষৌর কার্য করানো উচিত। যদিও ক্ষৌর কার্যের সময় তাওয়াফের চার চক্করের পর হতে আরম্ভ হয়ে যায়।

১১। ক্ষৌর কার্যের পরে ইহরামের কারণে যেসব কাজ নিষিদ্ধ ছিল, তা জায়েজ হয়ে যায়। যেমন– সুগন্ধি ব্যবহার করা, সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা, স্থলজ প্রাণী শিকার করা ইত্যাদি।

১২। ইহরাম ওয়ালা ব্যক্তি অন্য ইহরাম ওয়ালা ব্যক্তির মাথা মুন্ডাতে পারে না; কিন্তু যখন ইহরাম খোলার সময় আসে তখন পারে– তাতে গুনাহ্ নাই বা ইহরামের কোন ক্ষতি হবে না।

১৩। মাথা মুন্ডানোর নিয়ম এই যে, কেবলামুখী হয়ে বসবেন। আপনার ডান দিক হতে শুরু করতে বলবেন। হাজ্জামের ডান দিক নয়। হাজ্জাম বিসমিল্লাহ পড়ে, আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবে যেন তার অস্ত্রের দ্বারা কোন কষ্ট না হয়।

মাথা মুন্ডানোর দোয়া ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ وَاغْفِرْ لِىْ
ذُنُوْبِىْ اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِىْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَّامْحُ بِهَا عَنِّىْ سَيِّئَةً وَّارْفَعْ لِىْ بِهَا دَرَجَةً اَللّٰهُمَّ
اغْفِرْ لِىْ وَلِلْمُحَلِّقِيْنَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ - اٰمِيْنَ

"হে আল্লাহ! তুমি যে, আমাকে সৎবুদ্ধি দান করেছ এবং এই পবিত্র কাজ সমাধা করবার তৌফিক দান করে অতি বড় অনুগ্রহ করেছ, সে জন্য আমি তোমার শোকর আদায় করছি। হে আল্লাহ! আমার এই মাথা তোমার হাতে বিক্রয় করলাম। তুমি দয়া করে আমার এই আমলটুকু কবুল কর এবং আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই যে, আমার মাথার প্রত্যেকটি চুলের বদলে একটি নেকী দান কর, একটি গুনাহ মাফ করে দাও এবং একটি দর্জ্জা বুলন্দ করে দাও। হে আল্লাহ! হে অসীম দয়ার ভান্ডার আমার এবং যত লোক মাথা মুন্ডাচ্ছে তাদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দাও।"

১৪। হাজামত বানিয়ে চুল দাঁড়ি ইত্যাদি মাটির নিচে পুতে রাখা মোস্তাহাব। মাটির উপর ফেলে রাখলেও গুনাহ্ হবে না। গোসলখানায় বা পায়খানায় ফেলে রাখা মাকরূহ।

"মক্কা-মীনা-মুজদালিফা-আরাফাত"

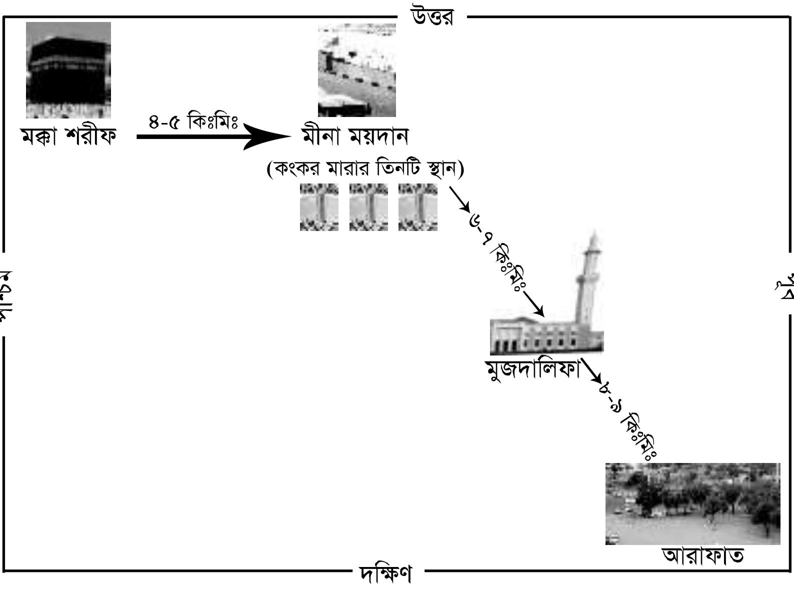

মীনা-আরাফাত-মুযদালিফা অবস্থানে সাথে নিবেন

নং	পুরুষ	মহিলা
০১	ওজিফা/হজ্জের কিতাব	ওজিফা/হজ্জের কিতাব
০২	প্রয়োজনীয় ঔষধ (৫ দিনের)	প্রয়োজনীয় ঔষধ (৫ দিনের)
০৩	ইহরামের কাপড়	প্রয়োজনীয় বোরকা, জামা-কাপড়
০৪	স্যান্ডেল, গামছা	স্যান্ডেল, গামছা
০৫	মেস্ওয়াক, পেষ্ট ও ব্রাশ	মেস্ওয়াক, পেষ্ট ও ব্রাশ
০৬	কলম, ঘড়ি, চশমা	কলম, ঘড়ি, চশমা
০৭	কোমর বেল্ট (টাকা-পয়সা সাবধানে রাখবেন)	টাকা-পয়সা সাবধানে রাখবেন
০৮	টয়লেট পেপার	টয়লেট পেপার
০৯	হালকা জায়নামায	হালকা জায়নামায
১০	পানি ও সামান্য শুকনা খাবার	পানি ও সামান্য শুকনা খাবার
১১	ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর পরিধেয় জামা-কাপড়	ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর পরিধেয় জামা-কাপড়
১২	এগুলো বহনের জন্য ছোট ব্যাগ। বোঝা হালাকা রাখবেন।	এগুলো বহনের জন্য ছোট ব্যাগ। বোঝা হালাকা রাখবেন।

“মিনায় অবস্থান”

মক্কা মুয়াজ্জামা হতে তিন মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত এলাকাটি হলো মিনা। এখানেই হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে কুরবানী করার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। হযরত ইসমাঈল (আঃ) শয়তানের কু-মন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য ৩ বার কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। এ কারণেই হাজী সাহেবগণ এখানে কুরবানী ও কংকর নিক্ষেপ করে থাকেন। এটা হরমের অন্তর্ভূক্ত।

হাজী সাহেবগণ ৮ই যিলহজ্জ সূর্য্যোদয়ের পরে মক্কা শরীফ হতে মিনা অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং রাত্রে মিনায় অবস্থান করবেন। যোহর, আসর, মাগরেব, এশা ও ৯ই যিলহজ্জ ফজর নামায এখানে পড়া মুস্তাহাব। মিনায় অবস্থান কালে তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকবেন। মসজিদে খায়েফের সন্নিকটে অবস্থান করা মুস্তাহাব। শুধু অবস্থান ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াই সুন্নত।

৯ই যিলহজ্জ সকাল বেলা সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর মিনা থেকে আরাফায় যাবেন। অকুফে আরাফা সমাধা করে মোযদালিফায় যাবেন ও ৯ই যিলহজ্জ রাত্রে মোযদালিফায় অকুফ করবেন। ১০ই যিলহজ্জ সকাল বেলা মোযদালিফা হতে মিনায় পৌঁছবেন। রামি সমাপ্ত করে কুরবানী করবেন। তারপর মক্কা শরীফ যাবেন তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য।

১০ই যিলহজ্জ তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করে পুনরায় মক্কা মুকাররমা হতে মিনায় ফিরে আসবেন। যোহরের নামায মিনায় এসে পড়া সুন্নত। কেউ কেউ বলেন, মক্কা মুকাররামায় মসজিদে হারামেই পড়া সুন্নত। মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) মসজিদে হারামে যোহরের নামায পড়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। রাত্রে মিনায় অবস্থান করা সুন্নত। মিনা ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় রাত্রি যাপন করা মাকরূহ। চাই মক্কা মুকাররামায়ই হোক অথবা রাস্তায়। এমনিভাবে রাত্রির অধিকাংশ সময় অপর কোন স্থানে অতিবাহিত করাও মাকরূহ। কিন্তু এমন করে ফেললে কোন দম প্রভৃতি ওয়াজিব হবে না। ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত রাত্রিগুলো মিনায় অবস্থান করা সুন্নত।

মাসআলা ঃ

মিনায় মসজিদে খায়েফে জামাআতে নামায পড়ার চেষ্টা করবেন এবং মসজিদের মাঝখানে যে গম্বুজটি রয়েছে এর মেহরাবে বিশেষভাবে নামায আদায় করবেন। ইহা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামায পড়ার জায়গা।

"আরাফাতে অবস্থান"

আরাফাতের বর্ণনা ঃ

হজ্জের আরেকটি ফরজ হচ্ছে ৯ই যিলহজ্জ তারিখে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওই দিন যোহর ও আছর নামায একসাথে মিলিয়ে পড়েছিলেন, এখানেই মসজিদুন নামিরা অবস্থিত। আরাফাহ্ ময়দান মক্কার কা'বা ঘর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। আল্লাহ্ বেহেশত থেকে হযরত আদম (আঃ)-কে সিংহল ও হযরত হাওয়া (আঃ)-কে জেদ্দায় নামিয়ে দেন। প্রায় ৩০০ বছর বিচ্ছিন্ন থাকার পর আরাফাহর ময়দানে তারা একত্রিত হন।

৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা হতে মসজিদে খায়েফ সংলগ্ন "যাব" পাহাড়ের পথে আরাফা অভিমুখে রওনা হবেন। এটা মুস্তাহাব। ৯ই যিলহজ্জের পূর্বে আরাফাতে গমন অথবা ঐদিন মিনা থেকে সুবহে সাদিকের পূর্বে রওনা করা সুন্নতের খেলাফ। তালবিয়া, যিকির, দো'আ-দরূদ পড়তে পড়তে বিনয়ের সাথে আরাফাতের দিকে গমন করবেন। জাবালে রহমত দৃষ্টিগোচর হলে নিম্নের দো'আটি পড়া মুস্তাহাব।

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَوَجْهَكَ اَرَدْتُّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ وَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَوَجِّهْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ تَوَجَّهْتُ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ

“আল্লাহুম্মা ইলাইকা তাওয়াজ্জাহ্তু ওয়াআলাইকা তাওয়াক্কাল্তু ওয়াওয়াজ্হাকা আরাত্তু। আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী ওয়াতুব আলাইয়্যা ওয়াআ’তিনী সু’লী ওয়াওয়াজ্জিহ্ লিয়াল্ খাইরা হাইছু তাওয়াজ্জাহ্তু সুবহানাল্লাহি ওয়াল্হাম্দু লিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বার্।

আরাফাত সম্পর্কীয় মাসআলা ঃ

১। আরাফাতের ময়দানে যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করা যায় এবং লোকজনের সহিত একত্রে অবস্থান করতে হয়। লোকজন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী কোন জায়গায় অবস্থান করা অথবা রাস্তায় কোথাও অবস্থান করা মাকরূহ। তবে, জাবালে রহমতের কাছে অবস্থান করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

২। আরাফাতের ময়দান সবটাই মওকাফ তথা অবস্থানের জায়গা। এখানে যে কোনখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারবেন। কিন্তু ‘বাতনে আরানা’ নামক স্থানে অবস্থান করা জায়েয নহে।

৩। সূর্য হেলে পড়ার পর কিছু সময় মসজিদে নামিরার নিকটে অবস্থান করার পর যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করে জাবালে রহমতের নিকটে গিয়ে অকুফ করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

৪। আরাফাতের ময়দানে পৌঁছে তালবিয়াহ, দো’আ ও দরূদ প্রভৃতি অধিক পরিমাণে পাঠ করতে থাকবেন। সূর্য হেলে পড়ার পর ওযূ করবেন। তবে গোসল করা উত্তম। সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ফেলবেন এবং অত্যন্ত শান্ত মনে নিজ খালিক ও মালিকের প্রতি মনোযোগী হবেন এবং সূর্য হেলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা তারও আগে মসজিদে নামিরায় পৌঁছে যাবেন। ইমামের খুৎবা শুনবেন এবং যোহরের ওয়াক্তেই এক আযান ও দুই একামাতের সাথে জামাতে যোহর ও আসরের নামায আদায় করবেন। দু’ওয়াক্তের ফরয আদায়ের পর সুন্নত ও নফল পড়বেন।

৫। জাবালে রহমতের নিকটে সামান্য উপরের দিকে যে জায়গায় বড় বড় কালো পাথর বিছানো রয়েছে, সেখানে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবস্থান করেছিলেন। যদি সহজভাবে সম্ভব হয় তাহলে সেখানে দাঁড়ানো উত্তম।

৬। আরাফাতে অবস্থানের সময় দাঁড়িয়ে থাকা মুস্তাহাব মাত্র, শর্ত অথবা ওয়াজিব নয়। বসে, শুয়ে, জেগে, ঘুমিয়ে যেভাবে ইচ্ছা অবস্থান করা জায়েয।

৭। এখানে অকুফের তথা অবস্থানের সময় হাত তুলে হামদ ও সানা, দো'আ-দরূদ, যিকর, তালবিয়াহ্ পাঠ করা মুস্তাহাব। খুব কাকুতি-মিনতি করে দো'আ করবেন। নিজের জন্য, নিজের আত্মীয়-স্বজন, লেখক, প্রকাশক, তাদের সকল পরিজন এবং সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য দো'আ করবেন। দো'আ কবুল হওয়ার পূর্ণ আশা পোষণ করবেন। দো'আ-দরূদ, তাকবীর-তাহলীল ইত্যাদি তিন তিন বার করে পাঠ করবেন। দো'আর শুরুতে এবং শেষে তাসবীহ্, তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীর ও দরূদ পাঠ করবেন।

৮। নামাযের পর হতে অকুফ শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো'আ প্রভৃতিতে মগ্ন থাকবেন এবং দো'আর মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ পর পর তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন।

৯। যদি ইমামের সাথে দাঁড়ালে ভীড় ও হট্টগোলের কারণে নিবিষ্ঠতা ও একাগ্রতা বজায় না থাকে এবং একাকী থাকলে একাগ্রতা হাসিল হয়, তাহলে একাকী দাঁড়িয়ে থাকাই উত্তম।

১০। মহিলাদের জন্য পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা এবং তাদের মধ্যে মিশে যাওয়া নিষিদ্ধ।

১১। অকুফে আরাফার সময় যতবেশী সম্ভব যিকর ও দো'আ পাঠ করায় ত্রুটি করবেন না। এই দুর্লভ মুহূর্ত বার বার নসীব হওয়া মুশকিল। এই সময়ের জন্য কোন বিশেষ দো'আ নির্দিষ্ট নেই। তবে নিম্নোক্ত দো'আটি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত রয়েছে–

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم
لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
وإليك مآبي ولك رب تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر
وشتات الأمر اللهم إني أسئلك من خير ما تجيء به الريح وأعوذ بك من شر ما تجيء
به الريح اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا - اللهم اشرح
لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وساوس في الصدر وشتات الأمر
وعذاب القبر

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা–শরীকা লাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল্ হাম্দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্দু কাল্লাযী তাকূলু ওয়াখাইরাম্ মিম্মা নাকূলু। আল্লাহুম্মা লাকা সালাতী ওয়ানুসুকী ওয়ামাহ্ইয়ায়া ওয়ামামাতী ওয়াইলাইকা মাআবী ওয়ালাকা রাব্বী তুরাসী। আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন্ আযাবিল্ ক্বাবরি ওয়াওয়াস্ওয়াসাতিস্ সাদ্রি ওয়াশাতাতিল্ আম্রি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন্ খাইরি মা তাজীউ বিহির্ রীহু ওয়াআঊযু বিকা মিন্ শাররি মা তাজীউ বিহির্ রীহু। আল্লাহুম্মাজ্আল্ ফী ক্বাল্বী নূরান্ ওয়াফী সাম্য়ী নূরান্ ওয়াফী

বাছারী নূরান্ আল্লাহুম্মাশ্‌রাহ্‌লী সাদ্‌রী ওয়াইয়াস্‌সিরলী আম্‌রী ওয়াআঊযু বিকা মিন্ ওয়াসাভিসিন্ ফিস্ সাদ্‌রি ওয়াশাতাতিল্ আম্‌রি ওয়াআযাবিল্ ক্বাবরি।”

এক রেওয়ায়তে আছে, যখন একজন মুসলমান আরাফাতের দিবসে সূর্য হেলে পড়ার পর অবস্থান করার নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করে এবং কেবলামুখী হয়ে ১০০ বার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদির” পাঠ করে, তারপর ১০০ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ “ক্বুল্ হু-ওয়াল্লাহু আহাদ্” এবং তারপর ১০০ বার

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّعَلَيْنَا مَعَهُمْ

“আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়ালা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজিদ্ ওয়া আলাইনা মায়াহুম” পাঠ করবেন। আপনার এ পাঠের পুরস্কার প্রদানে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা’আলা বলেন– “হে আমার ফেরেশতাগণ! আমার এই বান্দার কি প্রতিদান হতে পারে, যে আমার তাসবীহ, তাহলীল ও তামজীদ বর্ণনা করেছে, আমার হামদ ও সানা পাঠ করেছে এবং আমার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরূদ প্রেরণ করেছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তার নিজের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করলাম। আর আমার বান্দা যদি সমগ্র মওকাফবাসীর জন্যও সুপারিশ করে, তাহলেও আমি তা কবুল করব।” এই দো’আ ছাড়া আরো যে দো’আ ইচ্ছা প্রার্থনা করবেন। আরাফাতের ময়দানে এই কিতাবের লেখক, প্রকাশক, সাহায্যকারীগণ এবং তাদের সন্তানাদির জন্যও মাগফেরাতের দো’আ করতে অনুরোধ রইল।

“আরাফাতে অকুফের (অবস্থানের) আহ্‌কাম”

অকুফের শর্ত (ফরয) সমূহ ঃ

অকুফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে–

১। মুসলমান হওয়া। কাফেরের অকুফ শুদ্ধ হবে না।

২। বিশুদ্ধ হজ্জের ইহরাম হওয়া। যদি কেউ উমরার ইহরাম বেঁধে অথবা হজ্জে ফাসেদের ইহরাম বেঁধে অথবা বিনা ইহরামে অকুফ করেন, তাহলে তা শুদ্ধ হবে না।

৩। অকুফের স্থান অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানের সীমানার ভিতরে অকুফ হওয়া। যদি কেউ আরাফাত এর বাহিরে অকুফ করেন, তাহলে যদি উহা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয় তবুও অকুফ শুদ্ধ হবে না।

৪। অকুফের সময় হওয়া অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ সূর্য হেলে পড়ার সময় হতে ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক পর্যন্ত যে কোন সময় অকুফ করা।

অকুফের রুকন (ফরয) ঃ

"অকুফ" আরাফাতের ময়দানে হতে হবে– ইহাই অকুফের রুকন। এই "অকুফ" যদি এক মুহুর্তের জন্যও হয় এবং যে কোনভাবেই হয়- নিয়্যত থাকুক বা না থাকুক, আরাফাতের ইল্‌ম থাকুক বা না থাকুক, জাগ্রত হউক বা নিদ্রিত, সজ্ঞান হউক অথবা অজ্ঞান, স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায়, বসা অথবা দাঁড়িয়ে আরাফাতের ময়দান অতিক্রম করে গেলে সর্বাবস্থায় "অকুফ" হয়ে যাবে। **যদি কেউ অকুফের নির্ধারিত সময়ে এক মুহুর্তের জন্যও আরাফাতের ময়দানে প্রবেশ না করেন, তার অকুফ হবে না অর্থাৎ তার হজ্জই হবে না।**

মাসআলা ঃ

১। অকুফের জন্য হায়েয-নেফাস ও জানাবত হতে পবিত্র হওয়া শর্ত নহে।

২। ৯ই যিলহজ্জ সূর্য হেলে পড়ার সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ওয়াজিব। যদি কেউ সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের সীমানা হতে বাইরে চলে যান, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই ফিরে আসেন, তাহলে দম দিতে হবে না।

অকুফের সুন্নত সমূহ ঃ

অকুফের সুন্নত সমূহ নিম্নে বর্ণিত হল–

১। অকুফের জন্য গোসল করা।

২। সূর্য হেলে পড়ার পর ইমাম কর্তৃক যোহর ও আসর এই দুই নামাযের পূর্বে দুইটি খোৎবা প্রদান করা।

৩। যোহর ও আসর এই দুই নামায একত্রিত করা।

৪। নামাযের পর সঙ্গে সঙ্গে "অকুফ" করা।

৫। আরাফাতের ময়দান হতে ইমামের সাথে রওয়ানা হওয়া।

যদি কেউ ভিড়ের ভয়ে সূর্যাস্তের পরে ইমামের পূর্বেই রওয়ানা হয়ে যান, তাহলে কোন দোষ হবে না। এমনিভাবে যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই রওয়ানা হয়ে যান কিন্তু সূর্যাস্তের পর আরাফাতের সীমানা হতে বের হন তাহলেও কোন অসুবিধা নেই।

৬। আরাফাতে মাগরিবের নামায আদায় করা যাবে না, যদিও আরাফাতের সীমানায় থাকাকালীন সময়ে মাগরিবের ওয়াক্ত পার হয়ে যায়।

অকুফের মুস্তাহাব সমূহ ঃ

অকুফের মুস্তাহাব সমূহ নিম্নরূপ–

১। বেশী বেশী করে তালবিয়াহ্, তাকবীর, তাহলীল, দো'আ, ইস্তিগফার, কোরআন শরীফ ও দরূদ শরীফ প্রভৃতি পাঠ করা।

২। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসালাল্লাম) এর দাঁড়ানোর জায়গায় দাঁড়ানো।

৩। একাগ্রতা এবং বিনয় ও নম্রতা বজায় রাখা।

৪। ইমামের পিছনে এবং নিকটে দাঁড়ানো।

৫। কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো।

৬। সওয়ার হয়ে অকুফ করা।

৭। সূর্য হেলে পড়ার পূর্ব হতে অকুফের জন্য প্রস্তুত হতে থাকা।

৮। অকুফের নিয়্যত করা।

৯। দো'আর জন্য হাত উঠানো।

১০। তিন-তিনবার করে দো'আ পাঠ করা।

১১। হামদ ও দরূদের সাথে দো'আ শুরু করা।

১২। হামদ ও দরূদের সাথে দো'আ সমাপ্ত করা।

১৩। পবিত্র অবস্থায় থাকা।

১৪। যিনি রোযা রাখতে সক্ষম তার জন্য রোযা রাখা এবং যিনি অপারগ তার জন্য রোযা না রাখা। কেউ কেউ রোযা থাকাকে মাকরূহ বলেছেন। কেননা, রোযার কারণে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে এবং হজ্জের আহকাম ঠিকমত আদায় করতে সক্ষম হবে না। এজন্য রোযা না থাকাই উত্তম।

১৫। রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকা। তবে যদি ওযর থাকে, তাহলে ছাঁয়ায় দাঁড়াতে পারবেন।

১৬। ঝগড়া-বিবাদ না করা।

১৭। ভাল কাজ করা। যেমন– সাদকা ইত্যাদি প্রদান করা।

অকুফের মাকরূহ কাজসমূহ ঃ

অকুফের মাকরূহ কাজ সমূহ নিম্নরূপ–

১। যোহর ও আসরের নামায একত্রিত করার পর "অকুফ" করতে বিলম্ব করা।

২। রাস্তায় অবস্থান করা।

৩। অকুফের সময় বিনা ওযরে শয়ন করা।

৪। সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে খোৎবা পাঠ করা।

৫। উদাসীনতার সহিত "অকুফ" করা।

৬। সূর্যাস্তের পর আরাফাত হতে রওয়ানা করতে বিলম্ব করা।

৭। সূর্যাস্তের পূর্বে রওয়ানা হয়ে যাওয়া।

৮। মাগরেব অথবা এশার নামায আরাফাতের ময়দানে অথবা রাস্তায় পড়া।

৯। এত দ্রুত চলা যদ্দরুন অন্য লোকদের কষ্ট হতে পারে। ইদানিংকালে অধিকাংশ লোকই এভাবে চলে। এতে প্রায়শঃ লোকজনের কষ্ট হয়ে থাকে, অনেকে ব্যথা পায় কিংবা যখমীও হয়। এমন করা হারাম।

[যদি জুমু'আর দিন অকুফে আরাফা (হজ্জ) অনুষ্ঠিত হয়, তবে এর ফযীলত অন্যান্য দিনের অকুফের তুলানায় ৭০ গুণ বেশী।]

মাসের দিন-তারিখ তাহ্কীক করবার জন্য সউদী সরকার নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। তারাই হজ্জের দিন-তারিখ ঘোষণা করে থাকেন। সুতরাং হাজী সাহেবরা নিশ্চিন্ত মনে এবাদত বন্দেগীতে মগ্ন থাকতে পারেন।

আরাফাতের ময়দান হতে মুযদালিফা হয়ে মীনায় গমন

মাসআলা ঃ

১। ৯ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর অত্যান্ত ধীরে-সুস্থে এবং গাম্ভীর্য সহকারে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত পথে মুযদালিফায় পৌঁছা মুস্তাহাব। যদি কেউ অন্য কোন পথে গমন করেন, তবে তাও জায়েয। কিন্তু তা উত্তম পন্থার পরিপন্থী। মুযদালিফা হচ্ছে মিনা এবং আরাফাতের মধ্যবর্তী একটি ময়দান। ইহার দূরত্ব যেমন মিনা হতে তিন মাইল, আরাফাত হতেও তিন মাইল।

২। যদি রাস্তা প্রশস্ত হয় এবং কোন ভিড় না থাকে আর কারও কোন কষ্ট হবে না বলে মনে হয়, তাহলে কিছুটা দ্রুত গতিতে চলবেন। নতুবা খুব সাবধানে চলতে হবে। মনে রাখবেন, কাউকেও কষ্ট দেয়া জায়েয নেই।

৩। ১০ই যিলহজ্জ ফযর নামাজের পর মীনায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

"মুযদালিফায় অবস্থান"

মুযদালিফার বর্ণনা ঃ

মিনা এবং আরাফাতের মধ্যবর্তী একটি ময়দান হলো মুযদালিফা। এর দূরত্ব মিনা হতে তিন মাইল, আরাফাত হতেও তিন মাইল আর কা'বা শরীফ থেকে প্রায় ৬ মাইল পূর্বে। সূর্যাস্তের পর দু-পাহাড়ের মধ্যস্থিত পথে মুযদালিফায় পৌঁছাবেন। এই পথ থেকে আসা মুস্তাহাব। চলার সময় বেশী বেশী তালবিয়াহ্ তাকবীর, তাহলীল, দোয়া-দরূদ পাঠ করবেন। নিকটে এসে গোসল করে পদব্রজে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। মুযদালিয়ায় পৌঁছে মাগরেব ও এশার নামায একত্রে পড়বেন। নামায সমাপ্ত করে সুবহে সাদিক পর্যন্ত অবস্থান করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর মুযদালেফায় মুক্ত আকাশের নীচে ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত, **১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অকুফ করা ওয়াজিব।** যদিও ক্ষণিকের জন্য হয়। কেউ কেবল সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত বা কেবল সূর্যোদয়ের পরে অকুফ করলে তা শুদ্ধ হবে না। তার উপর দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য যদি অসুস্থতা, দুর্বলতা বা কোন ওযরের কারণে হয় তবে দম ওয়াযিব হবে না। যদি কেহ পথ চলতে গিয়ে ঐ সময়ের মধ্যে মুযদালিফার উপর দিয়ে অতিক্রম করেন, তাহলেও তার অকুফ হয়ে যাবে। চাই ঘুমন্ত, জাগ্রত, বে-হুঁশ অথবা যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন– মুযদালিফার ইলম থাকুক বা না থাকুক– অকুফে অরাফার মতই সর্বাবস্থায় অকুফ শুদ্ধ হয়ে যাবে। ভীড়ের কারণে কোন

মহিলা অকুফ না করলে দম ওয়াজিব হবে। মুযদালিফায় সর্বত্র অকুফ করতে পারেন; কিন্তু ওয়াদিয়ে 'মুহামমার' নামক ময়দানে অকুফ করবেন না।

মুযদালিফা সম্পর্কীয় মাসআলা ঃ

১।এই অকুফের সময়ও দরূদ শরীফ, তাকবীর, তাহ্লীল, ইস্তিগফার, তালবিয়াহ, যিক্র প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাঠ করবেন এবং যেভাবে দো'আর মধ্যে হাত উঠানো হয় সেভাবে হাত উঠাবেন।

২। সূর্যোদয়ের পর দুই রাকাআত নামায আদায় করে পরিমিত সময় বাকী থাকতে অত্যন্ত শান্ত ও গাম্ভীর্যের সাথে মিনা অভিমুখে যাত্রা করবেন। তালবিয়াহ্ এবং যিক্র পড়তে পড়তে পথ চলবেন।

৩। মুযদালিফা হতে 'রমী'র কংকর সংগ্রহ করতে হবে।

মুসাফিরের নামায

মাসআলা ঃ

১। শরীয়তের দৃষ্টিতে যে মুসলমান ৪৮ মাইল দূরের সফরের নিয়ত করে নিজ বাড়ী হতে বের হবেন তাকে মুসাফির বলা হয়। তার জন্য যোহর, আসর ও এশার ফরয নামায চার রাকাআতের পরিবর্তে দুই রাকাআত পড়া ফরয। ফজর, মাগরেব ও বিতর নামাজের কোন কসর নাই। বাড়ীর মত সফরের অবস্থায়ও এটা পূর্ণ পড়তে হবে।

হুঁশিয়ারি ঃ অনেক হাজী ভাই অজ্ঞতার কারণে ইমামের পিছনেও চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজে দুই রাকাআতের মাথায় সালাম ফিরিয়ে নেয়। এটা ঠিক নয়। মনে রাখবেন, যে ইমাম সাহেব চার রাকাআত পড়াবেন, তার পিছনে চার রাকাআতই পড়তে হবে।

২। মুসাফির অবস্থায় যোহর, আসর ও এশার ফরয নামায পুরা চার রাকাআত পড়া গুনাহ্, তবে যদি ভুলক্রমে পুরা পড়ে ফেলেন এবং প্রথম দুই রাকাআতের পর প্রথম বৈঠক করে থাকেন, তা হলে দুই রাকাআত ফরয এবং দুই রাকাআত নফল হয়ে যাবে; কিন্তু সিজ্দায়ে সাহো দিতে হবে।

সফরে সুন্নাত নামায

১। সফরের অবস্থায় সুন্নাত নামাযের হুকুম এই যে, যদি খুব তাড়াহুড়া ও ব্যস্ততা থাকে, তা হলে ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য সুন্নাত ছেড়ে দিলে কোন দোষ হবে না। এমতাবস্থায় ঐ সুন্নাতসমূহের কোন তাকীদও অবশিষ্ট থাকে না। যদি কোন তাড়াহুড়া বা ব্যস্ততা না থাকে, তা হলে কোন সুন্নাতই বাদ দেবেন না। সুন্নাত নামাযে কসর নেই।

মক্কা মুয়াজ্জামা, আরাফাত ও মুযদালিফায় নামায

মক্কা শরীফে নামায ঃ

যে মুসাফির ব্যক্তি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে এমন সময় মক্কা শরীফ আগমন করেন যে সফরের সময় হতে ৮ই যিলহজ্জ পর্যন্ত ১৫দিন পূর্ণ হয় না, তখন তিনি মুসাফিরই থেকে যাবেন। তখন ফরয নামায একা পড়ুন বা মুসাফির ইমামের সাথে পড়ুন, কসরই পড়বেন। আর ইমাম মুকিম হলে ইমামের অনুসরণে পূর্ণ নামায পড়বেন। ৮ই ও ৯ই যিলহজ্জ মিনা ও আরাফাতে গমনের জন্য পূর্বের দিনগুলোর সাথে গণনায় যুক্ত হবে না। আর যদি ৮ই যিলহজ্জের পূর্বে ১৫দিন অবস্থানের সময় হয় তবে তিনি মুকীম, পূর্ণ নামায পড়বেন।

আরাফাত ও মুযদালিফায় নামায ঃ

শুক্রবার জুম'আর দিন অকুফে আরাফা (হজ্জ) অনুষ্ঠিত হলে, উহার ফজীলত ৭০ গুণ বেশী। আরাফাতের ময়দানে জুম'আর নামায জায়েজ নয়।

৯ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরেরর পূর্বে আরাফাতের ময়দানে পৌঁছে ওযু গোসল ও খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মসজিদে নামেরায় যাবেন। সেখানে পৌঁছে নামায, তেলাওয়াত, দোয়া-দরূদ পড়তে থাকবেন। সূর্য হেলে যাওয়া মাত্রই স্বয়ং বাদশাহ্ বা তার প্রতিনিধি নামাযে আসেন। তিনি মিম্বারে বসলে আযান হবে, ইমাম দাঁড়িয়ে দুটি খুৎবা দিবেন। এরপর মোয়াজ্জেন একামত বলবেন। একামত শেষ হওয়ার পর ইমাম ছাহেব প্রথমে জোহরের নামাজ পড়বেন। ইমাম যদি মালেকী বা হাম্বলী মাজহাবের হন, তবে তিনি মুকীম হওয়া সত্ত্বেও হজ্জের দিনে কছর করবেন। ইমাম যদি শাফেয়ী বা হানাফী মাজহাবের হন, তবে মুকীম হলে চার রাকাত, মোছাফির হলে দুই রাকাত পড়বেন। হানাফী বা শাফেয়ী মোক্তাদিগণ যদি মোছাফির হন, ইমাম কছর করলে তাঁরাও কছর করবেন, আর মোক্তাদিগণ যদি মুকীম হন তবে ইমাম বাম দিকে ছালাম ফিরানোর পর তাঁরা উঠে বাকী দুই রাকাত পড়বেন।

জোহরের ছালাম ফিরানোর পর তকবীরে তশরীক এবং তালবিয়া পড়া মাত্র আছরের জামাতের জন্য একামত বলবেন এং আছরের নামায শুরু করা হবে। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম এই দিন এই জায়গায় জোহরের কোন সুন্নতই পড়েননি। আছরের ছালাম ফিরিয়ে তকবীরে তশরীক এবং তালবিয়া পাঠ করতঃ মোনাজাত করে শীঘ্র জাবলে রহমতের নিকটবর্তী কোন স্থানে গিয়ে অকুফে আরাফা করবেন।

যোহর ও আসরের নামায একত্রীকরণের শর্তসমূহ ঃ

মাসআলা ঃ যোহর ও আসরের নামাযকে একত্রিত করে যোহরের ওয়াক্তে পড়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যথা–

১। আরাফাতের ময়দানে অথবা এর কাছাকাছি অবস্থান করা।

২। যিলহজ্জের ৯ তারিখ হওয়া।

৩। হারামাইন শরীফাইনের ইমাম অথবা তার প্রতিনিধি হওয়া।

৪। উভয় নামাযে হজ্জের ইহরাম হওয়া।

৫। যোহরের নামায আসরের পূর্বে পড়া।

৬। জামাআত মসজিদে নামেরাতে হওয়া।

যদি উপরোক্ত শর্তসমূহ হতে কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকে, তাহলে উভয় নামায একত্রিত করা জায়েয হবে না; বরং প্রতিটি নামাযকে এর নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করা ওয়াজিব হবে।

হাজীগণ সাধারণতঃ নিজ নিজ মোয়াল্লেমের তাবুতে অবস্থান করে থাকেন। তখন তাবুতেই নিজেরা নিজেরা জোহরের ওয়াক্তে জোহরের নামায এবং আছরের ওয়াক্তে আছরের নামায জামাত করে পড়বেন। কোরআন তেলাওয়াত, অজিফা পাঠ, দরূদ, এস্তেগফার, দোয়া, মোনাজাত, মোরাকাবা, মোশাহাদা ইত্যাদি এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকবেন।

মুযদালিফায় মাগরেব ও এশার নামায একত্রিত করা ঃ

আরাফার ময়দানে মাগরেবের নামাজের সময় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তথায় বা পথে মাগরেবের নামাজ না পড়ে তালবিয়া পড়তে পড়তে মোজদালিফার দিকে চলবেন, সেখানে এশার ওয়াক্ত হলে মাগরেব ও এশা এক সঙ্গে পড়বেন। মোটরে গিয়ে যদি মাগরেবের সময় থাকতেই পৌঁছেন তবুও মাগরেবের সময় মাগরেব পড়বেন না। এশার ওয়াক্ত হলে তারপর মাগরেব ও এশা একত্রে পড়বেন। পথে খবরদার! ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি বা শোর হাঙ্গামা করবেন না। উচ্চঃস্বরে তালবিয়া, তকবীর এবং তাহলিল, দোয়া, কালাম, দরূদ ও এস্তেগফার পড়তে পড়তে শান্তির সঙ্গে যাবেন। ঐদিন হারিয়ে যাবার খুব ভয়। খবরদার! কাফেলা ছেড়ে কোথাও যাবেন না। কাফেলার মধ্যে যারা সবল, তারা দুর্বলের প্রতি খাছ করে দৃষ্টি রাখবেন।

মোজদালেফায় পৌঁছা মাত্রই সর্বপ্রথম মসজিদে অথবা মসজিদের আশেপাশে নিকটবর্তী কোনস্থানে জামাত করে আজান ও একামত বলে প্রথম মাগরেবের তিন রাকাত ফরজ পড়বেন। তারপর মাগরেবের সুন্নত না পড়ে শুধু তকবীরে তাশরীক এবং তলবিয়া পড়ে **বিনা আজানে বিনা একামতে এশার ফরজ পড়বেন।** মোছাফের হলে দুই রাকাত এবং মুকিম হলে চার রাকাত পড়ে ছালাম ফিরাবেন পরে তকবীর, তশরীক এবং তালবিয়া পড়বেন। মাগরেব ও এশার সুন্নত এশার ফরজের পর পড়বেন। বেতের ঐ সময়ে পড়লে সুন্নতের পর বেতের পড়বেন। নতুবা শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস থাকলে, তাহাজ্জুদের পর পড়বেন। এই রাতও এবাদতের একটি রাত। মোজদালেফাও দোয়া কবুল হওয়ার একটি প্রধান জায়গা। প্রথম রাত্রে ঘুমিয়ে শেষ রাত্রে উঠে এবাদত করবেন। নামায পড়বেন, দোয়া চাইবেন। তওবা এস্তেগফার

করবেন, দরূদ পড়বেন, অশ্রু বর্ষণ করবেন, আল্লাহ্র কাছে কান্না-কাটি করবেন। এই স্থানেও রাত্রে হারিয়ে যাবার ভয় আছে, সাবধান থাকবেন।

মাসআলা ঃ

হাজীদের জন্য আরাফার দিন মসজিদে নামেরায় বাদশার সঙ্গে জোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়া ওয়াজেব নয়, মোস্তাহাব (শর্তের সঙ্গে)। কাজেই যদি কেউ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও জোহর আসর একত্রে না পড়ে জোহরের ওয়াক্তে জোহর এবং আসরের ওয়াক্তে আসর পড়ে, তবে তার নামায হয়ে যাবে। কিন্তু **মোজদালেফায় এশার ওয়াক্তে মাগরেব এবং এশা একত্রে পড়া ওয়াজেব**। অতএব, যদি কেউ পথে বা মাগরেবের ওয়াক্তে মাগরেব পড়ে নেয় তবে তার নামায হবে না। মোজদালেফায় এশার ওয়াক্তে উভয় নামায এক সঙ্গে পড়তে হবে।

মাগরেব ও এশা দুই নামাযকে একত্রে পড়ার শর্ত ৬টি। যথা–

১। হজ্জের ইহ্রাম হওয়া।

২। অকুফে আরাফা প্রথমে সংঘটিত হওয়া।

৩। ১০ই যিলহজ্জের রাত্রি হওয়া। ১০ই যিলহজ্জের ফজর পর্যন্ত একত্রিত করতে পারবেন।

৪। একত্রীকরণ মুযদালিফায় সংঘটিত হওয়া। মুযদালিফায় পৌঁছার আগে অথবা মুযদালিফা হতে বের হয়ে যাওয়ার পর একত্রিত করা জায়েয হবে না।

৫। এশার ওয়াক্ত হওয়া। যদি কেউ এশার পূর্বেই মুযদালিফায় পৌঁছে যান, তাহলেও এশার ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত মাগরেবের নামায পড়বেন না।

৬। উভয় নামাযকে ক্রমানুসারে পড়া। যদি কেউ প্রথম এশা এবং পরে মাগরেব পড়েন, তবে তাকে এশার নামায পুনরায় পড়তে হবে।

মাসআলা ঃ

১। যদি কেউ মাগরেব অথবা এশার নামায আরাফাতের ময়দানে অথবা রাস্তায় পড়েন, তবে তা মুযদালিফায় পৌঁছার পর পুনরায় পড়তে হবে। যদি পুনরায় না পড়েন এবং এমনিভাবে ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তবে অবশ্য সে নামাযই যথেষ্ট হয়ে যাবে, ক্বাযা ওয়াজিব হবে না।

২। যদি আরাফাত হতে মুযদালিফায় আসার পথে এমন কোন কারণ উপস্থিত হয় যার দরুন মুযদালিফায় পৌঁছা ফজরের সময় পর্যন্ত নিশ্চিত বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে রাস্তায় মাগরেব এবং এশার নামায পড়ে নেওয়া জায়েজ। কিন্তু প্রত্যেক নামাযই তার নির্ধারিত ওয়াক্তে পড়তে হবে।

৩। যদি কেউ আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তনের সময় রাস্তা ভুলে যান আর মুযদালিফায় পৌঁছতে না পারেন, তবে নামায বিলম্বিত করবেন এবং সুবহে সাদিক নিকটবর্তী হলে পড়বেন।

রমী (কংকর নিক্ষেপ) করা

রমী'র বর্ণনা ঃ

'রমী' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নিক্ষেপ করা বা কোন কিছু ছুড়ে মারা। হজ্জের পরিভাষায় "রমী" হচ্ছে মিনায় শয়তানের উদ্দেশ্যে কংকর নিক্ষেপ করা।

হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ) যখন তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে নিয়ে তাঁকে কুরবানী করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন, তখন শয়তান মিনার তিনটি স্থানে তাঁকে কু-প্ররোচনা দিয়ে পিতার কুরবানীর মহৎ উদ্দেশ্যকে পন্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করে। তখন কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে ঐ তিনটি স্থানেই শয়তানকে তাড়ানো হয়েছিল। হজ্জের রমীর বিধানের দ্বারা সেই পবিত্র স্মৃতিকে জাগরূক রাখা হয়েছে।

আরাফাত থেকে ফেরার পথে মুযদালিফা থেকে ৭০টি কংকর কুড়িয়ে নেওয়া মুস্তাহাব। অন্য স্থান থেকে এ কংকর নিলেও চলে। তবে জামারা বা কংকর নিক্ষেপের স্থান থেকে নেওয়া অনুচিত। কেননা হাদীসে আছে, জামারায় পড়ে থাকা কংকড়গুলো হচ্ছে ঐসব কংকর যেগুলো কবুল হয়নি। কবুল হওয়াগুলো ফিরিশতাগণ উঠিয়ে নেন। অপবিত্র স্থানের কংকর নিক্ষেপ করা মাকরূহ। কংকর ধৌত করে নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব।

কংকর নিক্ষেপের স্থান ঃ

কংকর নিক্ষেপের স্থানকে জামারাত বা জেমার বলে। মিনার মাঝ পথে মসজিদে খায়েফের সন্নিকটে পর পর ৩টি পাথর নির্মিত প্রসস্থ ও উঁচু দেওয়াল বিদ্যমান যা পূর্বে স্তম্ভের মত ছিল এটাই জামারাত। এগুলির মধ্যে যেটি মক্কা শরীফের নিকটস্থ দিকে অবস্থিত সেটিকে জামারায় আকাবা বা কুবরা বা উখরা বলে। যেটি মাঝখানে রয়েছে সেটিকে উসতা এবং সবশেষে যেটি মসজিদে খায়েফের নিকটে অবস্থিত সেটিকে উলা বলা হয়।

রমী সম্পর্কীয় মাসআলা ঃ

১। কংকর নিক্ষেপ করার সময় হচ্ছে ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক হতে ১১ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত। যদি ১১ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক হয়ে যায় এবং কেউ কংকর নিক্ষেপ করতে সক্ষম না হন, তবে দম ওয়াজিব হবে। ১০ তারিখের সুবহে সাদিকের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করা জায়েয নেই। যদি কেউ করেন, তাহলে তা শুদ্ধ হবে না। তবে সুন্নত ওয়াক্ত হচ্ছে ১০ তারিখের সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত। সূর্য হেলে পড়া হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুবাহ ওয়াক্ত। সূর্যাস্তের পরে মাকরূহ। ১০ তারিখ সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্তও মাকরূহ। অবশ্য কোন মহিলা অথবা অসুস্থ ও দুর্বল ব্যক্তি যদি ভিড়ের ভয়ে প্রত্যুষে কংকর নিক্ষেপ করেন, তাহলে তাদের জন্য মাকরূহ হবে না। ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ তারিখে সূর্য হেলার পর ক্রমবিন্যাস (অর্থাৎ উলা, উসতা ও উখরা) অনুযায়ী তিনটি জামারাতেই ৭টি করে কংকর

মারতে হবে। সূর্য হেলার পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সুন্নত ওয়াক্ত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুহরের পর তিন জামারায়ই ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করেন এবং জামারাতুল 'আকাবা' ছাড়া অপর দুই জামারায়ই দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে তাকবীর, তাহলীল ও দু'আ দরূদ করেছেন, কিন্তু জামারাতুল 'আকাবায়' অবস্থান করেননি। (হিদায়া)

২। যদি ১২ই যিলহজ্জ মক্কা মুকাররমা যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাহলে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা হতে বের হয়ে পড়বেন। সূর্যাস্তের পর ১৩ই যিলহজ্জ আরম্ভ হয়ে গেলে ১৩ই যিলহজ্জের রামি ওয়াজিব না হলেও রামি সমাপ্ত না করে যাওয়া মাকরূহ। কিন্তু যদি মিনায় ১৩ তারিখের সুবহে সাদিক হয়ে যায়, তাহলে ১৩ তারিখের রমি ওয়াজেব হবে। যদি ১৩ তারিখের রমি না করে চলে আসেন, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। ১০ তারিখে মিনায় আসার পর সর্বপ্রথম 'রমী' করাই মুস্তাহাব। ১১ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক পর্যন্ত জামারাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা না হলে 'দম' ওয়াজিব হয়ে যায়।

৩। জামারার অন্তত পাঁচ হাত দূরে থেকে হাত উঁচু করে, যতটুকু উঁচু করলে বগল অনাবৃত হয়ে যায়, কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। পাঁচ হাতের কম দূরত্বে দাঁড়িয়ে কংকর নিক্ষেপ করা মাকরূহ। বেশী দূরত্বে ক্ষতি নেই। কংকর খেজুর বীচি বা ছোলার আকারের হওয়া চাই। বড় পাথর ভেঙ্গে ছোট করা মাকরূহ। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা ধরে কংকর মারা মুস্তাহাব। মিনাকে বাম দিকে ও কা'বা শরীফকে ডান দিকে রেখে কংকর নিক্ষেপ করতে হয় এবং সাথে সাথে এরূপ বলা মুস্তাহাব ঃ

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِّلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا

"বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বার্ রাগ্‌মাল্ লিশ্ শাইতানি ওয়ারিযাল্‌লির রাহ্‌মানি। আল্লাহুম্মাজ্-আল্‌হু হাজ্জাম্ মাবরূরান্ ওয়াযাম্মাম্‌মাগ্‌ফুরান্ ওয়াসা'ইয়াম্ মাশ্‌কূরা।"

কংকর নিক্ষেপের সময় ০৩ (তিন) দিন বা ০৪ (চার) দিন। ১০, ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ। ১০ই যিলহজ্জ শুধু জামরায়ে উলায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে এবং অন্যান্য দিবসসমূহে তিনটি জামরার উপরে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। ১৩ই যিলহজ্জের "রমি" শুধুমাত্র অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

কংকর নিক্ষেপের আহকাম

কংকর নিক্ষেপের শর্ত (ফরয) ১০টি। যথা–

১। কংকর নিক্ষেপ করতে হবে, জামরার উপরে রেখে দিলে বা ফেলে দিলে হবে না।

২। হাত দ্বারা রামি করতে হবে। যদি কেউ ধনুক অথবা তীর প্রভৃতির সাহায্যে রামি করেন, তবে তা শুদ্ধ হবে না।

৩। কংকর জামরার নিকট পতিত হতে হবে। যদি দূরে পতিত হয়, তবে রামি শুদ্ধ হবে না। তিন হাতের ব্যবধানকে দূর এবং এর চেয়ে কম দূরত্বকে নিকট বলা হয়।

৪। নিক্ষেপকারীর নিজস্ব ক্রিয়ায় কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়া।

৫। ৭টি কংকর পৃথক পৃথকভাবে নিক্ষেপ করতে হবে। যদি কেহ একাধিক কংকর অথবা ৭টি কংকরই একসাথে নিক্ষেপ করেন, তবে সেগুলি পৃথক পৃথকভাবে পতিত হলেও মাত্র একটি বলেই গণ্য হবে এবং অবশিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করা জরুরী হবে।

৬। নিজ হাতে রামি করতে হবে।

৭। কংকর মাটি জাতীয় হওয়া শর্ত। তা পাথরই হোক অথবা অন্য কিছুই হোক। মাটি জাতীয় ছাড়া অন্য কোন বস্তু দ্বারা রামি করা জায়েয হবে না। পাথর দ্বারা রামি করা উত্তম। সোনা, রূপা, লোহা, আম্বর, মণি-মুক্তা, কাষ্ঠখন্ড, গোবর, জুতা, সেন্ডেল প্রভৃতি দ্বারা রামি করা জায়েয নেই।

৮। কংকর নিক্ষেপের সময় হতে হবে।

৯। রামির অধিকাংশ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে।

১০। ক্রমানুযায়ী তিনটি জামরার উপরে কংকর নিক্ষেপ করা। এটা কারো কারো মতে শর্ত এবং অধিকাংশের মতে সুন্নত।

বিবিধ মাসআলা ঃ

১। সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিনা ওযরে অন্য কারো মাধ্যমে কংকর নিক্ষেপ করানো জায়েয নেই। অবশ্য যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি অপর কাউকে আদেশ করেন অথবা যদি কেউ পাগল এবং বেহুঁশ হন, অথবা শিশু হন এবং দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তার পক্ষ হতে রামি করেন, তবে তা জায়েয হয়ে যাবে। অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ হতে রামি করার জন্য তার অনুমতি থাকা শর্ত এবং বেহুঁশ প্রকৃতির জন্য অনুমতি শর্ত নয়।

২। রামির ব্যাপারে এমন ব্যক্তিকে অসুস্থ এবং অপারগ বলে বিবেচনা করা হবে যিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম নন এবং জামারাত পর্যন্ত পায়ে হেটে অথবা সওয়ার হয়ে আসতে ভীষণ কষ্টের আশঙ্কা থাকে।

৩। যে ব্যক্তি অপরের পক্ষ হতে রামি করবেন, তিনি প্রথমে নিজের সাতটি কংকর পূর্ণ করবেন। তারপর অন্যের পক্ষ হতে কংকর নিক্ষেপ করবেন।

৪। যদি অপারগ ব্যক্তির ওযর অপরের সাহায্যে রামি করানোর পর রামির সময় থাকতেই দূর হয়ে যায়, তবে তাকে পুনরায় নিজ হাতে রামি করতে হবে না।

৫। স্বল্প বুদ্ধি, পাগল, শিশু এবং অজ্ঞান ব্যক্তি যদি মোটেও রামি না করেন, তবে তাদের উপর ক্ষতিপূরণও ওয়াজিব হবে না। অবশ্য যদি অসুস্থ ব্যক্তি রামি না করেন, তবে রামি না করার জন্য ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

৬। পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্য রামির আহকাম সমান, এতে কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য মহিলাদের জন্য রাত্রি বেলা রামি করাই উত্তম।

১০। ভিড়জনিত কারণে মহিলাদের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে কোন ব্যক্তির রামি করা জায়েয নেই। যদি ভিড়ের ভয়ে কোন মহিলা রামি না করেন, তাহলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

১১। রামির মধ্যে একটানা ও বিরতিহীনভাবে কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নত। কংকর নিক্ষেপে বিলম্ব অথবা ব্যবধান করা মাকরূহ। এমনিভাবে এক জামরার পরে অন্য জামরায় কংকর নিক্ষেপের মধ্যে দো'আ ব্যতীত অন্য কোনভাবে বিলম্ব করাও মাকরূহ।

"কুরবানী"

কুরবানীর বর্ণনা ঃ

হজ্জে তামাত্তোকারী ও ক্বেরানকারীদের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব আর এফরাদকারীদের জন্য মুস্তাহাব বা ঐচ্ছিক। কুরবানী করা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ঈসমাইল (আঃ)-এর সুন্নত। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও গুরুত্বের সাথে কুরবানী করেছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকখানা হাদীস উল্লেখ করা হলো–

বিদায় হজ্জের বর্ণনায় মেশকাত শরীফে ২৪৩০ নং হাদীসে মুসলিম শরীফের বরাতে উদ্বৃতির সারমর্ম – হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, "হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কুরবানীর জন্য হযরত আলী (রাঃ) ১০০ (একশত)টি পশু ইয়ামান হতে এনেছিলেন। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতে ৬৩ (তেষট্টি)টি উট কুরবানী করলেন আর যা বাকি ছিল তা হযরত আলী (রাঃ) কুরবানী করলেন।"

আয়েশা (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে কুরবানী–

মেশকাত শরীফে ২৫০২ নং হাদীসে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরবানীর তারিখে (মিনায়) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী দিয়েছিলেন।"– মুসলিম

স্ত্রীদের পক্ষ থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি গরু কুরবানী দিয়েছিলেন–

মেশকাত শরীফে ২৫০৩ নং হাদিসে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিজ স্ত্রীদের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেছিলেন।"– মুসলিম

কিতাবে পাওয়া যায়, উম্মতের কান্ডারী, প্রাণের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জে উম্মতের জন্য কুরবানী করেছেন। এজন্য আশেকে রাসূল উম্মতগণ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে কুরবানী করেন। আপনার জীবিত ও মৃত পীর-মুর্শিদ, পিতা-মাতা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যাদের নামেই ইচ্ছা কুরবানী দিতে পারেন।

১০ই যিলহজ্জ জামরায়ে উলায় কংকর নিক্ষেপ সমাপ্ত করে নিজের অবস্থানে চলে আসবেন। পথে অন্য কোন কাজে লিপ্ত হবেন না। অতঃপর কুরবানী করবেন। "মুফরিদ" (ইফরাদ হজ্জ পালনকারী) এর জন্য কোরবানী ওয়াজিব নয় (ঐচ্ছিক)। তবে মুফরিদ কোরবানী করতে ইচ্ছা করলে সেই ক্ষেত্রে তিনি যদি কুরবানীর আগেই চুল ছাঁটান এবং পরে কুরবানী করেন, তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। "ক্বিরান" ও "তামাত্তো" পালনকারীদের কুরবানী করা ওয়াজিব। তারা কুরবানীর পর চুল ছাঁটাবেন; কিন্তু যদি কুরবানীর পূর্বে চুল ছাঁটান বা মাথা মুন্ডান তবে দম দিতে হবে।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি নিজেই যবেহ করতে পারেন, তার পক্ষে নিজ হাতে যবেহ করা উত্তম। আর যদি যবেহ করতে না জানেন, তবে যবেহ করার সময় কুরবানীর নিকটে থাকা মুস্তাহাব।

কুরবানীর নিয়ম ঃ

কুরবানী করবার সুন্নত তরিকা এই যে, জানোয়ারের অগোচরে ছুরি খুব ধারাল করে নিবেন। তারপর জানোয়ারের পিছনের দুই পা এবং সামনের এক পা খুব মজবুত করে বেঁধে কেবলার দিকে মুখ করে বাম করটের দিকে শোয়াবেন। জানোয়ার যদি এক চোখে দেখতে থাকে, তবে সেই চোখটি ঢেকে দিবেন। তারপর জবেহকারী জন্তুটিকে সামনে রেখে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে এই দোয়া পড়বেন–

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ
مِنِّي هٰذَا النُّسُكَ وَاجْعَلْهُ قُرْبَانًا لِوَجْهِكَ وَعَظِّمْ أَجْرِي عَلَيْهَا

তারপর "বিছমিল্লাহে আল্লাহু আকবার" বলে দ্রুত গতিতে গলায় ছুঁরি চালাবেন, চারটি রগ কেটে দিবেন। হলকুমের হাড় ও বুকের পাঁজরের হাড় এই দুই হাড়ের মাঝখানে গলার মধ্যে সামনের দিক দিয়ে যে কোন স্থানে ছুরি রেখে– ১। শ্বাস নালী, ২। খাদ্য নালী এবং অন্য দুটি রগ সহ চারটি রগ কাটতে হবে।

কুরবানীর মাসআলা ঃ

১। যদি জবেহ্কারী অন্য লোক হয়, যার কুরবানী তার নাম বলবে।

২। দোয়া আগে না পড়ে পরেও পড়া যেতে পারে, তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু "বিছমিল্লাহে আল্লাহু আকবার" বলে দোয়া পড়ার জন্য দেরী করা মাকরূহ।

৩। মিনা বাজারে যে কোন স্থানে এমন কি নিজ তাঁবুতে থেকেও কুরবানী করা জায়েজ আছে।

৪। বিদেশী হাজীগণ মোছাফের বিধায় তাঁদের হজ্জের কুরবানী ছাড়া ঈদুল আযহা'র কুরবানী এবং ঈদুল আযহা'র নামাজ ওয়াজেব নহে। কিন্তু যদি মুকীম হন এবং নেসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকেন, তবে কুরবানী ওয়াজিব।

৫। ১০ই যিলহজ্জ ছোবহে ছাদেকের সময় হতেই কুরবানীর সময় হয়, কিন্তু সূর্যোদয়ের পরে করা ভাল। ১০ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর হতে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কুরবানী করার নির্ধারিত সময়। এর মধ্যে প্রথম দিন সবচেয়ে উত্তম, তারপর দ্বিতীয় দিন, তারপর তৃতীয় দিন। হাজীদের হজ্জের কুরবানীর জন্য আরও একটি শর্ত এই যে, **'রমী' করার পরে কুরবানী হওয়া চাই।**

৬। কুরবানীর গোশ্ত কিছু হলেও খাওয়া মুস্তাহাব আর শুকিয়ে রেখে নিজেরা খাওয়া এবং অন্যকে খাওয়ানোও যায়, তাতে কোন দোষ নেই।

৭। এই কুরবানীর হুকুম-আহ্কামও ঈদুল আযহা'র কুরবানীরই অনুরূপ। যেসব পশু ঈদুল আযহার কুরবানীতে জায়েয এক্ষেত্রেও সেগুলোই জায়েয। আর যেভাবে সেখানে গরু, উট, মহিষ প্রভৃতিতে সাত ব্যক্তি শরীক হতে পারেন এখানেও তেমনি শরীক হতে পারবেন। তবে সাত জনের কম হলেও জায়েয। কিন্তু কাহারও অংশ যেন সপ্তাংশ হইতে কম না হয়।

"তাওয়াফে যিয়ারত"

কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী এবং ক্ষৌর কার্য সমাপ্ত করে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করাকে "তাওয়াফে যিয়ারত" বলে। এ তাওয়াফ হজ্জের রুকন ও ফরয। ইহার শুরু ওয়াক্ত হচ্ছে ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক থেকে, এর পূর্বে আদায় করা জায়েয নেই। এর শেষ সময় হচ্ছে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে ১০ই যিলহজ্জ তারিখে সম্পন্ন করা উত্তম। ১২ই যিলহজ্জের পরে আদায় করলে হবে, তবে দম ওয়াজিব হবে। পরে আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী।

তাওয়াফে যিয়ারতের শর্ত (ফরয) সমূহ ঃ

তাওয়াফে যিয়ারত শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৯টি শর্ত রয়েছে। যথা–

১। মুসলমান হওয়া।

২। স্থির মস্তিষ্ক হওয়া।

৩। ভাল-মন্দ বুঝবার ক্ষমতা থাকা।

৪। তাওয়াফের পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা।

৫। প্রথমে অকুফে আরাফাত করা।

৬। তাওয়াফের নিয়ত করা।

৭। তাওয়াফের সময় হওয়া।

৮। স্থান অর্থাৎ মসজিদে হারামের ভিতরে বায়তুল্লাহ শরীফের চারপাশে তাওয়াফ করা।

৯। নিজে তাওয়াফ করা। যদি অন্য লোকের কাঁধে চড়েও করেন। অবশ্য যদি কেউ ইহরামের পূর্বে অজ্ঞান হয়ে যান এবং তাওয়াফের পূর্ব পর্যন্ত সংজ্ঞা ফিরে না পান, তাহলে অপর কোন ব্যক্তি তার পক্ষ হতে তাওয়াফ করতে পারবেন।

তাওয়াফে যিয়ারতের ওয়াজিব সমূহ ঃ

তাওয়াফে যিয়ারতের ওয়াজিব ৬টি। যথা–

১। পদব্রজে তাওয়াফ করা। তবে শর্ত এই যে, চলাফেরা করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

২। ডান দিক হতে তাওয়াফ শুরু করা।

৩। সাত চক্কর পূর্ণ করা।

৪। হাদাস ও জানাবত (অযু-গোলসলের প্রয়োজন) হতে পবিত্র থাকা।

৫। সতরে আওরাত বজায় থাকা।

৬। কুরবানীর দিবসমূহের মধ্যে তাওয়াফ সম্পন্ন করা।

তাওয়াফে যিয়ারতের মাসআলা ঃ

১। যদি কেউ তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাথে সাঈও করে নেন, তবে তাওয়াফে যিয়ারতে রমল এবং ইযতেবা করতে হবে না এবং সাঈ-এরও প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যদি তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাথে সাঈ না করে থাকেন, তাহলে তাওয়াফে যিয়ারতের প্রথম তিন চক্করে রমল করতে হবে এবং তাওয়াফের নামায পড়ে হাজরে আসওয়াদ চুম্বনপূর্বক 'বাবুস সাফার' পথে বের হয়ে সাঈ করতে হবে। তাওয়াফে যিয়ারতের সময় যদি সেলাইযুক্ত কাপড় পরা থাকে (ইহরাম মুক্ত), তাহলে ইযতেবা করতে হবে না। অন্যথায় করতে হবে। আর যদি তাওয়াফে কুদুমে সাঈ করে থাকেন, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলক্রমে রমল ও ইযতেবা ছেড়ে দেন তাহলেও এখন আর রমল এবং ইযতেবা করতে হবে না।

২। যদি কেউ হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বেঁধে তাওয়াফে কুদুম করেন এবং সাঈও আদায় করেন, তাহলে তাওয়াফে কুদুম আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মাকরূহে তাহরীমা হবে এবং পুনরায় সাঈ করা ওয়াজিব হবে।

৩। তাওয়াফে যিয়ারতের পরে স্ত্রী সহবাস প্রভৃতি হালাল হয়ে যায়। তবে যদি কেউ সেই তাওয়াফ সম্পন্ন না করেন, তবে তার পক্ষে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও স্ত্রী সহবাস হালাল হবে না।

৪। যদি কোন মহিলা এমন সংকীর্ণ সময়ে হায়েয হতে পবিত্র হন যে, ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে গোসল সেরে মসজিদে গিয়ে পূর্ণ তাওয়াফ অথবা শুধু চার চক্কর

সম্পূর্ণ করতে পারেন এবং তিনি তা না করেন, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এতটুকু সময় না থাকে, তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

৫। যদি কোন মহিলা হায়েযের কারণে যথাসময়ে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করতে সক্ষম না হন, তবে দম ওয়াজিব হবে না; তাকে পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ সম্পূর্ণ করতে হবে।

৬। যদি কোন মহিলার জানা থাকে যে, হায়েয শীঘ্রই এসে পড়বে এবং হায়েয আসার পূর্বে এই পরিমাণ সময় বাকী থাকে যে, তিনি পূর্ণ তাওয়াফ অথবা চার চক্কর পূর্ণ করতে পারেন, কিন্তু তিনি তা না করেন এবং হায়েয এসে পড়ে আর কুরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পর পাক হন, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি হায়েয আসার পূর্বে চার চক্কর পূর্ণ করার মত সময় বাকী না থাকে, তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

"তাওয়াফে বিদা"

তাওয়াফে বিদা'র বর্ণনা ঃ

পবিত্র হজ্জ সম্পাদনে বহিরাগতদের হজ্জ সমাপ্তির পর বিদায় কালে যে তাওয়াফ করা হয় ইহাকে তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ বলে।

তাওয়াফে বিদা'র নিয়ম ঃ

পবিত্র হজ্জ সমাপ্ত করার পর যখন মক্কা মুকাররমা হতে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন তাওয়াফে বিদা' সম্পন্ন করবেন এবং এতে রমল করবেন না এবং এর সাঈও করবেন না। তাওয়াফ সম্পন্ন করে তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায আদায় করতঃ কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে খুব পেট ভরে কয়েক শ্বাসে যমযমের পানি পান করবেন এবং প্রত্যেক শ্বাসে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকাবেন। মুখমন্ডল, মাথা এবং দেহে যমযমের পানি মালিশ করবেন এবং শরীরের উপরেও ঢালবেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ শরীফের চৌকাঠ– যা ভূমি হতে উঁচু হয়ে আছে, চুম্বন করবেন। তারপর মুলতাযামকে জড়িয়ে ধরবেন। এতে বুক এবং ডান গাল লাগিয়ে ডান হাত উপরে উঠিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের পর্দা ধরবেন যেমন– কোন গোলাম অথবা খাদেম তার প্রভুর জামার ঝুল বা প্রান্ত ধরে থাকে। যদি পর্দা পর্যন্ত হাত না পৌঁছে, তবে উভয় হাত মাথার উপরে উঠিয়ে দেওয়ালের সহিত সোজাভাবে খাড়া করে বিছিয়ে দিবেন। মোটের উপর যেমন করে সম্ভব ঐ সময় খুব রোদন করবেন, বিনীতভাবে প্রার্থনা করবেন এবং গভীর আক্ষেপের সাথে বিলাপ করবেন। যদি কান্না না আসে, তাহলে ক্রন্দনকারীদের মত আকৃতি ধারণ করবেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফ হতে বিদায় হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে আফসোস প্রকাশ করবেন। তারপর হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবেন; যদি সহজসাধ্য হয়, তাহলে উল্টা পায়ে বাবুল বিদা' হতে বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে

বেদনার চোখে তাকাতে তাকাতে এবং ক্রন্দন করতে করতে মসজিদ হতে বের হবেন। দরজায় দাঁড়িয়ে দো'আ প্রার্থনা করবেন। নিম্নের দো'আটি পাঠ করতে পারেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ الْعَوْدَ بَعْدَ الْعَوْدِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ اِلٰى بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمَقْبُوْلِيْنَ عِنْدَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَرَامِ اِنْ جَعَلْتَهٗ اٰخِرَ الْعَهْدِ فَعَوِّضْنِيْ عَنْهُ الْجَنَّةَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

"আল্হাম্দু লিল্লাহি হামদান্ কাসীরান্ তাইয়্যিবান্ মুবারাকান্ ফীহি। আল্লাহুম্মারযুক্ক্নীল্ আওদা বা'দাল্ আ'ওদি আল্মাররাতা বা'দাল্ মাররাতি ইলা বাইতিকাল্ হারামি ওয়াজ্আ'ল্নী মিনাল্ মাক্ববূলীনা ইন্দাকা ইয়া যাল্জালালি ওয়াল্ইক্রামি। আল্লাহুম্মা লা তাজ্আল্হু আখিরাল্ আহ্দি মিন্ বাইতিকাল্ হারামি ইন্ জাআ'ল্তাহু আখিরাল্ আহ্দি ফাআউয়্যিযনী আন্হুল্ জান্নাতা ইয়া আরহামার্ রাহিমীনা। ওয়াসাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খাল্ক্বিহি মুহাম্মাদিন্ ওয়াআলিহি ওয়াসাহ্বিহি আজ্মাঈন্।"

হায়েয ও নেফাস পালনরতা মহিলাগণকে এই তাওয়াফ করতে হবে না; বরং তারা বাবুল বিদা'র উপরে দাঁড়িয়েই শুধু দো'আ প্রার্থনা করবেন।

তাওয়াফে বিদা'-এর মাসআলা ঃ

১। তাওয়াফে বিদা' মক্কার বাইরে বসবাসকারী হাজী সাহেবগণের উপরে ওয়াজিব; চাই তিনি হজ্জে এফরাদ অথবা ক্বেরান অথবা তামাত্তো' যাই পালন করুন না কেন। তবে শর্ত এই যে, তাকে আকেল, বালেগ ও সক্ষম হতে হবে। এই তাওয়াফ হরম, হিল্লী ও মীকাতের অধিবাসী, হায়েয ও নেফাস পালনরত মহিলা, পাগল, অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং যাহার হজ্জ ছুটে গেছে কিংবা যাকে হজ্জ পালনে বাঁধা প্রদান করা হয়েছে– তাদের উপর ওয়াজিব নয় এবং যারা শুধু উমরা পালন করেন, তাদের উপরও ওয়াজিব নয়।

২। তাওয়াফে বিদা' মক্কী, হিল্লী এবং মীকাতীদের জন্য মুস্তাহাব।

৩। যে ব্যক্তি মক্কা মুকাররামা অথবা এর আশে-পাশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছেন, তার উপর হতে এই তাওয়াফ রহিত হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, ১২ই যিলহজ্জের পূর্বে স্থায়ীভাবে বসবাসের নিয়ত করতে হবে। যদি ১২ তারিখের পরে নিয়্যত করেন, তবে এই তাওয়াফ রহিত হবে না।

৪। যদি কেউ মক্কা মুকাররামায় ১৫ দিনের অধিক বসবাসের নিয়্যত করেন, কিন্তু স্থায়ী বাসস্থান তৈরী না করেন, তবে বৎসরের পর বৎসর সেখানে বসবাস করার পরেও তাওয়াফে বিদা' মাফ হবে না।

৫। যে ব্যক্তির মক্কা হতে সফর করার নিয়্যত রয়েছে, তার জন্য তাওয়াফে যিয়ারতের পরেই তাওয়াফে বিদা'র সময় হয়। যদি কেউ সফরের ইচ্ছা করে তাওয়াফে

বিদা’ সমাপন করেন এবং তারপর আবার সেখানে অবস্থানের নিয়্যত করে ফেলেন, তবে তাওয়াফে বিদা’ আদায় হয়ে যাবে। কেননা, তাওয়াফে বিদা’র নির্দিষ্ট শেষ সময় নাই, যখন ইচ্ছা করা যেতে পারে।

৬। যদি কেউ তাওয়াফে বিদা’ সম্পন্ন করার পরও কিছুদিন মক্কায় থেকে যান, তাহলে রওয়ানা হওয়ার সময় পুনরায় তাওয়াফে বিদা’ সম্পন্ন করা মুস্তাহাব।

৭। যদি হায়েযবতী মহিলা মক্কার আবাদী হতে বের হওয়ার পূর্বেই পাক হয়ে যান, তবে তার জন্য ফিরে এসে তাওয়াফে বিদা’ সমাপন করা ওয়াজিব। আর যদি আবাদী হতে বের হওয়ার পর পাক হন, তবে ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে ফিরে আসেন, তাহলে তাওয়াফে বিদা’ ওয়াজিব হবে।

তাওয়াফে বিদা’ না করে মীকাত অতিক্রম করার মাস্আলা ঃ

১। যে ব্যক্তি তাওয়াফে বিদা’ সম্পন্ন না করেই মক্কা মুকাররামা হতে রওয়ানা হবেন, তার জন্য মীকাত অতিক্রম না করা পর্যন্ত মক্কায় ফিরে এসে এই তাওয়াফ সম্পন্ন করা ওয়াজিব। এতে ইহরামের প্রয়োজন হবে না। আর যদি মীকাত অতিক্রম করে চলে যান, তবে দম পাঠিয়ে দিবেন অথবা ইচ্ছা করলে উমরার ইহরাম বেঁধে ফিরে এসে প্রথমে উমরা পালন করবেন এবং পরে তাওয়াফে বিদা’ সম্পন্ন করবেন। এই বিলম্বের জন্য অবশ্য কোন দম অথবা সদ্কা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু বিনা কারণে এমন করা অনুচিত। মীকাত হতে বাইরে যাওয়ার পরে তাওয়াফে বিদা’ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসার জন্য উমরার ইহরাম বাঁধা জরুরী, ইহরাম ছাড়া আসা নিষিদ্ধ।

২। তানঈম প্রভৃতি স্থানে গমনকারীদের জন্য তাওয়াফে বিদা’ ওয়াজিব নয়।

৩। তাওয়াফে কুদুম অথবা তাওয়াফে বিদা’ অথবা তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিয়ত করা শর্ত নয়। বরং প্রত্যেক তাওয়াফের সময় শুধু সাধারণভাবে তাওয়াফের নিয়তই যথেষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ যদি কেউ মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করার সময় তাওয়াফ করেন, তাহলে এতে তাওয়াফে কুদুম আদায় হয়ে যাবে। এভাবে কুরবানীর দিবসমূহে তাওয়াফ করলে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় হয়ে যাবে এবং মক্কা হতে রওয়ানা হওয়ার সময় তাওয়াফ করলে তাওয়াফে বিদা’ আদায় হয়ে যাবে।

“বদলী হজ্জ”

বদলী হজ্জের বর্ণনা ঃ

বদলী হজ্জ অর্থ অন্যকে দিয়ে হজ্জ করানো। যদি কোন ব্যক্তি ফরজ হজ্জ আদায় করতে অক্ষম হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে অন্য কোন ব্যক্তির হজ্জ পালনকে বদলী হজ্জ বলে। ‘বাহরুল আমিক্’ কিতাবে আছে যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ করে তার জন্য ৭

হজ্জ এবং যে হজ্জ করায় তাহার জন্য এক হজ্জের ছওয়াব লিখা হয়। ঐ কিতাবে হাদীস শরীফ হতে বর্ণিত আছে যে, “বদলী হজ্জের উছিলায় তিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ লাভ করবে, যথা– ১। হজ্জের জন্য যে অছিয়ত করে; ২। যে ঐ অছিয়ত পূর্ণ করে; ৩) যে তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করে।

হাদীস শরীফ থেকে বদলী হজ্জের যে বিধান পাওয়া যায়, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

পিতার পক্ষ হতে সন্তান হজ্জ করতে পারে –

মেশকাত শরীফে ২৩৮৮ নং হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার খাসআম গোত্রের এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের উপর ফরজ করা হজ্জ আমার পিতার প্রতি বর্তায়েছে অথবা তিনি অতি বৃদ্ধ, বাহনের পিছে বসে থাকার ক্ষমতা তার নেই। সুতরাং আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারব? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। এটা বিদায় হজ্জের ঘটনা।– বোখারী ও মুসলিম

পিতার পক্ষ থেকে পুত্রকে হজ্জ ও ওমরা করার নির্দেশ –

মেশকাত শরীফে ২৪০৩ নং হাদীসে হযরত আবু রযীন ইকাইলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে তিনি একদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, হজ্জ ও উমরা করার ক্ষমতা রাখে না এবং বাহনে বসতে পারে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা কর।– তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ। তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান ও সহীহ্

নিজের ভগিণীর পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায় –

মেশকাত শরীফে ২৩৮৯ নং হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভগিনী হজ্জ করতে মানত করেছিলেন, কিন্তু তা আদায় করার পূর্বে তিনি মারা গেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার ভগিনীর উপর কারও ঋণ থাকলে তুমি তা আদায় করতে কি না? সে বলল, নিশ্চয়ই! রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তবে আল্লাহ্র ঋণ আদায় কর। এটা আদায়ের অধিকতর উপযোগী।– বোখারী ও মুসলিম

প্রথমে নিজের হজ্জ করবেন তারপর অন্যের হজ্জ –

মেশকাত শরীফে ২৪০৪ নং হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছে, আমি শুবরোমার পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত করছি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, শুবরোম কে? সে বলল, আমার এক ভাই অথবা বলল, আমার এক আত্মীয়। তখন

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজের হজ্জ করেছ কি? সে বলল, জ্বি না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তবে তুমি প্রথমে নিজের হজ্জ কর, পরে শুবরোমার হজ্জ করবে।– শাফেয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্

প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আমলের ছওয়াব অন্য ব্যক্তিকে (তিনি জীবিতই হন অথবা মৃত) বখশিয়া দিতে পারেন। চাই সেই আমল রোযা, হজ্জ, সদকা, অথবা অন্য কোন এবাদত। ইহা জায়েজ। আশা করা যায়, সে ছওয়াব পাবে। কিন্তু আখেরাতের বিষয়ে মজুরী ধার্য করে কোন এবাদতের কাজ করা বা করানো জায়েজ নয়।

এবাদতে প্রতিনিধি নিয়োগ ঃ

১। আর্থিক এবাদত, যেমন ঃ যাকাত, সদকায়ে ফিতরা ইত্যাদি। এ জাতীয় এবাদত প্রতিনিধির মাধ্যমে আদায় করানো যেতে পারে। চাই প্রয়োজনের কারণে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হোক অথবা বিনা প্রয়োজনে।

২। শারীরিক এবাদত, যেমনঃ নামায, রোযা ইত্যাদি। এই জাতীয় এবাদত প্রতিনিধির মাধ্যমে আদায় করানো জায়েয নয় ।

৩। আর্থিক ও শারীরিক মিশ্র এবাদত, যেমন ঃ হজ্জ। এটা শুধু তখনই প্রতিনিধির মাধ্যমে করানো যাবে যখন সংশি-ষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং হজ্জ সমাপন করতে শারীরিকভাবে অপারগ হবেন। যদি কেউ নিজে আদায় করতে সক্ষম থাকেন, তাহলে অন্যের দ্বারা আদায় করতে পারবেন না।

বদলী হজ্জের মাসআলা ঃ

১। নফল হজ্জ এবং নফল উমরা সর্বাবস্থায় অন্যের মাধ্যমে আদায় করানো জায়েয। অর্থাৎ যিনি নফল হজ্জ করাবেন তিনি স্বয়ং আদায় করতে সক্ষম থাকুন বা না থাকুন– অন্যের মাধ্যমে আদায় করাতে পারবেন।

২। যে ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয এবং আদায় করার সময় পাওয়া সত্ত্বেও আদায় করেননি এবং পরে আদায় করতে (শারীরিকভাবে) অপরাগ হয়ে পড়েন, তার উপর অন্য কারো দ্বারা হজ্জ করানো ফরয। চাই নিজের জীবদ্দশায় করাবেন অথবা মৃত্যুর পরে করাবার ওসিয়ত করে যাবেন। তার উপর ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব।

৩। অপারগ হওয়ার কারণগুলি এই– ১) মৃত্যু, ২) বন্দীত্ব, ৩) এমন পীড়া যা হতে আরোগ্য লাভের কোন আশা নেই। যেমন– অর্ধাঙ্গ রোগ, অন্ধত্ব। ৪) খোঁড়া হয়ে যাওয়া, ৫) এতবেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়া যদ্দরুন সওয়ারীর উপরে বসার ক্ষমতাও না থাকা, ৬) মহিলাদের জন্য মাহরাম না থাকা এবং ৭) পথ-ঘাট নিরাপদ না হওয়া। উপরোক্ত ওযরসমূহ আমৃত্যু বহাল থাকা অক্ষমতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য শর্ত।

৪। জীবিত লোকের জন্য অপর ব্যক্তিকে নিজের পক্ষ হতে হজ্জ করার আদেশ করেন অথবা মৃত ব্যক্তি যদি হজ্জ করাবার ওসিয়ত করে যান, তা হলে ওছী অথবা উত্তরাধিকারীর আদেশ করা শর্ত। অবশ্য ওয়ারিস যদি নিজের মুরিস-এর পক্ষ হতে

অথবা সন্তান তার পিতা-মাতার পক্ষ হতে তাদের মৃত্যুর পর বিনা অনুমতিতে হজ্জ করেন তা হলে জায়েয হবে। যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত না করেন এবং অতঃপর ওয়ারিস অথবা অপরিচিত ব্যক্তি তার পক্ষ হতে হজ্জ করে ফেলেন, তা হলে আলহামদুলিল্লাহ্ ফরয আদায় হয়ে যাবে।

৫। ইহরামের সময় আদেশদাতার পক্ষ হতে হজ্জের নিয়ত করা। যদি ইহরামের সময় শুধু হজ্জের নিয়ত করেন এবং হজ্জের কাজ-কর্ম শুরু করার পূর্বে আদেশদাতার পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করে দেন, তবে তাও জায়েয হবে। **যদি হজ্জের কাজ-কর্ম শুরু করার পর আদেশদাতার পক্ষ হতে নিয়ত করেন, তা হলে আদেশদাতার ফরয আদায় হবে না; বরং আদেশদাতার টাকা-পয়সা ফেরত দেওয়া আবশ্য কর্তব্য হবে।**

৬। এইভাবে বলা যে, অমুকের পক্ষ হতে ইহরাম বাঁধছি- মুখে বলা উত্তম, তবে মনে মনে নিয়ত করলেও আদায় হবে।

৭। যদি কেহ আদেশদাতার নাম ভুলে যান, তা হলে এমতাবস্থায় শুধু আদেশ দাতার পক্ষ হতে নিয়ত করাই যথেষ্ট হবে।

৮। যদি কোন ব্যক্তির উপরে হজ্জ ফরয থাকে এবং তার আদেশে কেউ তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করেন; আর ফরয বা নফল ইত্যাদি কিছুই নিয়ত না করেন, তা হলে আদেশদাতার ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যদি নফলের নিয়ত করেন, তা হলে ফরয আদায় হবে না।

৯। শুধু এক ব্যক্তির পক্ষ হতেই হজ্জের ইহরাম বাঁধা। যদি কেউ দুই ব্যক্তির পক্ষ হতে ইহরাম বেঁধে হজ্জ করেন, তা হলে দুই জনের কারোরই হজ্জ শুদ্ধ হবে না। এটা হজ্জ আদিষ্ট ব্যক্তির হয়ে যাবে এবং এই দুই জনের টাকাই ফেরত দিতে হবে। হজ্জ করার পর এটাকে কোন একজনের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করার এখতিয়ার নেই।

১০। যদি কেউ নফল হিসেবে আদেশ ছাড়াই দুই জন অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষ হতে অথবা নিজের পিতা-মাতার পক্ষ হতে এক ইহরামে হজ্জের নিয়ত করেন, তা হলে ইহরামের পরে হজ্জের কাজ-কর্ম শুরু করার পূর্বে অথবা হজ্জ সমাপন করে কোন একজনের জন্য উক্ত হজ্জকে নির্দিষ্ট করে দেন, তা হলে দুরস্ত হবে। কেননা, এই হজ্জ আদায়কারীর হয়েছে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা এটার সওয়াব বখশিয়া দিতে পারেন। চাই একজনকে অথবা উভয়কে।

১১। যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত করে না যান এবং উত্তরাধিকারীরা অথবা অপরিচিত কোন ব্যক্তি তার পক্ষ হতে হজ্জ করিয়ে দেন, তা হলে ইমাম আবু হানীফা'র মতে ইন্‌শাআল্লাহ্ মৃত ব্যক্তির হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত করে থাকেন, তা হলে উত্তরাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত মৃত ব্যক্তির ফরয হজ্জ আদায় হবে না।

১২। যদি হজ্জ ছুটে যায়, তা হলে আদেশদাতার হজ্জ হবে না। যদি আদিষ্ট ব্যক্তির অলসতা অথবা কর্মব্যস্ততার কারণে হজ্জ ছুটে যায়, তা হলে জামানত ওয়াজিব

হবে। আর যদি কোন আসমানী বিপদের কারণে ছুটে যায়, তা হলে জামানত দিতে হবে না।

১৩। যদি কেউ ওসিয়ত করে যান যে, অমুক ব্যক্তি হজ্জ করবেন এবং এই অমুক ব্যক্তি হজ্জ করতে অস্বীকার করেন আর ওছী অন্য কারও দ্বারা হজ্জ করে নেন, তা হলে জায়েয হবে। আর যদি অস্বীকার না করেন এবং এতদসত্ত্বেও অপর কোন লোককে দিয়ে হজ্জ করান, তা হলেও জায়েয হবে।

১৪। আদেশদাতার জন্মস্থান হতে হজ্জ করা- যদি এক-তৃতীয়াংশ মালের মধ্যে এর সুযোগ থাকে। নতুবা মীকাতের বাইরে যে জায়গা হতে সম্ভব হয় সেখান হতে করে নিবেন। যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে ওসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

১৫। হজ্জ সমাপন করার পর আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য আদেশদাতার জন্মস্থানে ফিরে আসা উত্তম। যদি মক্কা মুকাররমায় থেকে যান, তা হলেও কোন অসুবিধা হবে না।

অন্যের নামে কোন্ প্রকারের হজ্জ সম্পাদন করবেন?

মুহাক্কেক ওলামায়ে কেরামের মত হলো– বদলী হজ্জ পালনকারী "হজ্জে ইফরাদ" আদায় করবেন।

বদলী হজ্জ আদায়কারীর জন্য আদেশদাতার অনুমতি ছাড়া তামাত্তো' সমাপন করা কারও মতেই জায়েয নয়। তবে যদি আদেশদাতা তামাত্তো' পালনের অনুমতি প্রদান করেন, তা হলে কোন কোন আলেম এটাকে জায়েয মনে করেন। কিন্তু মুহাক্কেক আলেমগণের মতে বদলী হজ্জ পালনকারীর জন্য আদেশদাতার অনুমতি সত্ত্বেও তামাত্তো' পালন করা জায়েয নয়। যদি কেউ আদেশদাতার অনুমতিক্রমে তামাত্তো' আদায় করেন, তা হলে যদিও জামানত দিতে হবে না, কিন্তু আদেশদাতার হজ্জ আদায় হবে না। ইমামুন-নাসিকীন মুল্লা আলী ক্বারী (রঃ) 'শরহে লুবাব' গ্রন্থে এবং হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রঃ) 'যুবদাতুল মানাসিক' গ্রন্থে জায়েয না হওয়ার অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। সুনানে আবু দাউদ-এর ব্যাখ্যাকার হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেবও জায়েয না হওয়ার ফতোয়া প্রদান করতেন। এই জন্য বদলী হজ্জকারীদের শুধু আরামের জন্য এবং ইহরামের দীর্ঘসূত্রিতা হতে রেহাই পাওয়ার জন্য তামাত্তো' সমাপন করে আদেশদাতার হজ্জ নষ্ট না করা উচিত। আর আদেশদাতাগণেরও উচিত যে, তারা যেন বদলী হজ্জ সমাপনকারীগণকে বিশেষভাবে তামাত্তো' পালন করতে নিষেধ করে দেন।

মাস্আলা ঃ

১। বদলী হজ্জ সমাপন করা নফল হজ্জ সমাপন করার চেয়ে উত্তম।

২। যদি কেহ কোন হজ্জ পালনকারীকে সাহায্য করতে চান, তাহলে এমন ব্যক্তির সাহায্য করাই উত্তম যিনি পূর্বে আর কখনও হজ্জ পালন করেননি। কেননা, যিনি পূর্বে

হজ্জ সমাপন করেননি, তার জন্য উহা ফরজ হজ্জ; আর যিনি পূর্বে হজ্জ করেছেন, তার জন্য এটা নফল হজ্জ। যেহেতু ফরযের স্থান নফলের উর্ধ্বে। তাই ফরজ সহায়তার মর্যদা নফলের সহায়তা হতে বেশী হবে।

বদলী হজ্জের নিয়ত ঃ

اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني واعني عليه
وبارك لي فيه نويت الحج واحرمت به لله تعالى عن فلان

“আল্লাহুম্মা ইন্নি-উরিদুল হাজ্জা ফা ইয়াছছিরহুলী অতাকাব্বালহু মিন্নি অ-আইন্নি আলাইহে অবারেকলী ফীহি অআহ্রামতু বিহি লিল্লাহে তায়ালা আন ফোলান।”

হজ্জে বদল ও ওমরায়ে-বদলের তালবিয়া ঃ পূর্বের যে তালবিয়া লিখা হয়েছে সেই দোয়ার শেষভাগে শুধু নাম যোগ করতে হবে।

বদলী হজ্জ আদায়ে সক্ষম ব্যক্তি কে?

এমন লোকের মাধ্যমে বদলী হজ্জ করানো উত্তম, যিনি এলেম ও আমলে নিষ্ঠাবান এবং মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞানবান এবং নিজের ফরয হজ্জ পূর্বে আদায় করেছেন।

যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে সে নিজ হজ্জ আদায় না করে অন্যের জন্য হজ্জ করা মাকরূহ তাহরিমা। কিন্তু যার উপর হজ্জ ফরয হয়নি ও নিজে নফল হজ্জও আদায় করেননি, তিনি অন্যের জন্য হজ্জ করতে পারেন; এটা ইমাম মালেক ও আবু হানীফা (রঃ)'র মাযহাব অনুযায়ী জায়েয; কিন্তু শাফেয়ী মাযহাবে এটা জায়েয নয়। যারা না জায়েয বলেন তারা বলেন যে ঐ ব্যক্তি মক্কা শরীফ প্রবেশ করার দরুণ তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে যায়। কিন্তু হযরত আবদুল গণি হানাফী নাবেলছী (রঃ) ইহার খেলাফ ফতুয়া দিয়েছেন। ঐ ব্যক্তির মক্কা শরীফে প্রবেশ করার দরুণ তার উপর হজ্জ ফরজ হবে না; কারণ সে বৎসর তার ফরজ হজ্জ আদায় করা অসম্ভব; কেননা সে নায়েবী হজ্জ করার জন্য অপরের মাল দ্বারা অপরের পক্ষ হতে ইহরাম বেঁধে অপরের হজ্জ করার জন্য মক্কা শরীফ পৌঁছেছেন; সুতরাং শরীয়ত অনুযায়ী তার ক্ষমতাই নেই যে সে ঐ বৎসর নিজের জন্য ইহরাম বাঁধে। আগামী বৎসর হজ্জ পর্যন্ত বিনা খোরপোষে তার পক্ষে মক্কা শরীফে অবস্থান করা সম্ভব নয়; এজন্য তার উপর হজ্জ ফরয হয় না। তার জন্য ওমরা করাই যথেষ্ট। হযরত মাওলানা শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ ছনদী (রঃ) তার “তাওয়ালেওল্ আনওয়ার শরহে দোররল মোখতার” কেতাবেও এই মতই সমর্থন করেছেন।

মাসআলা ঃ

১। যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ করেননি, তিনি যদি অন্য লোকের পক্ষ হতে হজ্জ করেন, তা হলে হজ্জ আদায় হবে, কিন্তু মাকরূহ হবে।

২। মহিলাদের জন্য যদি মাহরাম সঙ্গে থাকেন এবং স্বামী অনুমতি প্রদান করে, তবে অন্য পুরুষ অথবা মহিলার পক্ষ হতে হজ্জ করা জায়েয। কিন্তু পুরুষের দ্বারা বদলী হজ্জ করানোই উত্তম।

৩। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হজ্জ করা বা করানো জায়েয নয়। সুতরাং এমন শব্দ দ্বারা হজ্জের আদেশ করতে নেই যাতে পারিশ্রমিকের অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু যদি কেউ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হজ্জ করেন, তা হলে হজ্জ আদেশদাতারই বলে গণ্য হবে এবং আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে পারিশ্রমিক ফেরত নেয়া হবে। তবে প্রয়োজনীয় পরিমিত টাকা খরচ বাবদ হজ্জ সমাপনকারীকে প্রদান করতে হবে।

বদলী হজ্জ আদায়কারীর জন্য সফরের খরচ ঃ

মাসআলা ঃ

১। বদলী হজ্জ আদায়কারীকে এই পরিমাণ টাকা-পয়সা দেওয়া উচিত যা আদেশদাতার অবস্থান হতে মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত মধ্যমভাবে আসা-যাওয়া করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং যাতে ব্যয় সংকোচন কিংবা অপব্যয় কোনটারই সুযোগ না হয়।

২। খরচের মধ্যে সওয়ারী, রুটি, গোশ্‌ত, তরকারী, ঘি, বাতির তৈল, ইহরামের কাপড়, পানির সামান, সফরের কাপড়-চোপড়, কাপড় ধোঁয়ার ও গোসলের সাবান, পরিবহন খরচ, শীলের মজুরি, ঘর ভাড়া, নিরাপত্তার মজুরি এবং আরো অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় আদেশদাতার মর্যাদা অনুসারে অন্তর্ভূক্ত হবে; আর আদেশদাতার মাল হতে কোন সংকীর্ণতা ও অপব্যয় না করে উল্লেখিত খাতে খরচ করা জায়েয।

৩। আদেশদাতার উচিত যে, তিনি আদিষ্ট ব্যক্তিকে হজ্জের যাবতীয় খরচের টাকা প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা প্রদান করবেন, তা হেবা করে দিবেন। তা হলে এটা সকল ব্যাপারে খরচ করতে সুবিধা হবে; আর হিসাব রাখতে কষ্ট হবে না। অবশ্য এটা নিশ্চয়ই খেয়াল রাখা উচিত যে, যে টাকা হজ্জের জন্য দিবেন তা সমুদয়ই যেন আদিষ্ট ব্যক্তিকে হেবা না করেন। কেননা, তা হলে এটা আদিষ্ট ব্যক্তির অধিকৃত মাল হয়ে যাবে। ফলে, এর দ্বারা আদেশদাতার হজ্জ জায়েয হবে না।

৪। আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য আদেশদাতার মাল হতে কাউকেও দাওয়াত করা অথবা খানায় শরীক করা অথবা সদকা দেওয়া অথবা ঋণ দেওয়া জায়েয নয়। অবশ্য যদি আদেশদাতা এসব বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে থাকেন, তবে জায়েয হবে।

৫। যদি আদিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা কোন হজ্জ সম্পর্কিত ত্র“টি সংঘটিত হয়ে যায়, তা হলে আদিষ্ট ব্যক্তিকে তার নিজের মাল হতেই এর দম প্রদান করতে হবে। আদেশদাতার মাল হতে তার অনুমতি ব্যতীত খরচ করা জায়েয হবে না। এমনিভাবে যদি আদিষ্ট ব্যক্তি কেরান অথবা তামাত্তো’ পালন করেন, তা হলে দমে কেরান ও তামাত্তো’ নিজের মাল হতেই প্রদান করবেন। আদেশদাতার মাল হতে যদি কেরান অথবা তামাত্তো’ বিনা অনুমতিতে আদায় করেন, তা হলে জামানত ওয়াজিব হবে।

৬। আদিষ্ট ব্যক্তি ইহরাম না বাঁধা পর্যন্ত আদেশদাতা নিজের টাকা-পয়সা ফিরিয়ে নিতে পারবেন। ইহরাম বাঁধার পর ফিরিয়ে নিতে পারবেন না।

৭। হজ্জ সমাপ্ত করার পর যা কিছু নগদ টাকা-পয়সা অথবা বস্ত্রসামগ্রী আদেশদাতার মাল হতে অবশিষ্ট থাকবে, তা আদেশদাতা অথবা তার উত্তরাধিকারীদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাহারা যদি তাকে সেগুলি দিয়ে দেন, তাহলে তা গ্রহণ করা জায়েয। হ্যাঁ, এটা দিয়ে দেয়াই উত্তম। আদেশদাতা আদিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদত্ত টাকা আদিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছামত যেমনভাবে এবং যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করার সাধারণ অনুমতি দিয়ে রাখা উচিত।

৮। যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত করেন যে, তার মাল হতে যেন হজ্জ করানো হয় এবং হজ্জ সম্পন্ন করার পর যে মাল উদ্বৃত্ত থাকবে তা যেন হজ্জ পালনকারীকে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এই ওসিয়ত জায়েয আছে এবং হজ্জ পালনকারীর জন্য ওসিয়তের ভিত্তিতে সেই মাল গ্রহণ করা বিশুদ্ধ মতানুসারে জায়েয রয়েছে।

৯। যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সব টাকা-পয়সা খরচ করে ফেলেন, তাহলে ওছীর উপরে তার ফিরে আসার জন্য টাকা-পয়সা প্রেরণ করা ওয়াজিব হবে না।

১০। মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি যদি অকুফে আরাফার পরে মারা যান, তা হলে মৃত ব্যক্তির হজ্জ হয়ে যাবে। আর যদি মারা না যান, কিন্তু তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে ফিরে আসেন, তা হলে যতক্ষণ পর্যন্ত মক্কা মুকাররামা প্রত্যাবর্তন করে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য স্ত্রী হালাল হবে না এবং তাকে ফিরে গিয়ে বিনা ইহরামে নিজের মাল হতে তাওয়াফের ক্বাযা সম্পন্ন করতে হবে।

১১। যদি আদেশদাতা এইভাবে অনুমতি প্রদান করে থাকেন যে, "প্রয়োজনের সময় ঋণ গ্রহণ করবেন– আমি পরে আদায় করে দিব", তা হলে ঋণ গ্রহণ করা জায়েয।

১২। যদি মক্কা মুকাররামায় অথবা এর নিকটবর্তী কোন স্থানে টাকা-পয়সা নষ্ট হয়ে যায় এবং আদিষ্ট ব্যক্তি নিজের মাল হতে খরচ করেন, তাহা হলে মৃত ব্যক্তির মাল হতে এটা গ্রহণ করতে পারবেন।

যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম, হুজ্জাতুল ইসলাম, মুসলিম দার্শনিক হযরত ইমাম হামেদ মুহাম্মদ আল গায্যালী (রহঃ) রচিত "এহইয়াউ উলুমিদ্দীন" কিতাবের আলোকে **"দেশ-মীকাত-মক্কা শরীফ"**

দেশ থেকে মীকাত ঃ

হজ্জ উপলক্ষ্যে ঘর হতে বের হয়ে ইহরাম বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত আটটি কাজ করা সুন্নত। যথা–

১। সফর শুরু করার পূর্বে তাওবা করবেন। (৪৫-৪৬ পৃষ্ঠার লিখিত হজ্জের ধর্মীয় ও বাহ্যিক প্রস্তুতি স্মরণে রাখবেন)।

২। নেককার, সৎ হিতাকাঙ্খী এবং সু-সম্পর্ক বিশিষ্ট সফরসঙ্গী নির্বাচন করবেন।

৩। গৃহ হতে রওনা হওয়ার সময় প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ দিয়ে দু'রাকাত নামায পড়বেন। নামায শেষে মুনাজাত করবেন–

اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب، احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة، اللهم إنا نسألك في مسيرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم إنا نسألك أن تطوي لنا الأرض، وتهون علينا السفر، وأن ترزقنا في سفرنا سلامة البدن والدين والمال، وتبلغنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد والأصحاب، اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك، ولا تسلبنا وإياهم نعمتك، ولا تغير ما بنا وبهم من عافيتك

"হে মাবুদ! আমার এ সফরে তুমিই আমার সাথী, আমার মাল-সামান, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-এগানার জন্য তুমিই আমার স্থলবর্তী। তুমি আমাকে ও তাদেরকে সবরকম বিপদ থেকে রক্ষা করো। হে মাবুদ! আমার এ সফরে তোমার নিকট নেকী ও পরহেজগারী কামনা করছি। আমি যেন তোমার সন্তুষ্টিজনক কাজ করতে পারি, যাতে তুমি খুশী হও। হে মাবুদ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, তুমি আমার এ সফরের দূরত্ব লাঘব করে দাও। সফরকে আমার জন্য সহজসাধ্য করে দাও। তুমি প্রবাসে আমার দৈহিক, মানসিক, আর্থিক এবং দ্বীনি নিরাপত্তা রক্ষা করো। আর তোমার পবিত্র খানায়ে কা'বা ও হযরত রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাক রওজাহ্ আমার যিয়ারত নছীব করো। হে মাবুদ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট থেকে, দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করা হতে। পরিবার-পরিজন, ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততিকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা থেকে তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করো। আমাকে ও তাদেরকে তোমার নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করো না এবং আমার ও তাদের উপর তোমার প্রদত্ত আরাম ও শান্তি অক্ষুণ্ন রেখ।

৪। গৃহের দরজার নিকটবর্তী হয়ে এরূপ মুনাজাত করবেন ঃ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ،
أَوْ أَذِلَّ أَوْ أُذَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ
لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً ، بَلْ خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِكَ وَقَضَاءِ فَرْضِكَ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ

“আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহ্ ব্যতীত কারও কোন শক্তি বা সামর্থ্য নেই। হে মাবুদ! যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই বা কাউকে পথভ্রষ্ট না করি। যেন আমি পদস্খলিত না হই বা কারও পদস্খলন না করি, যেন আমি অত্যাচারিত না হই বা কাউকে অত্যাচার না করি। যেন আমি কারও মূর্খতার শিকার না হই বা আমিও কারও প্রতি মূর্খতাসুলভ আচরণ না করি। হে মাবুদ! আমার বের হওয়ার উদ্দেশ্য যেন রিয়া, অহঙ্কার এবং সু-খ্যাতি অর্জন না হয় বরং তোমার সন্তুষ্টি লাভ, অসন্তুষ্টির ভীতি, তোমার নির্দেশ পালন, তোমার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নত আদায় এবং তোমার দীদার হাছিল উদ্দেশ্য হয়।

পথচলা কালে প্রার্থনা করবেন–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِيْ وَأَنْتَ رَجَائِيْ ، فَاكْفِنِيْ مَا أَهَمَّنِيْ وَمَا لَا أَهْتَمُّ بِهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ ، عَزَّ جَارُكَ
وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ ، اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوٰى وَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَجِّهْنِيْ لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ

“হে মাবুদ! আমি তোমারই সাহায্যে চলেছি, তোমারই উপর নির্ভর করছি, আমি তোমাকেই আঁকড়ে ধরেছি। তুমিই আমার আশা ও ভরসা। অতএব তুমি আমাকে হেফাজাত করো তা থেকে, যা চলার পথে আমার সামনে আসে আর যে ব্যাপারে আমি পূর্ণ অক্ষম এবং যে বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা বরং তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক অবগত। হে মাবুদ! তোমার গুণাবলীর প্রশংসা মহান। তুমি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই। হে মাবুদ! তোমার ভীতিকে আমার পাথেয় কর। আমার গুনাহ মার্জনা কর। আর আমি যেখানেই যাই, ভালাই আমার সঙ্গী করো।

৫। যানবাহনে আরোহণ কালে প্রার্থনা করবেন–

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ،
مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ،
وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ كُلَّهُ إِلَيْكَ
وَتَوَكَّلْتُ فِيْ جَمِيْعِ أُمُوْرِيْ عَلَيْكَ ، أَنْتَ حَسْبِيْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"বিসমিল্লাহি অ বিল্লাহি অল্লাহু আকবারু তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি অ লাহাওলা অ লা ক্বওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীমি মা শাআল্লাহু কানা অমা লাম ইয়াশাউ লাম ইয়াকুন সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খরা লানা হাযা অ মা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন অ ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবুন, আল্লাহুম্মা ইন্নী অজ্জাহতু অজহিয়া ইলাইকা অ ফাওয়াদ্বতু আমরী কুল্লাহু ইলাইকা অ তাওয়ক্কালতু ফী জামীই উমূরী আলাইকা আনতা হাসবী অ নি'মাল অকীল।

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র সাথে এবং আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহ মহান। আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করছি। সুউচ্চ মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারও শক্তি ও সামর্থ্য নেই। আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়ে যায়। আর তিনি যা চান না তা' হয় না। তিনি পবিত্র, তিনি এ (বাহন)-কে আমাদের আয়ত্ত করে দিয়েছেন। আমরা একে আয়ত্ত করতে সক্ষম হতাম না। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করব। হে মাবুদ! আমি তোমার দিকে মুখ ফিরিয়েছি। আমার সমস্ত বিষয় তোমাকে সঁপে দিয়েছি। তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কাজ আঞ্জামকারী। বাহনের উপর সুস্থির ভাবে আসন গ্রহণের পর সাত বার পড়বে– "সুবহানাল্লাহি অলহামদু লিল্লাহি অ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার" অর্থাৎ আল্লাহ পবিত্র, সব প্রশংসা আল্লাহতা'য়ালার। আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপাস্য নেই। আল্লাহ্ মহান। আরও পড়বে– "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে এ পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি পথ না দেখালে আমরা পথের সন্ধান পেতাম না। হে মাবুদ! তুমিই বাহনে আরোহণ করিয়েছ। আর সকল ব্যাপারে তোমার নিকটই সাহায্য চাওয়া হয়।

৬। যানবাহন থেকে অবতরণের কালে বা কোন মনযিল নয়ন গোচর হলে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করবেন–

اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن،
ورب الرياح وما ذرين، ورب البحار وما جرين، أسألك خير هذا المنزل وخير أهله، وأعوذ
بك من شره وشر ما فيه، اصرف عني شر شرارهم،

"হে মাবুদ! সাত আসমান এবং সেই সব বস্তুর, যেগুলোর উপর সাত আসমানের ছাঁয়া প্রতিফলিত হয়; এবং প্রতিপালক সপ্ত তবক জমিনের এবং সেই বস্তুর যাদেরকে সপ্তস্তর জমিন বহন করছে এবং প্রতিপালক শয়তানের এবং তাদের, যাদেরকে শয়তান পথভ্রষ্ট করেছে এবং প্রতিপালক বায়ুর এবং সেই সব বস্তুর, যেগুলোকে বাতাস উড়িয়ে নেয় এবং প্রতিপালক সাগরের এবং সেই সব বস্তুর, যেগুলোকে সাগর বয়ে নিয়ে যায়, আমি তোমার সকাশে এই মনযিলের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এর অধিবাসীদেরও হিত কামনা করছি। হে মাবুদ! আমি তোমার নিকট এই মনযিলের অকল্যাণ থেকে ও মনযিলের সব কিছুর অকল্যাণ থেকে পানাহ্ চাচ্ছি। তার মধ্যে যা কিছু ক্ষতিকর এবং

অকল্যাণকর আছে, তা' সব আমার থেকে দূর করে দাও। মনযিলে পৌঁছে তথায় অবতরণ করে দু'রাকাত নামায পড়বেন। তারপর এ দোয়াটি পাঠ করবেন।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকালিমাতিল্লাতি তাম্মাতিল্লাতী লা ইয়ুজাওয়িয়ু হুন্না বাররুন অলা ফাজিরুম মিন শাররি মা খুলিক্বা।"

অর্থাৎ "হে মাবুদ! আমি আল্লাহর পূর্ণ কালেমার দ্বারা–যা কোন সৎ ও অসৎ অতিক্রম করতে পারে না–সৃষ্টির ক্ষতি-লোকসান থেকে পানাহ্ চাচ্ছি।

রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলে পড়বেন– "হে দুনিয়া! আমার প্রভু ও তোমার প্রভু আল্লাহ্ তা'য়ালা। আমি আল্লাহ্র দরবারে তোমার ও তোমার মধ্যকার সবকিছু থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আর তোমার উপর যা বিচরণ করছে, তা' থেকেও আমি পানাহ্ চাচ্ছি আল্লাহ্র কাছে প্রত্যেক হিংস্র জন্তু, সাপ, অজগর এবং বিচ্ছুর অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।

৭। পথ চলার সময় সতর্ক থাকবেন। কাফেলা থেকে আলাদা হবেন না। মাল-সামানের দিকে খেয়াল রাখবেন। শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য আয়াতুল কুরসী, কালেমায় শাহাদাত, সূরা ইখলাছ এবং সূরা ফালাক, সূরা নাস পাঠ করবেন। সবশেষে আল্লাহর কাছে এইরূপ দোয়া করবেন–

بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، حَسْبِيَ اللهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، مَا شَاءَ اللهُ لَا يَأْتِي بِالْخَيْرِ إِلَّا اللهُ ، مَا شَاءَ اللهُ لَا يَصْرِفُ السُّوْءَ إِلَّا اللهُ ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفٰى ، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا ، لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مُنْتَهٰى وَلَا دُوْنَ اللهِ مَلْجَأٌ ، كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ، تَحَصَّنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ ، وَاسْتَعَنْتُ بِالْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ ، اَللّٰهُمَّ احْرُسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ ، وَاكْنُفْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا فَلَا نَهْلِكُ وَأَنْتَ ثِقَتُنَا وَرَجَاؤُنَا ، اَللّٰهُمَّ أَعْطِفْ عَلَيْنَا قُلُوْبَ عِبَادِكَ وَإِمَائِكَ بِرَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

"আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ্ যা চান, তাই হবে। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও কোন শক্তি বা সামর্থ্য নেই। আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আমি আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করলাম। আল্লাহ যা চান, তাই হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও মঙ্গল করার সাধ্য নেই। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও মন্দ দূর করার সাধ্য নেই। তাই আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহ্র দরবারে, যাঁর কোন দিন সমাপ্তি নেই, যাঁর কোন দিনই মৃত্যু হবে না। হে মাবুদ! তুমি তোমার এমন চোখের দৃষ্টি দ্বারা আমাদের খবর রাখ যে চোখ কখনও নিদ্রাভিভূত বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় না। হে মাবুদ! তুমি আমাদেরকে তোমার এমন কুদরত দ্বারা আশ্রয় দান কর, যার কোন তুলনা নেই। তুমিই আমার নির্ভর এবং আশ্রয়স্থল। হে মাবুদ! তুমি অনুগ্রহপূর্বক তোমার বান্দাদের দিল, দয়া ও সহানুভূতি আমার দিকে ফিরিয়ে দাও। নিশ্চয়ই তুমি পরম করুণাময়।

৮। পথিমধ্যে কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করলে তিনবার আল্লাহু আকবার বলে এ দোয়া পড়বেন–

"আল্লাহুম্মা লাকাশ্ শারফু আ'লা কুল্লি শারফিন অ লাকাল হামুদ আলা কুল্লি হাল"

অর্থাৎ "হে মাবুদ! সব গৌরবের উপরে তোমার গৌরব এবং তোমার প্রশংসা সর্বস্থলে।" যখন কোন নিম্নভূমিতে অবতরণ করবেন, তখন "সুবহানাল্লাহ্" পাঠ করবেন। যখন সফরে কোনরূপ ভয়ভীতির সঞ্চার হবে, তখন এই দোয়াটি পড়বেন–

"সুবহানাল্লাহিল মালিকিল কুদ্দুসি রাব্বিল মালায়িকাতি অর রূহি জাল্লালাতিস সামাওয়াতি বিল ইয্যাতি অল জাবারূতি।"

অর্থাৎ "মহান বাদশাহ্ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি ফেরেশতাকুল এবং জিব্রাঈলের প্রতিপালক। যার ইয্যত এবং প্রতাপে আকাশমন্ডলী সমাচ্ছন্ন।"

মীকাত থেকে মক্কা শরীফ ঃ

মীকাত (ইহরাম বাঁধার স্থান) **হতে মক্কা মুয়ায্যামায় প্রবেশ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ)টি করণীয় কাজ ঃ**

১। মীকাতে পৌঁছার পর ইহরামের নিয়তে গোসল করবেন। শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে পরিষ্কার করবেন। হাত পায়ের নখ কর্তন করবেন। গোঁফ কর্তন করবেন, চুল ও দাঁড়িতে চিরুনী করবেন।

২। একটি সেলাই বিহীন সাদা লুঙ্গী ও একটি সাদা চাদর পরিধান করবেন। আল্লাহর দরবারে সাদা পোশাকই অধিক প্রিয় এবং পছন্দনীয়। শরীরে ও পরিধেয় কাপড়ে সুগন্ধি লাগাবেন। ইহরামের পরেও সুগন্ধির গুণ থেকে গেলে তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাথার সিঁথিতে মিশকের স্পষ্ট নিদর্শন ইহরামের পরেও দেখা গেছে। তিনি তা ইহরামের পূর্বে ব্যবহার করেছিলেন।

৩। যে হজ্জ করবেন বা উমরা আদায় করবেন তার নিয়ত করে তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন। "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাশারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা অন্নি'মাতা লাকা অল মুলকা লা শারীকা লাকা" অর্থাৎ "আমি হাজির আছি হে মাবুদ! আমি হাজির আছি! প্রশংসা, নিয়ামত তোমারই, হুকুমত তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই"।

যদি এর চেয়ে আরও বেশী কিছু বলতে ইচ্ছে হয়, তাহলে বলবেন ঃ– "আমি হাজির আছি, আমি তৎপর রয়েছি হে মাবুদ! কল্যাণ সব তোমারই আয়ত্তে। আমার দেহ তোমার প্রতি। আমি হাজির আছি হজ্জের জন্য, মূলতঃ ইবাদত এবং গোলামীর জন্য। মাবুদ! হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বংশধরদের প্রতি রহমত প্রেরণ কর"।

৪। লাব্বাইকা বলে ইহরাম বাঁধার পর নিম্নরূপ পাঠ করা উত্তম–

اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني ، اللهم إني نويت أداء فريضتك في
الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك ، واجعلني من وفدك الذين رضيت
عنهم وارتضيت وقبلت منهم ، اللهم فيسر لي أداء ما نويت من الحج ، اللهم قد أحرم لك
لحمي وشعري ودمي وعصبي ومخي وعظامي ، وحرمت على نفسي النساء والطيب ولبس
المخيط ابتغاء وجهك والدار الآخرة

"হে মাবুদ! আমি হজ্জ আদায় করার ইচ্ছে করছি। অতএব, আমার জন্য তুমি তা সহজ করে দাও। এর ফরজ (কর্তব্য) সমূহ আদায়ে আমাকে সাহায্য কর এবং আমার হজ্জকে কবুল কর।

হে মাবুদ! আমি হজ্জে তোমার ফরজ আদায় করার নিয়ত করছি। অতএব, তুমি আমাকে তাদের শামিল কর যারা তোমার আদেশে সাড়া দিয়েছে, তোমার প্রতিশ্রুতিতে আস্থা এনেছে এবং তোমার নির্দেশের অনুবর্তী হয়েছে। আমাকে তুমি তোমার সেই মেহমানদের শামিল কর, যাদের উপর তুমি খুশী ও আনন্দিত এবং যাদের হজ্জ তুমি কবুল করেছ। হে মাবুদ! আমার নিয়তকৃত হজ্জ তুমি আমার প্রতি সহজসাধ্য কর। হে মাবুদ! তোমার জন্য আমার মাংস, আমার চুল, আমার রক্ত, শিরা, উপশিরা, মগজ, অস্থি প্রভৃতি ইহরাম বেঁধেছে। অতএব আমি শুধু তোমারই জন্য নিজের উপর রমণী, সুগন্ধি, সেলাইকৃত পোশাক পরিচ্ছদ হারাম করেছি।"

৫। ইহরাম বহাল থাকার জন্য কিছুক্ষণ পরে পরে লাব্বাইকা বলা মুস্তাহাব। বিশেষ করে উঁচু জমিনে ওঠার সময়ে এবং নিম্ন জমিনে অবতরণের সময়ে আর বাহনে উঠা নামার সময়ে লাব্বাইকা পাঠ করবেন। খুব উচ্চ কণ্ঠে বা গলা ফাটিয়ে তা বলা দরকার নেই। কেননা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তায়ালাকে শুনানো। তিনি অন্ধ বা দূরে অবস্থানকারী নন যে, চিৎকার করে তাঁকে শোনাতে হবে। এ বিষয়ে হাদীসেও বর্ণিত রয়েছে। তবে মসজিদে হারাম, মসজিদে খায়েফ এবং মসজিদে মীকাতে উচ্চঃস্বরে লাব্বাইকা বলায় কোন দোষ নেই। উক্ত তিনটি মসজিদই হজ্জের রোকন আদায় করার স্থান। এছাড়া অন্যান্য মসজিদে অনুচ্চ শব্দে লাব্বাইকা বলায় কোন দোষের কারণ নেই।

মক্কা শরীফ প্রবেশ ঃ

মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রবেশ থেকে তাওয়াফ পর্যন্ত ৬টি করণীয় কাজ। যথা–

১। মক্কায় প্রবেশ কালে (যি-তুয়ায়) গোসল করবেন।

২। মক্কার বাইরে যখন হরমের সীমায় প্রবেশ করবেন তখন এই দোয়াটি পাঠ করবেন –

اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُكَ وَأَمْنُكَ فَحَرِّمْ لَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ، وَآمِنِّي مِنْ
عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ

"আল্লাহুম্মা হাযা হারামুকা অ আমানুকা ফাহার্‌রিম লাহমী অ দামী অ শা'রী অ বাশারী আলান্নারি অ আমনী মিন আযাবিকা ইয়াওমা তুবআছু ইবাদাকা অজআ'লনী মিন আউলিয়ায়িকা অ আহলি ত্বাআতিকা"।

অর্থাৎ "হে মাবুদ! এটা তোমার হরম এবং আশ্রয় স্থল। সুতরাং আমার মাংস, রক্ত এবং চর্ম দোযখের জন্য হারাম কর। পুনরুত্থানের দিন আমাকে আযাব থেকে নিরাপদ রাখ এবং আমাকে তোমার বাধ্য ও আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত কর।"

৩। মক্কা মুয়াজ্জামায় 'ছানিয়াতে কুদা' অর্থাৎ কুদা গিরিপথ দিয়ে প্রবেশ করবেন। কেননা হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে পথ দিয়েই যেতেন; সুতরাং এ পথ দিয়ে প্রবেশ করাই উত্তম। মক্কা থেকে বের হওয়ার সময়ও ঐ পথ দিয়ে বের হবেন। এ পথটি কিছুটা নীচু ও প্রশস্ত।

৪। মক্কায় প্রবেশ করে বনি জুমাহের নিকটবর্তী হলে কা'বা গৃহ নজরে আসবে। তখন এ দোয়াটি পাঠ করবেন–

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَدَارُكَ دَارُ السَّلَامِ، تَبَارَكْتَ
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا بَيْتُكَ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ، اللَّهُمَّ فَزِدْهُ تَعْظِيمًا
وَزِدْهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا، وَزِدْهُ مَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ بِرًّا وَكَرَامَةً، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
وَأَدْخِلْنِي جَنَّتَكَ، وَأَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু অ মিনকাস সালামু অ দারাকা দারাস্ সালামু তাবারাক্‌তা ইয়া যাল-জালালি অল ইকরাম। আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা বাইতুকা আজ্জাম্‌তাহু অ কাররামতাহু অ শাররাফ্‌তাহু আল্লাহুম্মা ফাযিদহু তাজীমাও অ যিদহু তাশরীফা ও অ তাকরীমাও অ যিদহু মুহাব্বাতাও অ যিদহু মিনহাজ্জিহি বিররাও অ কারামাতান্ আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা আদখিলনী জান্নাতাকা অ আইযনী মিনাশ শাইতোয়ানির রাজীম।"

অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ মহান। হে মাবুদ! তুমি শান্তি এবং তোমার থেকেই শান্তি। তোমার গৃহ শান্তির গৃহ। তুমি বরকতময়। হে গৌরবময়, সম্মানিত, হে মাবুদ! ঐ তোমার গৃহ। এই ঘরকে তুমি মহত্ব দিয়েছ। সম্মানিত করেছ, গৌরব দিয়েছ। তুমি তার মহত্ব, সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি কর। আর বৃদ্ধি কর ভয়-ভীতি, যে এ গৃহের হজ্জ করেছে, তার সততা ও সম্মান বৃদ্ধি কর। হে মাবুদ! তোমার রহমতের দরজা

আমার জন্য উন্মুক্ত কর। আমাকে তোমার বেহেশতে প্রবেশ করাও আর আমাকে তোমার বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দান কর।”

৫। যখন খানায় কা’বার মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন, বনি শায়বার দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন। তখন এ দোয়াটি পাঠ করবেন–

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَمِنَ اللهِ وَاِلَى اللهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“বিসমিল্লাহি অ বিল্লাহি অ মিনাল্লাহি অ ইলাল্লাহি অ ফী সাবীলিল্লাহি অ আ’লা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম।” অর্থাৎ “আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাথে, আল্লাহ থেকে, আল্লাহর দিকে এবং আল্লাহর পথে হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নীতি অনুযায়ী।”

যখন কা’বার নিকটবর্তী হবেন, তখন এ দোয়াটি পড়বেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
خَلِيْلِكَ وَعَلٰى جَمِيْعِ اَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ

“আলহামদু লিল্লাহি অ সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনাছতাফা, আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আব্‌দিকা অ রাসূলিকা অ আলা ইব্রাহীমা খালীলিকা অ আলা জামীই আমবিয়ায়িকা অ রাসূলিকা।”

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, সালাম তাঁর মনোনীত বান্দার প্রতি। হে মাবুদ! তুমি রহমত প্রেরণ কর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি, যিনি তোমার বান্দা ও রাসূল এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রতি, যিনি তোমার খলীল; এবং তোমার সমস্ত নবী ও রাসূলের প্রতি।

অতঃপর দু’হাত তুলে এ দোয়াটি পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا فِيْ اَوَّلِ مَنَاسِكِيْ اَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِيْ وَاَنْ تَتَجَاوَزَ عَنْ خَطِيْئَتِيْ وَتَضَعَ عَنِّيْ وِزْرِيْ ،
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَلَّغَنِيْ بَيْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِيْ جَعَلَهُ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ، وَجَعَلَهُ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ
وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ ، وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ ، وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ ، جِئْتُكَ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَاَسْاَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّ
الْخَائِفِ مِنْ عُقُوْبَتِكَ ، الرَّاجِيْ لِرَحْمَتِكَ ، الطَّالِبِ مَرْضَاتَكَ

“আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা ফী মাক্বামী হাযা ফী আউয়্যালি মানাসিকি আইয়্যাতাক্বাব্বালা তাওবাতী অআন তাতাজাওয়ায আন খাত্বীয়াতী অ তাদাউ আন্নী বিয্‌রী আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বাল্লাগানী বাইতাল হারামাল্লাযী জাআলাহু মাছাবাতাল্লিন্নাস অ আমনা ও জাআ’লাহু মুবারাকাও অ হুদাল্লিল আ’লামীন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আবদুকা অল বালাদু বালাদুকা অ হারামু হারামুকা অলবাইতু বাইতুকা জি’তুকা

আত্বলুবু রাহমাতাকা অ আসয়ালুকা মাসয়ালাতাল মুজত্বাররিল খায়িফি মিন্ উক্বাতিকার রাজী লিরাহমাতিকা আত্তালিবু মারদ্বাতিকা"।

অর্থাৎ "হে মাবুদ! আমি তোমার নিকট এই স্থানে আমার হজ্জের প্রথম অনুষ্ঠানে এই প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার তওবা কবুল কর, আমার ত্রুটি মার্জনা কর, আমার গুনাহ্র বোঝা লাঘব কর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি তাঁর পবিত্র গৃহে আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন, যে ঘরকে তিনি মানুষের জন্য করেছেন আশ্রয় স্থল, প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র, আরও করেছেন এ ঘরকে বরকতময় ও সারা বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক।

হে মাবুদ! আমি তোমার বান্দা, এ শহর তোমার শহর, এ হরম তোমার হরম, এ গৃহ তোমার গৃহ। আমি তোমার রহমত তলবের আশায় উপস্থিত হয়েছি। আমি একান্ত অক্ষমের ন্যায় তোমার শাস্তির ভয়ে ভীত ব্যক্তির ন্যায়, তোমার করুণাপ্রার্থীর ন্যায়, তোমার সন্তুষ্টি কামনাকারীর ন্যায় তোমার সকাশে প্রার্থনা করছি।"

৬। অতঃপর কাল পাথরের (হাজরে আসওয়াদ) নিকট গিয়ে ডান হাত দিয়ে তা' স্পর্শ করবেন ও তা' চুম্বন করবেন। এ সময় নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবেন–

"আল্লাহুম্মা আমানাতী আদ্দাইতুহা অ মীছাক্বী ওয়াফ্ফাইতুহু অ আশহাদ লী বিল মুওয়াফাতি"।

অর্থাৎ "হে মাবুদ! আমি আমার আমানত প্রত্যর্পণ করলাম ও আমার ওয়াদাহ পূরণ করলাম। তুমি আমার এ ওয়াদাহ পূরণ করণের সাক্ষী থাক।" চুম্বন করা সম্ভব না হলে পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়াটিই পাঠ করবেন। তারপর তাওয়াফ আরম্ভ করবেন ও তাওয়াফ ছাড়া অন্য কোন কিছুর দিকে মনোনিবেশ করবেন না। এ হল তাওয়াফে কুদুম বা প্রাথমিক তাওয়াফ। এ সময় ফরজ নামাযের জামাত হতে থাকলে নিজেও নামাযে শরীক হবেন। নামায শেষে তাওয়াফের বাকী চক্কর শেষ করবেন।

"এহইয়াউ উলুমিদ্দীন"-এর আলোকে তাওয়াফ

তাওয়াফ করতে ৬টি নিয়ম পালন করতে হয়। যথা–

১। তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে নামাযের শর্ত সমূহ আদায় করবেন। অর্থাৎ অজু (ও প্রয়োজনে গোসল) করে শরীর পাক করতে হবে। সতর ঢাকতে হবে। তাওয়াফের স্থানও পাক হতে হবে। কেননা তাওয়াফও নামাযের অনুরূপ। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, নামাযের মধ্যে কথা বলার অনুমতি নেই কিন্তু তাওয়াফের মধ্যে তার অনুমতি রয়েছে। তাওয়াফের শুরু থেকে লাব্বাইকা বলা বন্ধ রেখে নির্দিষ্ট দোয়াগুলো পাঠ করবেন।

২। চাঁদর ঠিকভাবে শরীরে জড়িয়ে বাইতুল্লাহ শরীফ সামনে রেখে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে আপনার ডান কাঁধ শেষেই হাজরে আসওয়াদ। এরপর তাওয়াফের নিয়ত করবেন –

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّيْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফা বাইতিকাল্ হারামি ফাইয়াসসিরহু লী ওয়াতাক্বাব্বালহু মিননী।"

"হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্র ঘর তাওয়াফ করার নিয়ত করছি, এটা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল কর।"

৩। তাওয়াফ শুরুকালীন কাল পাথর অতিক্রম করার পূর্বে এই দোয়া পাঠ করবেন–

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ ،
وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবারু আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা অ তাছদীক্বাম বিকিতাবিকা অ অফায়াম বি আহাদিকা অ ইত্তিবাআ'ল লিসসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম।"

অর্থাৎ "আল্লাহর নামে, আল্লাহ মহান। হে মাবুদ! আমি এই তাওয়াফ করছি তোমার প্রতি আস্থা স্থাপনপূর্বক, তোমার কিতাবের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক। তোমার নিকট প্রদত্ত ওয়াদা রক্ষাপূর্বক এবং তোমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রীতি অনুসরণপূর্বক।"

তাওয়াফ শুরু করে কালো পাথর অতিক্রম করে কা'বা গৃহের দরজা সোজা গিয়েই পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ ، وَهٰذَا الْحَرَمُ حَرَمُكَ ، وَهٰذَا الْأَمْنُ أَمْنُكَ ، وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ

"আল্লাহুম্মা হাযাল বাইতু বাইতুকা অ হাযাল হারামু হারামুকা অ হাযাল আম্‌নু আমানুকা অ হাযা মাক্বামুল আয়িযি বিকা মিনান্নার।"

অর্থাৎ হে মাবুদ! এ ঘর তোমার ঘর, এ হারাম তোমার হারাম, এ নিরাপদ স্থান তোমার নিরাপদ স্থান। এ স্থান দোযখ থেকে তোমার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনাকারীর নিরাপদ স্থান।"

স্থানের কথা বলার সময়ে চোখে মাকামে ইব্রাহীমের দিকে ইশারা করবেন। এ সময় পাঠ করবেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَّوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَّاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَاَعِذْنِيْ مِنَ النَّارِ ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، وَحَرِّمْ لَحْمِيْ وَدَمِيْ عَلَى النَّارِ ، وَاٰمِنِّيْ مِنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَاكْفِنِيْ مُؤْنَةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

"আল্লাহুম্মা ইন্না বাইতাকা আজীমুন অ অজহুকা কারীমুন অ আনতা আরহামুর রাহিমীনা ফাআয়ীয্‌নী মিনান্নারি অ মিনাশ শাইত্বোয়ানিররাজীমি অহাররিম লাহমী অ দামী আল্লান্নারি অ আমনী মিন আহওয়ালি ইয়াওমাল্ ক্বিয়ামাতি অ আকফিনী মুআফাতাদ্দুনইয়া অল আখিরাতি।"

অর্থাৎ "হে মাবুদ! তোমার গৃহ গৌরবময়, তোমার সত্ত্বা কৃপাময়, তুমি শ্রেষ্ঠ করুণাময়। দোযখের আগুন এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে আশ্রয় দান কর। তুমি আমার মাংস ও রক্ত দোযখের উপর হারাম কর। আমাকে রোজ কিয়ামতের ভীতি ও ত্রাস থেকে বাঁচিয়ে রাখ, দুনিয়া ও আখেরাতের ক্লেশ ও মুছীবত থেকে রক্ষা কর।"

তারপর সুবহানাল্লাহি ও আলহামুলিল্লাহ পাঠ করতে করতে রুকনে ইরাকীতে পৌঁছে এই দোয়াটি পড়বেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالشَّكِّ ، وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ ، وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাশশিরকি অশশাককি অল কুফরি অননিফাকি অশশিক্বাক্বী অ সুয়িল আখলাক্বি অ সুয়িল মানজারি ফিল আহলি অল মালি অল অলাদি।"

অর্থাৎ হে মাবুদ! আমি শিরক, সন্দেহ, কুফরী নিফাক দ্বেষ-বিদ্বেষ, কু-স্বভাব এবং পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কু-দৃশ্য থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অতঃপর মীজাবে পৌঁছে পড়বেন—

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنَا تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ ، اَللّٰهُمَّ اسْقِنِيْ بِكَاْسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لَا اَظْمَاُ بَعْدَهَا اَبَدًا

"আল্লাহুম্মা আজিল্লানা তাহতা আরশিকা ইয়াওমা লা জিল্লা ইল্লা জিল্লুকা। আল্লাহুম্মা আসক্বিনী বিকা'সি মুহাম্মাদিন্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম শারবাতান লা আজমায়ু বা'দাহা আবাদান।"

অর্থাৎ "হে মাবুদ! আমাকে তোমার আরশের ছায়ায় স্থান দান কর। যে দিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। হে মাবুদ! আমাকে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাক পেয়ালা হতে পানীয় পান করতে দিও। যাতে আমার পিপাসা স্থায়ী ভাবে নিবৃত হয়।"

অতঃপর রুকনী শামীর নিকট পৌঁছে এ দোয়াটি পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا ، وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا ، وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا ، وَتِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ ،
يَا عَزِيْزُ يَا غَفُوْرُ ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"আল্লাহুম্মাজআলহু হাজ্জাম্ মাররুরাও অসা'ইআম্ মাশকূরাও অ যামবাম মাগফূরা অতিজারাতান্ লান তাবূরু ইয়া আযীযু ইয়া গাফুরু রাব্বিগফির্ অরহাম অ তাজাওয়্যাযা আম্মা তা'লামু ইন্নাকা আনতাল্ আআযযুল্ আকরামু।"

অর্থাৎ "হে মাবুদ! তুমি একে মকবুল হজ্জে পরিণত কর। পরিশ্রম (সায়ী) কে সফল কর। গুনাহ ক্ষমা কর। এ ব্যবসাকে স্থায়ী ও লাভবান কর। হে মহা প্রতাপশালী! তুমি আমাকে ক্ষমা ও রহম কর। তুমি আমার যে গুনাহর বিষয় জান তা' মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি মহান সম্মানিত।"

অতঃপর রুকনে ইয়ামেনীর নিকট পৌঁছে এ দোয়াটি পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ
فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ কুফরি অ আউযুবিকা মিনাল ফাক্বরি অ মিন্ আযাবিল্ ক্বাবরি অ মিন ফিত্‌নাতিল্ মাহ্‌ইয়া অল মামাতি অ আউযুবিকা মিনাল্ খিয্‌ইয়ি ফিদ্দুন্‌ইয়া অল আখিরাতি।"

অর্থাৎ "হে মাবুদ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফর থেকে, আরও আশ্রয় চাচ্ছি দারিদ্র্য থেকে এবং কবর আযাব থেকে, জীবন-মরণের বালা মুছীবত থেকে এবং আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা থেকে।"

অতঃপর রুকনে ইয়ামেনী ও কালো পাথরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي لْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا بِرَحْمَتِكَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

"আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাসানাতাও অফিল্ আখিরাতি হাসানাতাও অক্বিনা বিরাহমাতিকা ফিতনাতিল্ ক্বাব্‌রি অ আযাবি ন্নারি।"

অর্থাৎ "হে মাবুদ! হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর। তুমি নিজ রহমত গুণে আমাদেরকে মুছীবত ও দোযখের আগুনের আযাব থেকে নিরাপদ রাখ।"

অতঃপর যখন কালো পাথরের নিকট পৌঁছবেন, তখন এ দোয়াটি পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ بِرَحْمَتِكَ ، أَعُوْذُ بِرَبِّ هٰذَا الْحَجَرِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ ، وَضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

"আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী বিরাহ্মাতিকা আউযু বিরাব্বি হাযাল্ হাজরি মিনাদ্দাইনি অল ফাক্বরি অ দ্বাইক্বিছ ছাদ্‌রি অ আযাবিল ক্বাবরি।"

অর্থাঃ "হে মাবুদ! তোমার করুণায় আমাকে ক্ষমা কর। এই পাথরের প্রভুর নিকট আমার ঋণ, দারিদ্র্য, বক্ষের সংকীর্ণতা এবং কবর আযাব থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি।"

এখানে পৌঁছে তাওয়াফের এক চক্কর শেষ হয়ে যাবে। এভাবে সাত চক্কর শেষ করবেন। প্রত্যেক চক্করে উল্লিখিত রূপে দোয়া পাঠ করবেন।

৪। প্রথম তিন চক্করে রমল করবেন। শেষ চার চক্করে মধ্যমাবস্থায় হাঁটবেন। অধীক ভীড়ের কারণে যদি কাবা ঘরের নিকট দিয়ে তাওয়াফ করা না যায় তবে দূর থেকে তাওয়াফ করবেন। ইহাই উত্তম। রমল করা কা'বা গৃহের সন্নিকটেই উত্তম। তবে বেশী ভীড়ের কারণে তা' সম্ভব না হলে দূরত্বে থেকেই রমল করবেন। তিন চক্কর রমল করার পর কা'বার সন্নিকটবর্তী লোকদের ভীড়ে মিশে গিয়ে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে বাকী চার চক্কর আদায় করবেন। প্রতি চক্করে কালো পাথরকে চুম্বন করা উত্তম। তবে অধিক ভীড়ের কারণে তা' সম্ভব না হলে ডান হাতে কালো পাথরের দিকে ইশারা করে ঐ হাত চুম্বন করবেন।

একইভাবে রুকনে ইয়ামনীকে চুম্বন করাও মুস্তাহাব। হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা' করতেন এবং স্বীয় কপোল (গাল) দেশ তার উপর চেপে ধরতেন। তবে মূলতঃ কালো পাথর চুম্বন করা ও রুকনে ইয়ামনীকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করাই সর্বোত্তম। কেননা এ বর্ণনাই সমধিক প্রসিদ্ধ।

৫। তাওয়াফের সাতটি চক্কর শেষ হয়ে গেলে মুলতাজামে আসবেন। এ হল কা'বা গৃহের দরজা। এ স্থানে দোয়া কবুল হয়। এখানে এসে কা'বার পর্দা ধরে কা'বার প্রাচীর ঘেষে দাঁড়াবেন। নিজের পেটকে প্রাচীরের সাথে মিলিয়ে দেবেন এবং ডান কপোল (গাল) প্রাচীরে চেপে ধরবেন আর হাত ও হাতের তালু খোলাভাবে প্রাচীরে স্থাপনপূর্বক ললাট (কপাল) তার মধ্যে রাখবেন। এ সময়ে এ দোয়াটি পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ أَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ وَأَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ؛ وَأَعِذْنِيْ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ ؛ وَقَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا آتَيْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ ؛ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ ؛ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ؛ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ أَكْرَمَ وَفْدِكَ عَلَيْكَ

"আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বাল্ বাইতিল্ আতীক্বি আঅ্'তিক্ব রাক্বাবাতি মিনান্নারি অ আইজনী মিনাশ্ শাইত্বোয়ানির্ রাজীমি, অ আইয্নী মিন্ কুল্লি সূয়িন অ ক্বিন্নিনী বিমা রাযাক্বতানী অ বারিকলি ফীমা আতাইতানি, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযাল্ বাইতা বাইতুকা অল আবদু আবদুকা অ হাযা মাক্বামুল আয়িযি বিকা মিনান্নারি, আল্লাহুম্মাজ্আলনী আক্রামা অফ্দিকা আলাইকা।"

অর্থাৎ "হে প্রাচীন গৃহের প্রভু! আমাকে দোযখ থেকে হেফাজাতে রাখ। আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দান কর। আমাকে প্রত্যেক খারাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখ, তোমার প্রদত্ত রিযিকের উপর আমাকে সন্তুষ্ট রাখ এবং আমাকে দেয়া তোমার রিযিকে বরকত দান কর। হে মাবুদ! এ গৃহ তোমারই গৃহ, এ বান্দা তোমারই বান্দা এবং এটা দোযখ থেকে আশ্রয়-প্রার্থীর স্থান। হে মাবুদ! আমাকে তুমি তোমার সকাশে আগমনকারীদের মধ্যে বিশেষ সম্মান দান কর।"

অতঃপর এ স্থানে বেশী করে আল্লাহর গুণগান করবেন। হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও অন্যান্য নবীদের প্রতি দরূদ পেশ করবেন, স্বীয় মনোবাসনার জন্য দোয়া করবেন এবং গুনাহমাফীর জন্য প্রার্থনা করবেন। প্রাচীন কালের বুযর্গগণ এ স্থানে নিজ নিজ খাদেমগণকে বলতেন, তোমরা আমার কাছ থেকে একটু দূরে থাক, আমি এখন আল্লাহর দরবারে নিজের গুনাহর স্বীকারোক্তি পেশ করব।

৬। মুলতাজামের কাজ শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়বেন। এর প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখ্লাছ পাঠ করবে। এটা হল তাওয়াফের পরে দু'রাকাত নামায। হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা-ই করেছেন। উল্লেখ্য যে, এক তাওয়াফে সাতটি চক্কর ঘুরতে হয়। নামায দু'রাকাত আদায় করে এই দোয়াটি পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِيَ الْيُسْرٰى وَجَنِّبْنِي الْعُسْرٰى، وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولٰى، وَاعْصِمْنِي بِأَلْطَافِكَ
حَتّٰى لَا أَعْصِيَكَ، وَأَعِنِّي عَلٰى طَاعَتِكَ بِتَوْفِيقِكَ وَجَنِّبْنِي مَعَاصِيَكَ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ
وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَرُسُلَكَ وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْنِي إِلٰى مَلَائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ
وَإِلٰى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اَللّٰهُمَّ فَكَمَا هَدَيْتَنِي إِلَى الْإِسْلَامِ فَثَبِّتْنِي عَلَيْهِ بِأَلْطَافِكَ وَوِلَايَتِكَ،
وَاسْتَعْمِلْنِي لِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ، وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ

"আল্লাহুম্মা ইয়াস্সির লিল ইয়ুসরা অ জান্নিব্নিল্ উসরা অগ্ফির-লি আখিরাতি অল উলা, অ আ'ছিমনী বি ত্বোয়াফিকা হাত্তা লা উ'ছীকা অ আইন্নী আলা ত্বোয়াআতিকা বি তাওফীক্বিকা অ জান্নিব্নী মাআছিয়াতিকা অজআলনী মিম্মাই ইয়ুহিব্বুকা অ ইয়ুহিব্বু মালায়িকাতিকা অ রাসুলিকা অ ইউহিব্বু ইবাদিকাছ্ ছালিহীন-, আল্লাহুম্মা ফাকামা হাদাইতানী ইলাল ইসলামি ফাছাব্বিতনী আলাইহি বি ত্বোয়াফিকা অ বিলাইয়াতিকা

অসতা'মিলনী লি ত্বোয়াআতিকা অ ত্বোয়াআতি রাসূলিকা অ আজিরনী মিম্মুদ্বিল্লাতিল ফিত্নী।"

অর্থাৎ "হে মাবুদ! আমার জন্য সহজ কাজকে সহজ করে দাও এবং আমাকে কঠিন কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখ। আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা করে দাও। তোমার রহমত দ্বারা আমাকে গুনাহ থেকে রক্ষা কর, যেন আমি তোমার অবাধ্য না হই। তুমি তোমার তাউফীক দ্বারা আমাকে তোমার আনুগত্যের ব্যাপারে সাহায্য কর। আমাকে তোমার নাফরমানী থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তাদের দলভুক্ত কর, যারা তোমাকে, তোমার ফেরেশতাগণকে, তোমার রাসূলগণকে এবং তোমার নেককার বান্দাহগণকে ভালবাসে। হে মাবুদ! আমাকে তোমার ফেরেশতা, রাসূল এবং সৎকর্মশীল বান্দাগণের প্রিয়পাত্র কর। হে মাবুদ! তুমি যেমন আমাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছ তেমন স্বীয় কৃপা ও ক্ষমতার বদৌলতে আমাকে ইসলামের উপর সুস্থির রাখ। হে মাবুদ! তুমি আমার দ্বারা তোমার আনুগত্য এবং রাসূলের আনুগত্যের কাজ আদায় কর আর আমাকে এমন ফেতনা ফাসাদ থেকে নিরাপদ রাখ, যা অপ্রতিরোধ্য।"

এরপর আবার কালো পাথরের (হাজরে আসওয়াদ) কাছে এসে তা' চুম্বন করে তাওয়াফ শেষ করবে।

হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন– সাত চক্করের সাথে কা'বা গৃহ তাওয়াফ করে যে ব্যক্তি দু'রাকাত নামায আদায় করে, সে একটি গোলাম আজাদ করার ছওয়াব লাভ করে। তাওয়াফে নামাযের শর্ত সমূহ ছাড়া আরও ওয়াজিব হল, কা'বার চারপাশে সাত চক্কর দিতে হবে আর তা' কালো পাথর থেকে শুরু করতে হবে এবং মসজিদে হারামের মধ্যে ও কা'বা গৃহের বাইরে এগুলো ছাড়া আনুষঙ্গিক কাজগুলো সবই সুন্নত এবং মুস্তাহাব।

পারিভাষিক শব্দ এবং কতিপয় বিশেষ স্থানের নাম

হজ্জের মাসআলার কোন কোন জিনিসের নাম আরবী ভাষায় রয়েছে এবং বিশেষ পরিভাষা অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ হাজী সাহেবান যারা আরবী জানেন না তারা সেসব হয়তো বুঝতে পারেন না। অতএব যেসকল ক্ষেত্রে সে প্রকার শব্দ আসছে, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তারপরে অধিকতর সহজ করার উদ্দেশ্যে নিম্নে সেই ধরনের শব্দ সমূহের অর্থ স্বতন্ত্রভাবেও বর্ণনা করা হল–

ইহরাম ঃ এর অর্থ হারাম করা। হাজী সাহেবগণ যখন ইহরাম বেঁধে হজ্জ অথবা উমরাহ্ অথবা উভয়টি পালন করার দৃঢ় নিয়তে তালবিয়াহ্ পাঠ করেন, তখন তাদের উপরে কতিপয় হালাল এবং মুবাহ বস্তুও ইহরামের কারণে হারাম হয়ে যায়। এই কারণেই একে ইহরাম বলা হয়। রূপক অর্থে সেই চাদর দুইটিকেও ইহরাম বলা হয়, যা হাজী সাহেবগণ ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করেন।

ইস্তিলাম ঃ এর অর্থ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করা অথবা হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীকে শুধু হাত দ্বারা স্পর্শ করা।

ইযতিবা'অ ঃ এর অর্থ ইহরামের চাদরকে ডান বগলের নীচের দিক হতে পেঁচিয়ে এনে বাম কাঁধের উপরে স্থাপন করা।

আফাকী ঃ যারা মক্কার অধিবাসী নন এমন লোক।

আইয়্যামে তাশরীক ঃ অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ হতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কয়দিন প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে 'তাকবীরে তাশরীক' পাঠ করা হয়।

আইয়্যামে নহর ঃ ১০ই যিলহজ্জ হতে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত কোরবানীর তিন দিন।

এফরাদ ঃ শুধু হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা এবং শুধু হজ্জের ক্রিয়াদি সম্পাদন করা।

ইশআর ঃ কোরবানীর পশুর পরিচয়ের জন্য উহার ডান উরুতে এমন হালকা যখম করে দেওয়া যাতে শুধু চামড়া কাটবে, কিন্তু গোশত অক্ষত থাকবে।

বায়তুল্লাহ ঃ আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা শরীফ।

বাতনে আরানাহ ঃ ইহা আরাফাতের নিকটবর্তী একটি ময়দান। হজ্জের সময় এখানে অবস্থান দুরস্ত নহে। কেননা, এটা আরাফাতের সীমানার বাইরে অবস্থিত।

তাজলীল ঃ কোরবানীর পশু কাপড়াদিতে আচ্ছাদিত করা।

তাসবীহ ঃ 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করা।

তাকলীদ ঃ জুতা অথবা গাছের ছাল ইত্যাদি নির্মিত রশি দ্বারা হারের মত বানিয়ে কোরবানীর পশুর গলায় পরানো।

তাকবীর ঃ 'আল্লাহ আকবার' বলা।

তামাত্তো ঃ হজ্জের মাসসমূহে প্রথমে উমরা পালন করে হালাল হয়ে যাওয়া অতঃপর ঐ বৎসরই হজ্জের জন্য পুনরায় ইহরাম বেঁধে হজ্জ সমাপন করা।

তালবিয়াহ ঃ 'লাব্বাইকা' পুরা পাঠ করা।

তাহলীল ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করা।

জিমার বা জামারত ঃ মিনায় তিনটি স্থানে উঁচু স্তম্ভ নির্মিত রয়েছে। সেখানে রমি বা কংকর নিক্ষেপ করা হয়। এদের মধ্যে যেটি মসজিদে খায়েফের নিকটে পূর্ব দিকে অবস্থিত একে জামারাতুল-উলা বলা হয়। এর পরে যেটি মক্কার দিকে মধ্যস্থলে অবস্থিত একে জামারাতুল-উসতা এবং তারপরেরটিকে জামারাতুল-কুবরা বা জামারাতুল আকাবা অথবা জামারাতুল উখরা বলা হয়।

জাহফাহ ঃ অর্থ মক্কা হতে তিন মনজিল দূরে অবস্থিত রাবেগের নিকটে একটি জায়গা। এটা সিরিয়াবাসী এবং ঐ পথে মক্কা আগমনকারী লোকজনদের মীকাত।

জান্নাতুল মোয়াল্লা ঃ অর্থ মক্কার কবরস্থান।

জাবালে সবীর ঃ মিনার একটি পাহাড়ের নাম।

জাবালে রহমত ঃ আরাফাতের একটি পাহাড়ের নাম।

জাবালে কুযাহ্ ঃ মুযদালিফার একটি পাহাড়ের নাম।

হজ্জ ঃ অর্থ নির্দিষ্ট মাসসমূহে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ, অকুফে আরাফা প্রভৃতি কর্মসমূহ সম্পাদন করা।

হাজরে আসওয়াদ ঃ অর্থ কালো পাথর। এটা বেহেশতের একটি পাথর।

হরম ঃ মক্কা মুকাররমার চারদিকে নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত ভূমিকে 'হরম' বলা হয়। এর সীমানায় চিহ্ন স্থাপিত রয়েছে। হরম সীমানার ভিতরে স্থলজপ্রাণী শিকার করা, বৃক্ষ কর্তন করা, পশুকে ঘাস খাওয়ানো প্রভৃতি হারাম।

হরমী ঃ অর্থ ঐ ব্যক্তি যে হরম সীমার অভ্যন্তরে বসবাস করে। চাই মক্কা শরীফে বাস করুক অথবা মক্কা শরীফের বাইরে হরম সীমার ভিতরে অন্য কোন জায়গায়।

হিল্ল ঃ অর্থ হরম সীমার বাইরে অথচ মীকাতের অভ্যন্তরে যে ভূমি রয়েছে একে 'হিল্ল' বলা হয়। কেননা, এখানে এসব কাজ হালাল, যা হরমের অভ্যন্তরে হারাম।

হিল্লী ঃ অর্থ 'হিল্ল' এলাকায় বসবাসকারী লোকজন।

দম ঃ ইহরামের অবস্থায় কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন করার কারণে বকরী, দুম্বা প্রভৃতি যবেহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তাকে 'দম' বলা হয়।

যুল-হোলায়ফা ঃ মদীনা শরীফ হতে মক্কার পথে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এটা মদীনাবাসী এবং ঐ পথে মক্কা আগমনকারী লোকজনদের মীকাত। একে সাম্প্রতিকালে 'বীরে আলী'ও বলা হয়।

যাতে ইরক ঃ মক্কা শরীফ হতে প্রায় তিন মনযিল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। ইদানিং এটা বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ইরাকবাসী এবং ঐ পথে মক্কা আগমনকারী লোকজনদের মীকাত।

রুকনে ইয়ামানী ঃ অর্থ বায়তুল্লাহ শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। যেহেতু এটি ইয়ামানের দিকে অবস্থিত, তাই একে রুকনে ইয়ামানী বলা হয়।

রুকনে ইরাকী ঃ অর্থ বায়তুল্লাহ শরীফের উত্তর-পূর্ব কোণ– যা ইরাকের দিকে অবস্থিত।

রুকনে শামী ঃ অর্থ বায়তুল্লাহ শরীফের উত্তর পশ্চিম কোণ– যা সিরিয়ার দিকে অবস্থিত।

রমল ঃ অর্থ তাওয়াফের প্রথম তিন প্রদক্ষিণে বীরের ন্যায় বুক ফুলিয়ে, কাঁধ দোলায়ে, বীরত্ব প্রদর্শন করে ছোট ছোট পা ফেলে ঈষৎ দ্রুত গতিতে চলা।

রামি ঃ অর্থ কংকর নিক্ষেপ করা।

যমযম ঃ মসজিদে হারামের ভিতরে বায়তুল্লাহর নিকটে একটি প্রসিদ্ধ ফোয়ারার নাম যা আজকাল কূপের আকারে রয়েছে। এটি আল্লাহ তা'আলা আপন কুদরতে তাঁর প্রিয় নবী হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁর জননী হযরত হাজেরা (আঃ)-এর জন্য প্রবাহিত করেছিলেন।

সাঈ ঃ অর্থ সাফা ও মারওয়া নামক পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার দৌঁড়ান।

শাওত ঃ অর্থ বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসা।

সাফা ঃ অর্থ বায়তুল্লাহর নিকটে দক্ষিণ দিকে একটি ছোট্ট পাহাড়, যা হতে সাঈ আরম্ভ করা হয়।

যাব ঃ অর্থ মিনায় অবস্থিত মসজিদে খায়েফ সংলগ্ন একটি পাহাড়।

তাওয়াফ ঃ অর্থ বিশেষ পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করা।

উমরাহ্ ঃ অর্থ 'হিল্ল' অথবা মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা ও হলক বা কসর করা।

আরাফা বা আরাফাত ঃ মক্কা শরীফ হতে প্রায় ৯ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত একটি ময়দান, যেখানে হাজী সাহেবগণ ৯ই যিলহজ্জ তারিখে হজ্জের উদ্দেশ্যে অকুফ বা অবস্থান করে থাকেন।

ক্বেরান ঃ অর্থ হজ্জ এবং উমরাহ উভয়ের জন্য এক সাথে ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরাহ এবং পরে হজ্জ সমাপন করা।

কারেন ঃ অর্থ যিনি ক্বেরান হজ্জ সমাপন করেন।

করন ঃ মক্কা শরীফ হতে প্রায় ৪২ মাইল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়। এটা নাজদে ইয়ামান, নাজদে হিজায এবং নাজদে তাহামা হতে মক্কা আগমনকারী লোকজনদের মীকাত।

কসর ঃ অর্থ মাথার চুল ছাঁটা বা ছোট করা।

মুহরিম ঃ অর্থ যিনি ইহরাম বেঁধেছেন এমন ব্যক্তি।

মুফরিদ ঃ যিনি শুধু হজ্জ সমাপনের নিয়তে ইহরাম বেঁধে থাকেন তাকে মুফরিদ বলা হয়।

মাতাফ ঃ অর্থ বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকস্থ তাওয়াফ সমাপন করার স্থান, যার উপরে বর্তমানে মর্মর পাথর বসানো রয়েছে।

মাকামে ইব্রাহীম ঃ একটি বেহেশতী পাথরের নাম। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর উপরে দাঁড়িয়ে কা'বা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন।

মুলতাযাম ঃ অর্থ হাজারে আসওয়াদ এবং বায়তুল্লাহ শরীফের দরজার মধ্যবর্তী দেয়াল। একে জড়িয়ে ধরে দো'আ প্রার্থনা করা সুন্নত।

মসজিদে খায়েফ ঃ মিনার সবচেয়ে বড় মসজিদ। এটা মিনার উত্তর দিকে যাব পাহাড়ের পার্শ্বদেশে অবস্থিত।

মসজিদে নামিরাহ্ ঃ আরাফাত ময়দানের কিনারায় অবস্থিত একটি মসজিদ।

মাদআ ঃ এর শাব্দিক অর্থ দো'আ করার জায়গা। মসজিদে হারাম এবং মক্কার কবরস্থানের মাঝখানে অবস্থিত। মক্কায় প্রবেশ করার সময় এখানে দো'আ প্রার্থনা করা মুস্তাহাব।

মুহাস্‌সার ঃ মুযদালিফা সংলগ্ন একটি ময়দান। সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দৌড়ায়ে অতিক্রম করতে হয়। এখানেই আসহাবে ফীলের উপরে আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল। আবরাহার যে হস্তী-বাহিনী বায়তুল্লাহ শরীফের উপর চড়াও হয়েছিল তাদেরকে আসহাবে ফীল বলা হয়।

মারওয়াহ ঃ বায়তুল্লাহ শরীফের পূর্ব-উত্তর কোণের নিকটে ছোট একটি পাহাড়, যেখানে পৌঁছে সাঈ সমাপ্ত হয়।

মায়লাইনে আখযারাইন ঃ সাফা ও মারওয়াহ-এর মাঝখানে মসজিদে হারামের দেওয়ালে স্থাপিত দুইটি সবুজ বাতি। এদের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ পালনকারী পুরুষরা দৌড়িয়ে চলেন।

মক্কী ঃ অর্থ পবিত্র মক্কার অধিবাসী।

মাওকাফ ঃ অর্থ হজ্জের আহকাম পালনের সময় অকুফ বা অবস্থান করার জায়গা। এটা দ্বারা আরাফাতের ময়দান এবং মুযদালিফার অবস্থানের জায়গাকে বুঝানো হয়।

মীকাত ঃ সেই নির্দিষ্ট স্থান যেখানে পৌঁছার পর হজ্জ যাত্রীগণ হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধেন।

মীকাতী ঃ যারা মীকাতে বসবাস করেন এমন লোক।

অকুফ ঃ অর্থ থামা বা অবস্থান করা। আহকামে হজ্জের ক্ষেত্রে এর অর্থ হয় আরাফাতের ময়দান অথবা মুযদালিফায় বিশেষ-বিশেষ সময়ে অবস্থান করা।

হাদয়ি ঃ অর্থ সেই প্রাণী যা হাজী সাহেবগণ কোরবানী করার উদ্দেশ্যে সঙ্গে নিয়ে যান।

ইয়াওমে আরাফাহ ঃ অর্থ ৯ই যিলহজ্জ, যেদিন হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় এবং হাজী সাহেবগণ আরাফাতের ময়দানে অকুফ করেন।

ইয়াওমুত তারভিয়াহ ঃ অর্থ ৮ই যিলহজ্জ।

ইয়ালাম্‌লাম্‌ ঃ মক্কা হতে দক্ষিণ দিকে দুই মনজিল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। একে ইদানিং সা'দিয়াহ্‌ও বলা হয়। ইহা ইয়ামানবাসী এবং পাক-ভারত-বাংলা উপ-মহাদেশসহ দূরপ্রাচ্য হতে আগত লোকদের মীকাত।

হিজাযী ওজন ও পরিমাপ

সউদী আরবে খাদ্যশস্য, আটা ডাল প্রভৃতি ওজন করে বিক্রয় হয়, যাকে 'কিলো' বলা হয়। এর অর্ধাংশ, চতুর্থাংশ এবং অষ্টমাংশ প্রভৃতি বিভিন্ন অংশও হয়ে থাকে।

ওজন ঃ আমাদের দেশের মত জিনিসপত্র ওজন করে "কিলো" হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

পরিমাপ ঃ কাপড় প্রভৃতি ‘মিটার’ পরিমাপে বিক্রয় হয় এবং ভূমি ও সড়কের পরিমাপ কিলোমিটারে হয়। এক কিলোমিটার ১ হাজার মিটারের সমান। এক মিটার প্রায় ৪০ ইঞ্চির সমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ জিদ্দা হতে মক্কার দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার অর্থাৎ ৪৬ মাইল আর জিদ্দা হতে মদীনার দূরত্ব ৪৫০ কিলোমিটার অর্থাৎ ২৭৯ মাইল।

“মক্কা শরীফ”

মক্কা শরীফের বর্ণনা ঃ

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ “আরব”। এর আয়তন হলো ১,০২,৭০০ বর্গমাইল। পর্বতমালা, মরুভূমি ও অনুর্বর ভূমিই এ দেশটির বৈশিষ্ট্য। খুবই সামান্য অঞ্চল উর্বরা। শুষ্ক, রৌদ্র-দগ্ধ, বৃক্ষ-লতাদি শূন্য এবং লুহ হাওয়া প্রবাহিত হয় এ এলাকাতে। আরব শব্দের আভিধানিক অর্থ “বিশুষ্ক প্রান্তর ও অনুর্বর যমীন”। এ কঠিন দেশেই মহা পবিত্র স্থান মক্কা নগরী, আর এ নগরীতেই মহা সম্মানিত বাইতুল্লাহ্ শরীফ (আল্লাহ ঘর) অবস্থিত।

মক্কা শরীফের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা ঃ

আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَٰرَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ

“বাক্কায় স্থাপিত (মক্কা শরীফের) এই গৃহই প্রথম গৃহ যা (আমার উপাসনার জন্য) মানবের জন্য পৃথিবীতে স্থাপিত হয়েছে; এটা সর্ব জগতের জন্য কল্যাণকর ও পথ প্রদর্শক।”– কোরআন (৩ঃ৯৬)

আরও এরশাদ হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ
مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

“তিনিই তাদের হাতকে তোমাদের থেকে প্রতিরুদ্ধ করেছেন এবং তোমাদের হাতকে তাদের থেকে প্রতিরুদ্ধ করেছেন; মক্কা উপত্যকায় এরপর তোমাদেরকে তাদের উপর ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিলেন।”– কোরআন (৪৮ঃ২৪)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে পবিত্র মক্কাকে “বাক্কা ও মক্কা” নামে অবিহিত করে এর মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে।

এ নগরের বিভিন্ন বিশেষণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা’আলার বানী –

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

"আর এভাবে আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন নগর সমূহের মাতা মক্কা ও তার চতুর্দিকের লোকজনকে। (সূরা শূরা- ৪২ঃ৭)

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ

তীন, যাইতুন, সিনাই পর্বত এবং এ নিরাপদ নগরীর শপথ। (সূরা তীন- ৯০ঃ১-৩)

এককভাবে মক্কা নগরীর শপথও উচ্চারিত কুরআনুল করীমে–

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ

শপথ এ নগরীর, আর আপনি এ নগরীর অধিবাসী। (সূরা বালাদ-৯০ঃ১-২)

এ সেই পূতপবিত্র নগরী, যার জন্য আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দু'আ করেছিলেন–

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ

স্মরন কর, যখন ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! একে তুমি নিরাপদ নগরী কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল থেকে জীবিকা দান কর। (সূরা বাকারা- ২ঃ১২৬)

এ সেই নগরী, যেখানে মহা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত করে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন, জীবনের তিপ্পান্ন বছর এ নগরীতেই তিনি কাটিয়েছেন। এখানেই তিনি ওহী ও নবুওয়াত লাভ করেছেন। এখান থেকেই তিনি মি'রাজে গমন করেছেন। এ নগরীকে মহা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী–

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِمَكَّةَ مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبَّكِ اِلَىَّ وَلَوْ لَا اِنَّ قَوْمِىْ اَخْرَجُوْنِىْ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার প্রতি লক্ষ্য করে বলেন– "কি উত্তম শহর তুমি! তোমাকে আমি কত ভালবাসি। যদি আমার কওম আমাকে তোমা হতে বিতাড়িত না করত, তবে আমি কখনও তোমাকে ছাড়া অন্য কোথাও বসবাস করতাম না।"– তিরমিযী

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِىِّ بْنِ حَمْرَاءَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَاللهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللهِ اِلَى اللهِ وَلَوْلَا اَنِّىْ اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে হামরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি তিনি খাওয়ারায় দাঁড়িয়ে বলছেন- "হে মক্কা, আল্লাহ্র কসম, তুমি হলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম যমীন এবং আল্লাহর যমীনের প্রিয়তম যমীন আল্লাহর নিকট। যদি আমাকে তোমা হতে বের করা না হত, কখনও বের হতাম না।"– তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

২৫৯৬–(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন– "অতঃপর আর হিযরত নেই, তবে জেহাদ ও সংকল্প (নিয়ত) বাকী আছে। সুতরাং তোমাদের যখন জেহাদের জন্য বের হতে বলা হবে, বের হয়ে পড়বে। তিনি ঐ দিন পুনরায় বললেন, এই শহরকে আল্লাহ্ সম্মানিত করেছেন সেদিন হতে যেদিন তিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তা আল্লাহ্র সম্মানেই সম্মানিত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। আমার পূর্বে কারও জন্য এতে যুদ্ধ চালনা করা হালাল ছিল না, আর আমার জন্যও একদিনের সামান্য মাত্র সময়ই হালাল করা হয়েছে। অতঃপর তা আল্লাহ্র সম্মানেই সম্মানিত কেয়ামত পর্যন্ত। এর কাঁটা গাছ পর্যন্ত কাটা যাবে না, শিকারকে তাড়ান চলবে না এবং পথে পড়া জিনিস কেউ উঠাতে পারবে না, শোহরতকারী ছাড়া। আর এর ঘাসও কাটা চলবে না। এ সময় (আমার পিতা) হযরত আব্বাস (রাঃ) বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ইয্খার ছাড়া। উহা লোকদের (কামারদের) জন্য ও ঘরের ছাদের জন্য দরকার। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা ইয্খার ছাড়া।" – বোখারী ও মুসলিম

হযরত আইয়াশ ইবনে আবু রবীয়া মাখযূমী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– "এই উত্তম কল্যাণের সাথে থাকবে, যতদিন তারা মক্কার এই সম্মান পূর্ণভাবে বজায় রাখবে। যখন তারা তা বিনষ্ট করবে ধ্বংস হয়ে যাবে।"– ইবনে মাজাহ্

প্রথমে কোথায় যাবেন; মক্কা শরীফ না মদীনা শরীফ?

নফল হজ্জে গমনকারীদের জন্য প্রথমেই মদীনা শরীফে গমনের অনুমতি আছে। ফরয হজ্জে গমনকারীরা প্রথমে মক্কা শরীফ উপস্থিত হবেন। তারপর হজ্জ সমাধা করে মদীনা শরীফ যাবেন। হজ্জের সময়ের আগে অবসর থাকলে প্রথমে মদীনা শরীফ যাবেন এবং পরে মদীনা শরীফ থেকে ফিরে আসার পথে নিজের সুবিধা অনুসারে তিন প্রকার হজ্জের যে কোন একটির জন্য যুলহুলায়ফা থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফে আসবেন। কেউ যদি উমরাহ্ সহকারে মক্কা শরীফ গমন করেন, তারপর হজ্জের আগে মদীনা শরীফ যেতে চান তার জন্য হযরত ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মতে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফে যাবেন। যদি কেউ জেদ্দা হতে মদীনা চলে যায় এবং সেখান থেকে আসার পথে উমরাহর ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ আগমন করে উমরাহর কাজ শেষ করে হালাল হয়ে পরে হারাম শরীফ হতে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ আদায়

করেন, তাহলে তার হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। এ জন্য পরামর্শ হলো, হজ্জের সময়ের আগে অবসর থাকলে প্রথমে মদীনা শরীফ চলে যাওয়া। অতঃপর সেখান থেকে নিজের সুবিধা অনুসারে আসার পথে যুলহুলায়ফা থেকে যে কেন একটি হজ্জের ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ আগমন করা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"কা'বা শরীফের ইতিহাস"

হযরত আদম (আঃ) বেহেশত থেকে পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ্র দরবারে একটি ইবাদতের স্থানের ফরিয়াদ জানালেন। আল্লাহ্ ফরিয়াদ কবুল করলেন, স্থান নির্দিষ্ট করে ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে বেহেশত হতে "হাজারে আছওয়াদ" প্রদান করেন। হযরত আদম (আঃ) লবানন, তুরে সিমা, তুরে জিতা, জুদি ও হেরা পাহাড়ের পাথর দিয়ে কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, কাবা শরীফ নির্মাণের পর আল্লাহর আদেশে তিনি হজ্জের অনুষ্ঠান পালন করেন। তখন ফেরেশতাগণ সাক্ষাৎ করে বললেন- "হে আদম, তোমার হজ্জ কবুল হয়েছে। তোমার আগমনের দু'হাজার বৎসর পূর্ব হতেই আমরা এ স্থানে ইবাদত ও তাওয়াফ করে আসছি।" প্রথম বার ফেরেশতাগণ, দ্বিতীয় বার হযরত আদম (আঃ) এবং ৩য় বার কাবা শরীফের যত্ন নেন হযরত শিষ (আঃ)। হযরত নূহ (আঃ) এর প-াবনের সময় এ গৃহ বিনষ্ট হয়। হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের দু'হাজার বৎসর পূর্বে ৪র্থ বারে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) সহযোগে হাতীমসহ কাবা শরীফ পুনর্নির্মাণ করেন। তখন এর উচ্চতা ছিল জমিন হতে উপরে ৯ গজ, দৈর্ঘ্য কালো পাথর হতে রুকনে শামী পর্যন্ত ৩২ গজ, রুকনে শামী হতে রুকনে গরবী পর্যন্ত প্রস্থ ২২ গজ।

পবিত্র কাবা শরীফ ছিল সাদা-কালো ধরনের, না ছিল ছাদ, না ছিল দরওয়াজার পাল্লা, না ছিল চৌকাঠ।

৫ম বার ৬৫০ খ্রিঃ আমালিকা গোত্র, ৬ষ্ঠ বার জোরহাম গোত্র, ৭ম বার হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ৫ম পুরুষ কুসাই ইবনে কেলাব এ ঘর নির্মাণ করেন, যখন নবীজির বয়স ৩৫ বছর। তিনি নতুন দেয়াল ও ছাদ নির্মাণ করেন। ৮ম বার হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ), ৯ম বার হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ নির্মাণ করেন। খলিফা অলিদ ইবনে আবদুল মালিকের নির্দেশে ইবনে যুবাইরের নির্মিত কাবা ঘর ভেঙ্গে ফেলা হয়। কোরাইশ বংশের নির্মিত কাবার আকৃতিতে পুনরায় নির্মাণ করা হয়, যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। খলিফা হারুন-অর-রশিদ চেয়েছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মিত কাবা ঘর ভেঙ্গে দিয়ে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর অনুরূপ নির্মাণ করবেন। কিন্তু হযরত ইমাম মালেক (রাঃ)

কঠোর ভাবে নিষেধ করেন, কেননা, তাহলে কাবা ঘর রাজা-বাদশাদের খেল তামাশার বস্তুতে পরিণত হবে। ওলামাগণ এতে ঐক্যমত পোষণ করেন।

১০২১ হিজরীতে (১৬০১ খ্রিঃ) সুলতান আহমদ তুর্কি বাইতুল্লাহ্ শরীফ মেরামত করেন এবং ১৩৬৭ হিজরীর মহররম মাসে (১৯৪৭ খ্রিঃ) বাদশাহ আব্দুল আজিজ ইবনে সাউদ কাবা শরীফের দরজা নতুন করে তৈরী করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্মিত কাবা ১৮ গজ দীর্ঘ ছিল বলে জানা যায়। এক স্তর পাথর এক স্তর কাঠ এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে পাথর-কাঠ সমন্বয়ে একত্রিশ স্তরে নির্মাণ করা হয়। ১৬টি পাথরের স্তর ১৫টি কাঠের স্তরের মধ্যে প্রথম ও শেষ স্তর পাথরের ছিল। ইয়াকুবির তথ্যানুসারে ছয়টি স্তম্ভের ওপর কাঠের ছাদ ছিল। আবিসিনীয় খ্রিষ্টান কারিগর বাকুম রাজমিস্ত্রি কাঠমিস্ত্রি হিসাবে কাজ করেছিলেন। লোহিত সাগরের উপকূলে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নিয়ে আসা নৌকা ভেঙ্গে গেলে ওই কাঠ সংগ্রহ করে কাবা নির্মাণের কাজে লাগানো হয়। আবিসিনীয় পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে এক স্তর পাথর ও এক স্তর কাঠ ব্যবহারে নির্মান করেন। নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার জন্য একটি উল অপরটি সিল্কের গিলাফ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত গিলাফ দিয়ে ঢাকা কাবা ঘর আমরা দেখতে পাই। মুসলমানরা প্রতি বছর এ কাবা ঘরে হজ্জ সম্পন্ন করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রাঃ) যখন খলীফা হলেন, তখন কাবা শরীফের স্তম্ভে তিনি সোনা মুড়িয়ে দিলেন। আবদুল মালেক বিন মারওয়ান এই কাজে ৩৬ হাজার আশরাফী, আমীনুর রশীদ ১৮ হাজার আশরাফী ব্যয় করেছেন।

বর্তমান কাবা শরীফের কেন্দ্র হতে চারি কোণের মধ্য দিয়ে রেখা অঙ্কন করলে তা মোটা-মুটি ভাবে চারটি দিক নির্দেশ করবে। উত্তরের কোণকে আল-ইরাকী, পশ্চিমের কোণ হলো আল-শ্যামী, দক্ষিণ কোণ আল য়্যামানি, পূর্বের কোণ রুকন-আল্ হাজারে আসওয়াদ।

কাবা শরীফের অভ্যন্তরে ৩টি কাঠের খুঁটি আছে। উহার উপর ছাদ অবস্থিত। ছাদে উঠবার সিঁড়ি আছে। গৃহের সামগ্রী শুধু স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অসংখ্য ঝাড় বাতি। মেঝে মর্মর প্রস্তর দ্বারা আবৃত।

বাদশাহ্ আঃ আজিজ ইবনে সাউদ এর রাজ পরিবার কাবা শরীফ, মসজিদ, যমযম, সাফা-মারওয়া, মিনা-মোযদালাফা, আরাফাত-মীকাত তথা ঐতিহাসিক সকল স্থানগুলোর অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে আসছেন। আর এ গতি অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনার বিষয় যা জানা যাচ্ছে, তাতে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ পবিত্র স্থানের আরও অনেক অনেক উন্নতি সাধিত হবে, ইনশা-আল্লাহ্।

কা'বা শরীফের ফজিলত ঃ

মহা সম্মানিত কাবা বাইতুল্লাহ্-"আল্লাহ্র ঘর", বাইতুল হারম-"সম্মানিত ঘর", বাইতুল আতিক-"আযাদ বা মুক্ত ঘর", মাস্জিদুল হারম-"সম্মানিত সেজদার স্থান" এসকল নামে আল-কুরআনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা কাবা শরীফকে নিজের ঘর বলে অভিহিত করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন–

أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"তোমরা দু'জনে পবিত্র কর আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্যে।"– কোরআন (২ঃ১২৫)

কাবা শরীফের মর্যাদার কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেন–

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ

"আল্লাহ্ তা'আলা কাবাকে সম্মানিত ঘর এবং মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন।"– কোরআন (৫ঃ৯৭)

কুরআনে কারীমে এ ঘরের মর্যাদা প্রসঙ্গে এসেছে–

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا

(হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন) "আমি আদিষ্ট হয়েছি সেই ঘরের প্রভুর ইবাদত করতে, যাকে তিনি হরম-সম্মানিত সাব্যস্ত করেছেন।" – কোরআন (২৭ঃ৯১)

পবিত্র কাবা শরীফ মুসলিম জাতির কেবলা। আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে–

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"এখনই আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন্ মস্‌জিদে হারামের দিকে, হে মুসলমানগণ! তোমরা যেখানেই থাক, স্বীয় মুখ সেটার (কেবলার) দিকে ফিরাও।"– কোরআন (২ঃ১৪৪)। এ আয়াতে প্রমাণিত হল বাইতুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করা নামাযের মধ্যে ফরয। দৈনিক যখনই নামায আদায় করার ইচ্ছা করবেন তখনই কাবাকে কেবলা করে দাঁড়াবেন। আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাবার দিকে মুখ করা কাবারই মর্যাদা।

কাবা শরীফকে কেন্দ্র করেই হজ্জ। আল্লাহ্ বলেন–

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"আল্লাহরই জন্য মানবকূলের উপর সেই ঘরের হজ্জ করা (ফরজ) যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে।"– কোরআন (৩ঃ৯৭)। আয়াতে 'হাজ্জুল বাইত' ঘরের হজ্জের স্পষ্ট উল্লেখ হয়েছে। দেখা যায়, ঈমানের পর ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের দু'টিই আল্লাহ্‌র ঘরের সাথে সম্পৃক্ত। নামায ও হজ্জ ইহা বাইতুল্লাহ্‌রই মর্যাদা বৈ আর কি?

পবিত্র ঘরের মর্যাদায় আল্লাহ্ বলেন–

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"হজ্জ সম্পাদনে– তাঁরা যেন এই আযাদ মুক্ত ঘরের তাওয়াফ করে।"– কোরআন (২২ঃ২৯)

আল-কুরআনে ১২টি আয়াতে কাবা শরীফকে "মসজিদুল হারাম" নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন–

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

"পবিত্রতা তাঁরই জন্য যিনি নিজ বান্দাকে রাত্রিতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারম হতে মসজিদে আক্সা পর্যন্ত।"– কোরআন (১৭ঃ১)

কাবা শরীফকে কেন্দ্র করেই এ শহরকে "উম্মুল কুরা" নগর সমুহের মা' মূল কেন্দ্রবিন্দু বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا

"আর এভাবে আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন নগর সমূহের মাতা মক্কা ও তার চতুর্দিকের লোকজনকে।" (সূরা শূরা-৪২ঃ৭)

কাবা শরীফই পৃথিবীর সর্ব প্রথম ঘর। আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

"নিশ্চয়ই মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কায়), ইহা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।" (সূরা আলে ইমরান- ৩ঃ৯৬)

কাবা শরীফকে কেন্দ্র করেই পবিত্র হরমের সীমানা নির্ধারণ হয়েছে। ইহা কাবারই মর্যাদা। 'হরম' সীমানায় শিকার করা এমনকি শিকারীকে শিকারের ব্যাপারে পথপ্রদর্শন বা কোনরূপ সাহায্য সহযোগিতা করা যে হারাম, তা এই হরম শরীফের সম্মানের কারণেই। আবহমানকাল থেকেই 'হরম' নিরাপদ ও সম্মানিত স্থান বলেই গণ্য হয়ে আসছে।

যুদ্ধরত আরব গোত্রসমূহ সেই জাহিলিয়্যাতের যুগেও শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও 'হরম' সীমায় বধ করতো না বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতো না। 'হরম' এর এই সম্মান কিয়ামত কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন–

فَهُوَحَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهٗ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهٗ

কিয়ামত অবধি ইহা আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্মানের ভিত্তিতে সম্মানিত। সুতরাং 'হরম' এলাকায় কাঁটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং তার শিকার জন্তুকে হাঁকানো যাবে না।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদুল হারাম দর্শনকালে দু'হাত উর্ধ্বে তুলে এরূপ দু'আ করতেন–

للّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَعْظِيْمًا وَ تَشْرِيْفًا وَ تَكْرِيْمًا وَ مَهَابَةً وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَ
مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَ تَكْرِيْمًا وَ تَعْظِيْمًا

"হে আল্লাহ্! এ ঘরের মান-মর্যাদা সম্ভ্রম বৃদ্ধি করুন এবং যারা এ ঘরে হজ্জ বা উমরাহ্ করেন, তাদের মান-মর্যাদা, সম্ভ্রমও বৃদ্ধি করুন।"

হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, প্রতি বছর অন্ততঃ ছয় লক্ষ লোক খানায়ে কা'বার হজ্জ করবে। যদি কোন বছর এ সংখ্যার চেয়ে লোক কম হয়ে যায় তাহলে তিনি তা ফেরেশতাদের দ্বারা পূর্ণ করবেন। রোজ কিয়ামতে খানায়ে কা'বা এক নব বধূর মত হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। দুনিয়ায় যারা হজ্জ আদায় করেছে বা হজ্জ আদায় করবে, তারা খানায়ে কা'বার গেলাফের সাথে ঝুলে থাকবে। আর কখনও কখনও বা তার চার পাশে ঘুরে বেড়াবে। এক সময় খানায়ে কা'বা যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে, সাথে সাথে হাজীরাও বেহেশতে প্রবিষ্ট হবে।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, পবিত্র মক্কায় একদিন রোযা রাখা একলাখ রোযার তুল্য, এক দেরহাম দান করা এক লাখ দেরহাম দানের তুল্য। ঠিক এভাবে প্রত্যেকটি নেক আমল এক লাখ নেক আমলের তুল্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, খানায়ে কা'বার উপরে প্রত্যহ একশ বিশটি রহমত অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যে তাওয়াফকারীর জন্য ৬০টি, নামায আদায়কারীর জন্য ৪০টি, দর্শকের জন্য ২০টি। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, খানায়ে কা'বার তাওয়াফ যত পার, বেশী করে কর। কারণ এটি খুব বড় ইবাদত। রোজ কিয়ামতে আমলনামায় এটা পাওয়া যাবে। আর এর সমতুল্য ঈর্ষা করার যোগ্য অন্য কোন আমল নেই। এজন্যই হজ্জ ও ওমরাহ ছাড়াই প্রথম তাওয়াফ করা মুস্তাহাব। অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি খালি পায়ে ও নগ্ন দেহে সাতবার তাওয়াফ করে, সে যেন একটি গোলাম আজাদ করে দিল। আর যে ব্যক্তি বৃষ্টিতে ভিজে সাতবার তাওয়াফ করে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ্ মার্জিত হয়ে যাবে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রতি রাত্রে দুনিয়াবাসীদের প্রতি নজর করেন। সবার আগে হেরেমবাসীদেরকে এবং তাদের মধ্যে খানায়ে কা'বার মসজিদের মধ্যকার লোকদেরকে দেখেন। এই মুহূর্তে যাকে তিনি তাওয়াফ করতে দেখেন তাকে ক্ষমা করে দেন। যাকে নামায পড়তে দেখেন তাকেও ক্ষমা করে দেন। যাকে কিবলামুখী দন্ডায়মান দেখেন তারও মার্জনা নছীব করেন। বর্ণিত আছে যে, প্রত্যহ সূর্যাস্তকালে অবশ্যই একজন আবদাল খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করেন এবং প্রত্যহ প্রতুষ্যে একজন আওতাদ তা' তাওয়াফ করেন। এভাবে তাওয়াফ জারী না থাকলে খানায়ে কা'বা দুনিয়ার পৃষ্ঠ থেকে উঠে যাওয়ার কারণ হবে। একদিন মানুষ প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবে, খানায়ে কা'বার স্থানটি শূন্য পড়ে আছে। সেখানে কা'বা গৃহের কোন নাম

নিশানাও নেই। এটা ঠিক তখন হবে যখন একাধারে সাত বছর পর্যন্ত এ ধরনের কেউ তাওয়াফ করার মত বাকী থাকবে না।

তারপর কোরআন পাকের অক্ষরসমূহ মাছহাফ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একদা মানুষ ঘুম থেকে উঠে দেখবে যে, কুরআনে পাকের পাতাগুলো অক্ষরহীন হয়ে গেছে। এর কিছু পরেই মানুষের মন থেকেও কুরআন শরীফ মিটিয়ে দেয়া হবে। যার ফলে কুরআনে পাকের একটি শব্দও কারও মনে থাকবে না। ঠিক এমনি অবস্থায় মানুষ কবিতা, কিচ্ছা-কাহিনী, গান-গীতি ও রাগ-রাগিনীতে মত্ত হয়ে থাকবে। এক সময় দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটে যাবে। কিন্তু পরেই হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবেন। রোজ কিয়ামত তখন এত নিকটবর্তী হয় পড়বে যে, গর্ভধারিণীর গর্ভ দেখে মানুষ মনে করবে যে, এখন কিছুদিনের মধ্যেইত সে সন্তান প্রসব করবে। হাদীসে আছে যে, আল্লাহর এ গৃহকে তুলে নেয়ার পূর্বে যত বেশী পার, এর তাওয়াফ করে নাও। কারণ, জেনে রাখ, ইতিপূর্বে এ গৃহ দু'দুবার বিধ্বস্ত হয়েছিল। তৃতীয়বার একে দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য তুলে নেয়া হবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যখন আমার এ দুনিয়াকে ধ্বংস করার ইচ্ছে হবে তখন প্রথম আমি আমার গৃহ থেকেই তা শুরু করব। সর্ব প্রথম আমি আমার গৃহ বিলীন করে তারপর দুনিয়াকে ধ্বংস করব।

গিলাফে ঢাকা কাবা ঃ

ইতিহাসের গোড়া থেকেই রাজা, বাদশাহ্, মহান ব্যক্তিরা আল্লাহ্র ঘরের গিলাফ পরিয়ে সম্মান লাভের চেষ্টা করেছেন। এক বর্ণনায় পাওয়া যায় প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পূর্বপুরুষ আদ্নান্ ইব্নে আইদ কাবা শরীফে প্রথম গিলাফ পরান। ইতিহাসের এক তথ্য হলো ইয়েমনের হুমায়রী গোত্রের বাদশাহ্ তুব্বা আবু কবর আসাদই গিলাফ দিয়ে আচ্ছাদনকারী প্রথম ব্যক্তি। তিনি হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিজরতের ২২০ বছর আগে মদীনা শহর (ইয়াসরিব) হামলা করেন।

ইবনে হিশাম তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হিমিয়ারের রাজা ইয়াসরিব ছেড়ে যাওয়ার সময় পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করে পবিত্র কাবা শরীফ তাওয়াফ শেষে তার মাথা মুন্ডন করেন এবং এ শহরে ক'দিন অবস্থান করেন। মক্কায় অবস্থানকালে এক দিন তিনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেন, তিনি কা'বা শরীফ গিলাফ দ্বারা আচ্ছাদন করছেন। এরপরই তিনি খাসাপ দ্বারা আল্লাহ্র ঘরটি আচ্ছাদন করেন। উল্লেখ্য, খাসাপ হচ্ছে তালগাছ জাতীয় গাছের পাতা ও আঁশের তৈরী এক ধরনের মোটা কাপড়। তারপর তিনি আবার স্বপ্ন দেখেন, তিনি আরো উন্নতমানের কাপড় দিয়ে কা'বা শরীফ আচ্ছাদন করছেন। তার আলোকে মামিজিয়ান, পাপিরাস (মিসর দেশীয় নলখাগড়া বিশেষ

পাতা) দিয়ে কাবা ঘর আচ্ছাদন করেন। ইয়েমেনের মামিজ নামক একটি উপজাতীয় গোত্র এ কাপড় তৈরী করে। তৃতীয়বারের মতো তিনি আবারো আরো উন্নত কাপড় দিয়ে কাবা ঘর আচ্ছাদনের স্বপ্ন দেখলেন– এবার তিনি ইয়েমেনের লাল ডোরাকাটা কাপড় দিয়ে পবিত্র কাবা ঢেকে দিলেন। এরপর থেকে লোকজন কিছু সময়ের ব্যবধানে সুন্দর কাপড় বা গিলাফ দিয়ে পবিত্র কা'বা ঘর আচ্ছাদনের অনুশীলন অব্যাহত রাখে। যার ফলে এখনো দামি কালো কারুকার্য খচিত কাপড়ের তৈরি মোটা গিলাফ দিয়ে পবিত্র আল্লাহ্‌র ঘর ঢাকা রয়েছে।

কুসাঈ বিন কিলাবের আমলে গিলাফের জন্য সকল কবিলার উপর চাঁদা ধার্য্য করা হয়েছিল। আল-আজকারি লিখেছেন, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ইয়েমেনী চাঁদর দ্বারা গিলাফ দিয়েছিলেন। এর পরবর্তী অধ্যায়ে খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সুন্দর গিলাফে আচ্ছাদন করেন।

হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে মিসরে নির্মিত কুবাতী গিলাফ পরায়েছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) ও সুন্দর গিলাফে আচ্ছাদন করেছিলেন। এরপর এই প্রথা চালু হয় যে, প্রত্যেক শাসকই নতুন করে গিলাফ পরাতেন। বনু উমাইয়্যা রেশমের পর্দায় গিলাফ দিয়েছিলেন। মামুনুর রশীদ বছরে তিনবার গিলাফ চড়াতেন। হজ্জের সময় লাল রেশমের, রজব মাসে কুবাতী চাঁদরের এবং ঈদুল ফিতরের সময় সাদা রেশমের। মিসরে যখন সুলতান সালেহ বিন্ সুলতান কাল্লাদান বাদশাহ্ হলেন, তখন দুটি গ্রাম গিলাফের নির্মাণ ব্যয়ভার বহনের জন্য ওয়াকফ করে দেন। যখন তুর্কী খান্দান কনষ্টান্টিনোপলের শাসক হলেন, তখন সুলতান সুলাইমান আরও কয়েকটি গ্রাম দান করেন।

আল্লাহ্‌র ঘর নক্‌শা ও নমুনার দ্বারা সৌন্দর্য বিধানের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এ হলো দৌলতের প্রাচুর্য্যের স্থান। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) যখন খলীফা হলেন, তখন কাবা গৃহের স্তম্ভে তিনি সোনা মুড়িয়ে দিলেন। আবদুল মালেক বিন মারওয়ান একাজে ৩৬ হাজার আশরাফী, আমীনুর রশীদ ১৮ হাজার আশরাফী ব্যয় করেন।

আব্বাসীয় খলিফা আল আব্বাস আল মাহদি ১৬০ হিজরিতে পবিত্র হজ্জ পালনকালে পবিত্র কাবা থেকে একটি ছাড়া সব গিলাফ সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এখনো এ ধারাই অব্যাহত রয়েছে। বাদশাহ্ বাইবার্স হচ্ছেন পবিত্র কাবায় গিলাফ পরিয়ে দেয়া প্রথম মিসরীয় শাসক। তারপর ইয়েমেনের বাদশাহ্ আল মুদাফ্‌ফার ৬৫৯ হিজরিতে কাবা শরীফে গিলাফ পরান। পরে মিসরের শাসকরা পর্যায়ক্রমে এ কাজ অব্যাহত রাখেন। ৮১০ হিজরীতে পবিত্র কাবার দরজায় একটি সুন্দর সু-সজ্জিত নকশা সম্বলিত পর্দা লাগিয়ে দেয়া হয়। এক পর্যায়ে মিসরীয় সরকার অনেক অর্থ ব্যয়ে কাবা শরীফ ঢাকার জন্য একটি সুন্দর গিলাফ তৈরী করে লাগিয়ে দেন। পরে বাদশাহ্ আবদুল আজিজ আল সউদ মক্কা-মদিনার দু'পবিত্র মসজিদের দেখা-শোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৩৪৬ হিজরীতে পবিত্র কাবা শরীফের গিলাফ তৈরির জন্য একটি বিশেষ ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। একই বছরের মাঝামাঝি সময়ে প্রয়োজনীয়

কাপড় তৈরি করে মক্কা মুকাররামায় দক্ষ সৌদি কারিগরের হাত দিয়ে সুন্দর নক্‌শা তৈরি করে ইসলামী শিল্পকলার সমৃদ্ধ রূপায়ণে সুন্দর গিলাফ তৈরী করে পবিত্র কা'বার গায়ে পরিয়েছেন। ১৩৫৭ হিজরী পর্যন্ত এ ফ্যাক্টরীতে গিলাফ ও কিসওয়া তৈরি অব্যাহত রাখে। পরে ১৩৮১ হিজরীতে সৌদি কারিগর দ্বারা রেশমি ও সোনালি সুতা দিয়ে গিলাফ তৈরি করে কাবার গায়ে পরানোর ব্যবস্থা করা হয়। ১৩৮২ হিজরীতে মরহুম বাদশাহ্ ফয়সাল ইবনে আবদুল আজিজ নতুন ডিক্রি জারির মাধ্যমে নতুন করে পবিত্র কাবার গিলাফ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। খাঁটি প্রাকৃতিক রেশমি রঙের সাথে কালো রঙের কাপড় দিয়ে পবিত্র কাবার গিলাফ তৈরির ব্যবস্থা হয়। এর মধ্যে পবিত্র কোরআন শরীফের কিছু আয়াত শোভা পায়। অক্ষরগুলো সোনালি আভায় উদ্ভাসিত। বর্তমানেও উক্ত আদেশ বলবৎ রয়েছে এবং তাদের মাধ্যমেই বাইতুল্লাহ্ শরীফের সৌন্দর্য বর্ধিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এক সময় কাবা শরীফের তত্ত্বাবধায়কদের থেকে ব্যবহৃত গিলাফ বরকতের জন্য মানুষ ক্রয় করে নিত।

কা'বা শরীফের মুতাওয়াল্লী ঃ

আল্লাহ তা'য়ালার এ পবিত্র ঘরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন হযরত আদম (আঃ), তাঁর পুত্র হযরত শীষ (আঃ)। বংশানুক্রমে এর মুতাওয়াল্লী নির্বাচিত হতে থাকে। হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর ইন্তিকালের পর তাঁর বড় ছেলে নাবিত এবং তাঁর মৃত্যুর পর তার নানা মাজ্জাজ মুতাওয়াল্লী হন। এভাবে ইসমাঈলী বংশ হতে যুরহাম, এক সময় কুজাআ গোত্রের লোকেরা মুতাওয়াল্লী হন। দীর্ঘকাল তারা বহাল থাকেন।

বনী ইসমাঈল যদিও তখন বর্তমান ছিল, কিন্তু তারা কোন রকম বিরোধিতা করেনি। তারপর যখন কুসাঈ বিন কিলাবের জমানা সমাগত হল, তখন তিনি পৈতৃক অধিকার পুনরায় হস্তগত করলেন। ইয়ামেনের রাজা 'আবরাহা' হস্তি বাহিনী নিয়ে কা'বা ঘর আক্রমন করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাদা আবদুল মুত্তালিব কা'বা রক্ষায় অসমর্থ হলে আল্লাহ্ তা'য়ালা 'আবাবিল' পাখি পাঠিয়ে কিভাবে কৌশলে কা'বা ঘর রক্ষা করেছিলেন এ ঘটনার কথা আমরা কুরআনে 'সূরা ফিলে' জানতে পারি। প্রমাণিত হয় যে, কা'বার তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব কোরেশদের হাতে ছিল, বিশেষভাবে প্রাণের নবিজীর দাদাই মোতাওয়াল্লী ছিলেন। হজ্জ পালনে আগত লোকজনের সেবা-যত্ন ও তাদের পরিচালনার দায়িত্ব কোরেশদের উপর অর্পিত ছিল।

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় খানায়ে কা'বার দরজার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল ওসমান ইবনে তালহা নামক জনৈক কোরাইশীর উপর। সে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দরজা খুলতো। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কী জীবনে একদিন লোকদের সাথে খানায়ে কা'বার ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে ওসমান হুজুরকে বাঁধা দিয়েছিল। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) ধৈর্য্য ধরে সেদিন মন্তব্য করেছিলেন– "হে ওসমান! আজ তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ, হয়তো এমন একদিন আসবে যখন তোমার হাতের চাবিখানা আমার হাতে আসবে এবং আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দেবো"। সুবহান-আল্লাহ্!

তখন ওসমান বলেছিল, তা হলে কেবল কোরাইশদের ধ্বংস ও অপমানের মাধ্যমেই তা হতে পারে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে তখন বলেছিলেন– "না, বরং কোরইশগণ সে সময় নতুন জীবন লাভ করবে এবং সম্মানিত হবে"।–বেদায়া নেহায়া

মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ওসমানকে ডেকে এনে খানায়ে কা'বার চাবি হস্তান্তর করতে বললেন। ওসমান নীরবে ঘর থেকে চাবি এনে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে তুলে দিলেন। দয়াল নবীজী চাবিখানা ওসমানের হাতে ফেরত দিয়ে বললেন– "নাও! এ চাবি তোমার ও তোমার বংশের লোকদের হাতে চিরদিন থাকবে- যদি না কোন যালেম তা ছিনিয়ে নেয়"। ওসমান নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পূর্বের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হতে দেখে বিস্মিত ও অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। এটা ছিল নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুয়্যতের প্রমাণ। মক্কা বিজয়ের পর কা'বা শরীফের পরিচালনার দায়িত্ব মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও পর্যায়ক্রমে মুসলিম জাতির উপরই ন্যস্ত হয়ে আসছে।

হাজারে আসওয়াদ ঃ

"হাজারে আসওয়াদ" অর্থ কালো পাথর। হযরত আদম (আঃ) কা'বা শরীফের ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বেহেশত থেকে এ পাথর লাভ করেন। তিনি কা'বা শরীফ নির্মাণ কালে সম্মানের সাথে মর্যাদার স্থানে এ পাথর স্থাপন করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) নির্মাণ শেষে আল্লাহর নির্দেশে এমন স্থানে এ পাথর লাগিয়ে দিলেন যেখান থেকে মানুষ তাওয়াফ আরম্ভ করবে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমনের পর কা'বার দেয়ালগুলো ভেঙ্গে নতুন করে তৈরির সময় মহা কৌশলে ঝগড়া মিমাংসা করে সর্দারদের নিয়ে তিনি নিজ হাতে যথা স্থানে এই পাথর স্থাপন করেন। পবিত্র কা'বা শরীফের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে প্রায় ৪ ফুট উঁচু দেয়ালের ভেতরে এই পাথর স্থাপন করা হয়েছে রৌপ্য বেষ্টিত থালার মাঝে। তাওয়াফের সময় এ পাথর স্পর্শ করা ও চুমা খাওয়া সুন্নত।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে –

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হাজারে আসওয়াদ যখন বেহেশত হতে অবতীর্ণ হয়, তখন তা দুধ অপেক্ষা

অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের গুনাহ তাকে কালো করে দেয়। (আহমদ ও তিরমিযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহর কসম! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে উঠাবেন, তখন তার দুটি চক্ষু হবে, যা দিয়ে সে দেখবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে যা দ্বারা সে বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুম্বন করেছে তার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।" – তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীম বেহেশতের ইয়াকূত সমূহের মধ্য হতে দুটি ইয়াকুত আল্লাহ তাদের জ্যোতি দূর করে দিয়েছেন। যদি তাদের জ্যোতি দূর করা না হত, তবে অত্র পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে যা আছে তাকে জ্যোতির্ময় করে দিত। – (তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সায়েব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামনীর মধ্য জায়গায় এরূপ দোয়া করতে শুনেছি, "হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও।" – (আবু দাউদ)

হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজারে আসওয়াদকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করতেন। এরূপ বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি এর উপর সিজদাহও করতেন। যখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওয়ারীতে আরোহন করে খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করতেন তখন তিনি নিজের ছড়ির অগ্রভাগ এ পাথরে স্পর্শ করে তাতে চুম্বন করতেন। হযরত ওমর (রাঃ) একবার এ পাথরটিকে চুম্বন করার পর বললেন, "হে পাথর! আমি জানি তুমি একটি পাথর ব্যতীত অন্য কিছু নও। কারও কোনরূপ ক্ষতি করার সামর্থ্য তোমার নেই। আমি হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যদি তোমাকে সিজদাহ্ করতে না দেখতাম তাহলে তোমাকে আমি কখনই চুম্বন করতাম না।" এ কথা বলে তিনি উচ্চঃস্বরে ক্রন্দন শুরু করলেন। এরপর তিনি পিছনে ফিরে শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ)-কে দেখতে পেয়ে বললেন, হে হাসানের পিতা! এটা কান্নার স্থান। এখানে মানুষের দোয়া কবুল হয়। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই পাথর মানুষের ক্ষতি ও উপকার করে থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন,তা কিভাবে? হযরত আলী (রাঃ) জবাবে বললেন, আল্লাহ তায়ালা যখন বনী আদমের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তখন তিনি এক লিপি লিখে এই পাথরকে খাওয়ায়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এই পাথর ঈমানদারদের জন্য অঙ্গীকার পূর্ণ করার এবং বে-ঈমানদের জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাক্ষ্য দিবে।

এই কালো পাথরকে চুম্বন করার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা হয়–

"আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়া তাছদীক্বাম বিকিতাবিকা ওয়া অফাআম বি আহাদিকা।"

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি একাজ করছি তোমার প্রতি ঈমানের কারণে এবং তোমার কিতাব সত্যায়ন করা ও তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য।"

হাতিম ঃ কা'বা ঘরের উত্তর পাশে একটু উঁচু স্থানে দেয়াল দিয়ে ঘেরা অংশই হাতিম। কুরাইশগণ কা'বা শরীফ নতুন করে নির্মাণের সময় মূল বাইতুল্লাহর ছয় গজের মত জায়গা ছেঁড়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানে এটা আরও কিছু বেশী জায়গা নিয়ে বেষ্টনী নির্মাণ করা হয়েছে। মেরাজের রাতে এ স্থানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বক্ষ বিদীর্ণ করে জমজমের পানি দিয়ে হৃৎপিন্ড ধুয়ে দিয়েছিলেন।

মীজাবে রহমত ঃ বাইতুল্লাহ্ শরীফের ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত প্রণালী।

মুলতাযাম ঃ হাজারে আসওয়াদ এবং বায়তুল্লাহ শরীফের দরজার মধ্যবর্তী দেয়াল। ইহাকে জড়িয়ে ধরে দো'আ প্রার্থনা করা সুন্নত।

মাতাফ ঃ বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকস্থ তাওয়াফ সমাপন করার স্থান, যার উপরে মর্মর পাথর বসানো রয়েছে।

রুকনে ইয়ামানী ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। যেহেতু এটি ইয়ামানের দিকে অবস্থিত, তাই একে রুকনে ইয়ামানী বলা হয়।

রুকনে ইরাকী ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর-পূর্ব কোণ– যা ইরাকের দিকে অবস্থিত।

রুকনে শামী ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর পশ্চিম কোণ– যা সিরিয়ার দিকে অবস্থিত।

মাক্বামে ইব্রাহীম ঃ কা'বা ঘরের পূর্ব পাশের দরজার সামনে কাঁচ দ্বারা সুরক্ষিত একটি ছোট্ট ঘরই হচ্ছে মাক্বামে ইব্রাহীম। ঘরের ভেতরে ইব্রাহীম (আঃ) এর পবিত্র পায়ের ছাপবিশিষ্ট পাথর রয়েছে। তিনি এ পাথরে পা রেখে কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। এর ওপর দাঁড়ালে পাথর আল্লাহ্র হুকুমে অলৌকিকভাবে প্রয়োজনমতো উঠা-নামা করতো। হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে এ পাথর নিয়ে আসেন।

মসজিদুল হারাম ও সাফা-মারওয়ার নক্শা

হজ্জ ও ওমরা বিষয়ক আমলগুলোর বেশিরভাগ বায়তুল্লাহ্, মসজিদুল হারাম এবং সাফা-মারওয়ার সঙ্গে সংশি-ষ্ট। সুতরাং এ পবিত্র স্থানগুলোর বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকলে, উক্ত আমলগুলো করা এবং ভীড়ের সময় দলচ্যুত সাথী খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।

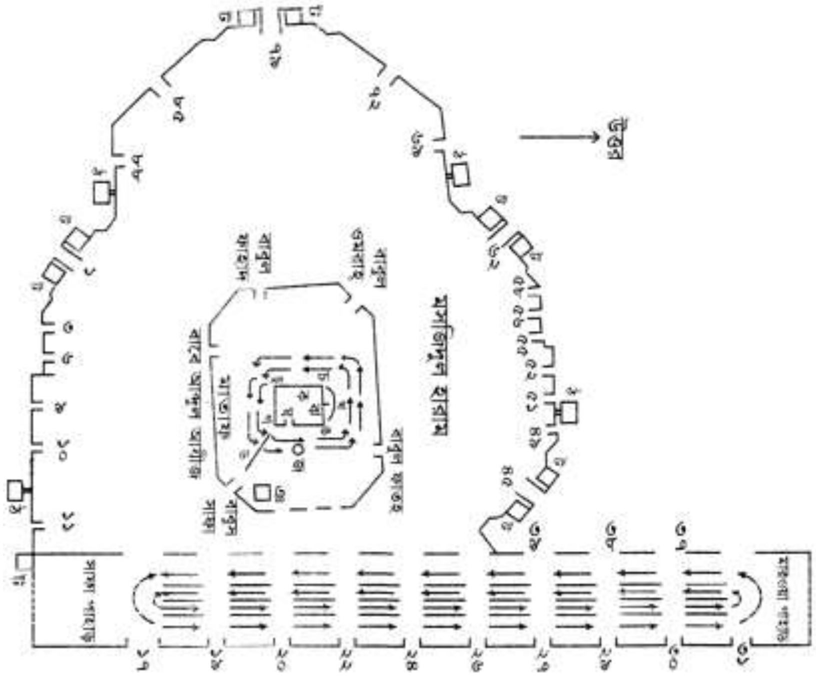

নং	বিষয়	নং	বিষয়
ক)	বায়তুল্লাহ্	খ)	হাতীম (প্রাচীন বায়তুল্লাহ্র অংশ)
গ)	হাজরে আসওয়াদ এবং উক্ত রোকন (কোন)	ঘ)	বাবুল কা'বা (বাব-দরজা)
ঙ)	রোকনে ইরাকী	চ)	রোকনে শামী
ছ)	রোকনে ইয়ামানী	জ)	মাকামে ইব্রাহীম
ঝ)	মীজাবে রহমত (বায়তুল্লাহ্র ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত প্রণালী)	ঞ)	যমযম কূপ
ট)	মিনার	ঠ)	সিঁড়ি ঘর
ড)	তাওয়াফ শুরু ও শেষ রেখা		

নং	বিষয়	নং	বিষয়
১	বাবে আব্দুল আযীয	৩	বাবুল আযীয়াদ
৬	বাবে বিলাল	৯	বাবে হুনাইন

১০	বাবে ইসমাঈল	১১	বাবুস সাফা
১৭	বাবে বনী হাশেম	১৯	বাবুল আলী
২০	বাবুল আব্বাস	২২	বাবুন নবী
২৪	বাবুস সালাম	২৬	বাবে বনী শাইবা
২৭	বাবে হাজুন	২৯	বাবে মা’আলা
৩০	বাবে মুদআ	৩১	বাবে মারওয়া
৩৭	বাবে মুহাচ্ছাব	৩৮	বাবে আরাফাত
৩৯	বাবুল মিনা	৪৫	বাবুল ফাতহ
৪৯	বাবুল ওমর	৫১	বাবুন নাদোয়া
৫২	বাবুশ শামিয়া	৫৫	বাবুল কুদস
৫৬	বাবুল মদীনা	৫৮	বাবে হুদাইবিয়া
৬২	বাবুল ওমরা	৬৯ ৭২	দরজা দুটির কোন নাম দেওয়া হয় নাই
৭৯	বাবুল ফাহাদ	৮৫ ৮৮	দরজা দুটির কোন নাম দেওয়া হয় নাই

পবিত্র মসজিদে এরকম দরজা আরো আছে যেগুলোর নাম নম্বর কিছুই নেই এবং আলোচ্য চিত্রেও সেগুলোর উল্লেখ করা হয়নি। এর নীচ তলায় (আন্ডার গ্রাউন্ড) অবতরণ করার দরজাগুলোও এখানে দেখানো হয়নি। এই দরজাগুলো কেবল রমযান ও হজ্জের মাসে খোলা হয়। মসজিদুল হারাম থেকে মাতাফে (তাওয়াফের স্থান) নামার জন্য সত্যিকারার্থে কোন দরজা নেই; চতুর্দিকের রেলিং ও অনুচ্চ দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে যে কয়টি স্থানকে চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে এটাই বাবুল ফাতাহ্, বাবুল ওমরা, বাবুল ফাহাদ, বাবে আব্দুল আযীয ও বাবুস সাফা। এগুলোর জন্য কোন নম্বর নির্দিষ্ট করা হয়নি। অক্ষর চিহ্নিত ঘরগুলোতে আছে উপরে যাতায়াত করার সিঁড়ি ও একস্যালেটর; এগুলোও কেবল রমযান ও হজ্জের মৌসুমে খোলা হয়। সাফা ও মারওয়ায় তীর চিহ্নিত বহির্মোড় পায়দলে এবং অন্তবর্তী মোড় বাহনে চড়ে সাঈ করার জন্য দেখানো হয়েছে। অক্ষম ও মাযূরদের এই বাহনগুলো আসলে এক প্রকার হুইল চেয়ার এবং মসজিদুল হারামের মধ্যে এগুলো পাওয়া যায়।

বায়তুল্লাহ্ শরীফের মত মসজিদুল হারামেরও সংস্কার ও সম্প্রসারণ হয়েছে অনেকবার। ইহার বর্তমান আয়তন তিন লক্ষ আটাশ হাজার বর্গ মিটার এবং পূর্বের আয়তন ছিল মাত্র এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার বর্গ মিটার। বর্তমানে এই মসজিদে প্রায় দশ লক্ষ লোক এক সঙ্গে নামায আদায় করতে পারে; কিন্তু একই জামাতে পূর্বে শরীক হতে পারতো মাত্র চার লক্ষ দশ হাজার লোক। এই পবিত্র মসজিদে সর্বমোট চারশো ঊনপঞ্চাশটি গম্বুজ এবং নয়টি মিনার আছে।

পবিত্র মসজিদের চতুষ্পার্শ্বে বিশেষ করে পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্ব কল্পনাতীতভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। অতঃপর একে সমতল করে, এর উপর মাতাফের অনুরূপ পাথর বিছানো হয়েছে। এখানেও নামায আদায় করতে পারে বেশ কয়েক লক্ষ লোক; এতদসত্বেও হজ্জের মৌসুমে স্থান সঙ্কুলান হয় না। এই সম্প্রসারণের চতুর্দিকে, বিশেষ করে মিসফালার দিকে, অনেকগুলো আন্তর্জাতিক মানের হোটেল তৈরী করা হয়েছে।

সম্প্রসারণের নীচে (আন্ডার গ্রাউন্ড) দ্বিতল হাম্মামখানা তৈরী করা হয়েছে। মোট আটটি হাম্মামখানার মধ্যে চারটি পুরুষের এবং চারটি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এখানকার আন্ডার গ্রাউন্ড, বাস-ষ্ট্যান্ডও অতি বিখ্যাত।

জাহেরী কা'বা ও বাতেনী কা'বা

উদ্ধৃতি ঃ কুতুবুল এরশাদ সূফী মৌলভী হাবিবুর রহমান (রাঃ) কর্তৃক লিখিত **"হজ্জ দর্পণ"** কিতাব–

মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (রঃ) বলেছেন যে, "প্রকৃত কা'বা মক্কা শরীফের সেই চতুষ্কোণ প্রস্তর নির্মিত গৃহ নহে। মোমিন বান্দার হৃদয়ই প্রকৃত কা'বা বা আল্লাহর ঘর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্যই বলিয়াছেন–

الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ حُرْمَةً مِّنَ الْكَعْبَةِ

"মোমিন কা'বা শরীফ হইতেও (আল্লাহর নিকট) অধিকতর সম্মানী।"

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"আমার সাথে কোন কিছু শরীক করিও না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী অবস্থানকারী এবং রুকু ও সেজদাকারীগণের নিমিত্ত (নামাযির জন্য) পবিত্র রেখ।"– কোরআন (২২ঃ২৬)। প্রকাশ্য কা'বা জগতের তাওয়াফকারীদের জন্য পরিষ্কার রেখ এবং বাতেনী কা'বাকে ক্বলবে (হৃদয়কে) মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত পবিত্র রেখ।

হজ্জের শর্ত ও ফরয সমূহ আদায় পূর্বক কা'বা গৃহের তাওয়াফ করাকে শরীয়তের হজ্জ বলে। এরূপ হজ্জের প্রতিফল দোজখ হতে পরিত্রাণ ও আল্লাহ্ ক্রোধ হতে নিস্কৃতি লাভ, যেমন– আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

"যে এই ঘরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপদ হয়েছে।"– কোরআন (৩ঃ৯৭)

বক্ষস্থিত লতিফা সমুহকে আল্লাহর নামের জিকির দ্বারা উদ্ভাসিত করে কলবের তাওয়াফ করত নিজ বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করাকে তরিকতের হজ্জ বলে। এরূপ হজ্জের

প্রতিফল আল্লাহ্ তা'য়ালার মহান দিদার লাভ ও তাঁর কৃপায় বিভিন্ন কু-প্রবৃত্তির প্রভাব হতে পরিত্রাণ লাভ। এই মর্মে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"জেনে রাখ, তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিতও তবে না, যারা আল্লাহ্র বন্ধু"।–কোরআন (১০ঃ৬২)

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন "ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আল্লাহ্ কোথায়? পৃথিবীতে না আকাশে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন–

فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ

"তাঁহার মোমিন বান্দাদের হৃদয়ে (ক্বলবে)।"– এহিয়া-উল-উলুম

এই জন্যই এক আশেক গেয়েছেন–

"নহে এক মোমিন হিয়ার সমান,
হাজার কা'বা হাজার মসজিদ
কি হবে তোর কা'বার খোঁজে,
আসন তাঁর খোঁজনারে তোর দিল-কা'বায়।
প্রেমের নূরে যে দিল রৌশন
যেথায় থাকুক সমান তাহার–
খোদার মসজিদ, ছাবিয়ান মন্দির,
খৃষ্টান-গীর্জা আর ইহুদ খানায়।
অমর তাঁর নাম প্রেমের খাতায়,
জ্যোতির হরফে রবে লেখা;
দোজখের ভয় করে না সে,
থাকে না সে বেহেশত আশায়।"

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَا يَسَعُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي بَلْ يَسَعُنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِن

"আকাশ ও ভূ-মন্ডলে আমার স্থান সঙ্কুলন হয় না, কিন্তু আমার মোমিন বান্দার হৃদয়ে (ক্বলবে) আমার স্থান সঙ্কুলান হয়।" মানব হৃদয়ে কিরূপে আল্লাহ্ তা'য়ালার তাজাল্লার বিকাশ হয় তাহা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালাই সূরা নূরে ব্যাখ্যা করতেছেন–

مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ـ الْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ

"আল্লাহপাক আকাশ ও ভূ-মন্ডলের জ্যোতি (অস্তিত্বেরমূল); তাঁর নূর একটি তাকস্থিত প্রদীপ সদৃশ।"–কোরআন (২৪ঃ৩৫)

এই গুপ্ত ভেদের কথাই আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ মৌলভী সুফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) কি সুন্দরভাবে গেয়েছেন–

"কোথায় ওরে খুজিস তাঁরে
আকাশ চারী কবির দল,
প্রেমিক-দিলের আয়নাতে আজ
দেখনা প্রিয়ার মুখ-কমল।"

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা তদ্প্রণীত "আল্লাহ্ প্রাপ্তির সোজা-পথ" নামক পুস্তকে পূর্ণভাবে দেয়া হয়েছে; আশেকগণ তা দেখে নিবেন।

চর্ম চক্ষু দ্বারা কেউ কখনও আল্লাহু তা'য়ালাকে দেখতে পারে না; তাঁকে হৃদয়-দর্পণেই দেখা যায়। সুতরাং হৃদয়-দর্পণকে কামেল পীরের দীক্ষা দ্বারা পবিত্র করে আল্লাহ্ তা'য়ালার দিদার লাভ করে বাতেনী হজ্জ সম্পাদন করুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমার মুর্শিদ কেবলার লিখিত "হজ্জ দর্পণ" কিতাবখানা পাঠ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাস (রাঃ)-কে বলেছেন– "ওহে প্রিয় বৎস! প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল যদি তোমার মনে কারো প্রতি অহিত কামনা না রেখে অতিবাহিত করতে পার তবে সেরূপ কর; কারণ তা আমার স্বীয় সুন্নত (অভ্যাস); এবং যে আমার সুন্নতকে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসল এবং যে আমাকে ভালবাসে সে আমার সাথে বেহেশতে থাকবে।"

মক্কা শরীফের গুরুত্বপূর্ণ গৃহ সমূহ

১। **প্রাণের নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাড়ি ঃ** মসজিদুল হারাম থেকে প্রায় ৪৪০ গজ পূর্বে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিতার বাড়ি। এখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্ম হয়। এ বাড়িটি এখন পাঠাগার। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাসগৃহ এবং মসজিদুল হারামের মাঝে ছিল আবূ জাহলের বাড়ি। বর্তমানে এ বাড়িটিতে গোসলখানা, প্রস্রাবখানা ও পায়খানা করা হয়েছে।

২। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর সেই গৃহ, যেখানে হযরত ফাতেমা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানে বসবাস করতেন। কোন কোন আলেমের মতে এই গৃহটি মক্কা মুকাররমায় মসজিদে হারাম ব্যতীত সকল স্থান হতে উত্তম।

৩। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর গৃহ। যেখানে দুটি পাথর ছিল। উহাদের একটির নাম মুতাকাল্লিম বা কথক এবং অন্যটির নাম মুত্তাকা বা হেলানস্থল।

৪। যুকাক ঃ যা সাওয়াগীনে অবস্থিত।

৫। হযরত আলী (রাঃ) এর জন্ম স্থান যা শিঅ'বে বনী-হাশিমে অবস্থিত।

৬। দারে আরকাম ঃ বর্তমানে এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং সাফা-এর নিকটে অবস্থিত। হযরত ওমর (রাঃ) এ ঘরেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে এ জায়গাটিকে সা'ফা ও মারওয়ার অন্তর্ভূক্ত করে ফেলা হয়েছে।

পবিত্র যম্‌যমের পানি

যম্‌যম্ হলো একটি কূপের নাম। মসজিদে হারামের ভেতরেই বাইতুল্লাহ্ শরীফ থেকে পূর্ব দিকে ৩৮ হাত দূরে মাতাফের মধ্যে অবস্থিত। জমজম কূপটি প্রায় ১৮×১৪ ফুট। একজন ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি মানুষকে কূপে নামানো হলে তার কাঁধ পর্যন্ত ডুবে যায়। সম্পূর্ণ কূপ হাঁটলেও তার মাথা কখনো ডুবে যায়নি। কূপের মধ্যে কোনো পাইপ বা ছিদ্র নেই। সমুদ্র সমতল (Sea Level) থেকে নীচে অবস্থিত। যমযম অর্থ হলো থাম থাম। হযরত হাজিরা (আঃ) সাফা-মারওয়া দৌঁড়ের পর এসে যখন দেখলেন পানি গড়ায়ে যাচ্ছে তখন তিনি বলেছিলেন যম্‌যম্ ।

যম্‌যম্ শব্দের অর্থ প্রচুর। যেমন বলা হয় "যম্‌যম্" অর্থাৎ প্রচুর পানি। যেহেতু তাতে প্রচুর পানি বিদ্যমান রয়েছে, তাই তাকেও যমযম নামে অভিহিত করা হয়। যমযম অনেক নামে পরিচিত। যেমন- কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

সুকইয়া ইসমাঈল ঃ অর্থ ইসমাঈলের পানীয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত ইসমাঈলের পানির পিপাসা নিবারণ করার জন্য এটা দান করেন।

সাইয়েদাহ ঃ অর্থাৎ,নেতা। কেননা, যম্‌যমের পানি দুনিয়ার সকল পানির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

সিকায়াতুল হাজ্জ ঃ অর্থাৎ হাজীর পানীয়। কেননা, হাজী সাহেবরা যম্‌যমের পানি বিশেষভাবে পান করেন বলে এ নামে অভিহিত করা হয়।

বরকত ও মুবারক ঃ অর্থাৎ যম্‌যমের পানির মধ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা বরকত দান করেছেন।

বাররাহ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নেক বান্দা ইসমাঈলকে এটা দান করেছেন।

বুশরা ঃ কেননা, এটা হাজেরা (রাঃ)'র জন্য বিরাট সুসংবাদ ছিল।

যম্‌যমের পানির ইতিহাস খুবই প্রসিদ্ধ। মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত বিবি হাজেরা (আঃ) ও শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে কিছু খেজুর এক মশক পানিসহ লুক্কায়িত কা'বা শরীফের স্থানে নির্বাসনে রেখে গেলেন। খাবার ফুরিয়ে গেলে দু'জনই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হলেন। অনেক ছোটা-ছোটি করলেন; কিন্তু ব্যর্থ হলেন। অকুল ক্রন্দনে বুক ভাষালেন। আল্লাহ্ রহমতের দৃষ্টি দিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কদমতলে পদাঘাত করলেন বা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কদমের ঘর্ষণে মাটিতে গর্ত হলো ও অবিরল ধারায় পানি নির্গত

হলো। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত হাজেরাকে বললেন, এ পানি আল্লাহ্র রহমত। আপনাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারক। এর স্রোতধারা কোন দিনই নিঃশেষ হবে না। বাস্তবেই তাই হয়েছে। এই যম্যম্ কূপকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে মক্কা শরীফে ঘন বসতি গড়ে উঠে।

যম্যমের পানির ফজিলত ঃ

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যম্যমের পানি পৃথিবীর সকল পানি থেকে উত্তম উপাদেয় এবং সকল পানির সরদার। অবশ্য যে পানি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অঙ্গুলি মোবারক থেকে মু'যিযাস্বরূপ নির্গত হয়েছিল তা যম্যমের পানির থেকেও উত্তম ছিল। যম্যমের ফযিলত এবং উপকারিতার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার ফযিলত ও উপকারিতা সম্বলিত দু'টি সংক্ষিপ্ত হাদিস উল্লেখ করা হলো–

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ مَاءٍ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ فِيْهِ طَعَامُ طَعِمٍ وَشِفَاءُ سَقَمٍ اَلْحَدِيْثُ .

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– "সমগ্র বিশ্বের মধ্যে উত্তম পানি হলো যম্যমের পানি। যাতে খাদ্য-সামগ্রীর মত খাদ্যপ্রাণও রয়েছে এবং রোগীদের জন্য নিরাময়ও রয়েছে।"

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ مَنْ شَرِبَ لِمَرَضٍ شَفَاهُ اللّٰهُ اَوْ لِجُوْعٍ اَشْبَعَهُ اللّٰهُ اَوْ لِحَاجَةٍ قَضَاهَا اللّٰهُ . رَوَاهُ الْمُسْتَغْفِرِى فِى الطِّبِّ عَنْ جَابِرٍ اَلْجَامِعِ الصَّغِيْرِ لِلسُّيُوْطِى .

অর্থাৎ, যম্যমের পানি এমন প্রত্যেক কাজের জন্যই উপকারী যার নিমিত্ত তা পান করা হবে। যদি কেউ রোগ-বালাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য তা পান করে, আল্লাহ্পাক তাকে সুস্থতা দান করবেন। ক্ষুধা নিবারণের জন্য পান করলে আল্লাহ্পাক তার পেট ভরে দেবেন এবং কোন প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে পান করলে আল্লাহ্ পাক তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।

উক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, যম্যমের পানি খাদ্য, ঔষধ এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হওয়ার জন্য মোক্ষম বস্তু। তবে এর জন্য নিয়তের পবিত্রতা এবং বিশ্বাসে আন্তরিকতা পূর্বশর্ত। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম 'যা দুল মা'আদ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমি কোন কোন লোককে অর্ধ-মাস পর্যন্ত বরং তার চেয়েও বেশী সময় শুধু জমজমের পানি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে দেখেছি এবং তার কোন ক্ষুধা

পেতে দেখিনি। তিনি স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য লোকদের ন্যায়ই তাওয়াফ করতেন। সেই লোকটি আমাকে বলেছেন যে, আমি কোন কোন সময় দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুধু জমজমের পানির উপরে কাটিয়ে দিয়েছি এবং খাদ্যের ব্যাপারে কোন তাগিদ অনুভব করি নি। রোযাও রাখতাম আবার তাওয়াফ এবং স্ত্রী সহবাসও করতাম।

একবার কূপের পানি পরীক্ষার জন্য সেচ করা হয়েছিল। পানি যখন কমে আসে তখন নিচের বালু নাচতে থাকে। বালু চুইয়ে পানি ওঠে। সৌদি ও ইউরোপীয় গবেষণায় পরীক্ষা করে দেখা যায় সাধারণ পানির তুলনায় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম একটু বেশী। এর চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো এতে রয়েছে ফ্লোরাইড, যাহা জীবাণুনাশক ক্ষমতা রাখে। পরিশ্রান্ত হাজী সাহেবদের ইহা শক্তি বর্ধক টনিক তুল্য।

মাথায় ও গায়ে যম্‌যমের পানির ছিটা দেয়া ঃ

এ ব্যাপারে চার ইমাম একমত যে, জমজমের পানি মাথায় ও গায়ে ছিটানো মুস্তাহাব। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জমজমের পানি পান করার পর মাথায় কিছু পানি ছিটাতেন।

যম্‌যমের পানি দ্বারা ওযূ করা ঃ

জমজমের পানি দ্বারা ওযূ করাও মুস্তাহাব। হযরত শাইখ আবদুল্লাহ হাযারামী (রঃ) মক্কায় ৫৩ বছর ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে যম্‌যমের পানি ছাড়া অন্য পানি দিয়ে ওযূ করেননি।

কাউকে যম্‌যমের পানি পান করানো সওয়াবের কাজ ঃ

আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের যমযমের পানি পান করাতে দেখে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, বালতি ভরে ভরে পানি পান করাও। আমি তোমাদের সাথে পানি তোলা শুরু করলে মানুষ তোমাদের নিকট থেকে বালতি ছিনিয়ে নিয়ে পানি তোলা শুরু করে দেবে, আমার এ আশঙ্কা না হলে আমি তোমাদের সাথে পানি তোলার কাজে অংশগ্রহণ করতাম।

যম্‌যমের পানি পান করার আদব ঃ

যমযমের পানি পান করার সময় কতিপয় বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত। যেমন– কিবলামুখী হয়ে পান করা, তিন নিঃশ্বাসে পান করা, প্রত্যেকবার পানি পান করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা, প্রত্যেকবার পান শেষে নিঃশ্বাস নেয়ার সময় আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা, যমযমের পানি যত বেশি সম্ভব পান করা, ডান হাত দ্বারা পান করা, পান করার সময় দোয়া করা।

যম্‌যমের পানি পান করার দো'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইল্‌মান নাফিআও ওয়া রিযকান ওয়াসিআও ওয়া শিফাআন্ মিন্ কুল্লি দায়ীন।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ফলপ্রসূ জ্ঞান, স্বচ্ছল জীবিকা এবং সকল রোগের নিরাময় কামনা করছি।"

নিম্নের দো'আটি প্রতি চুমুক অন্তে পড়া ভাল ঃ

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ

"বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহি।"

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি।

যম্‌যমের পানি দেশে আনা ঃ

হজ্জ বা ওমরাহ্ করতে কিংবা অন্য উদ্দেশ্যে যারা মক্কায় যান তাদের যমযমের পানি দেশে আনার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই যমযমের পানি মক্কা থেকে মদীনায় নিয়ে যেতেন এবং অসুস্থ মানুষকে পান করাতেন; এ পানি তাদের গায়ে ছিটাতেন। আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) এর কাছে চিঠি লেখেন। চিঠিতে উল্লেখ করেন, 'যদি আমার চিঠি রাতেও পাও তাহলে সকালের জন্য আর যদি দিনে পাও তাহলে রাতের জন্য অপেক্ষা করবে না। আমার জন্য যমযমের পানি পাঠাবে। সুহাইল এ চিঠি পাওয়ার পর উটের পিঠে করে পানি পাঠান। সাহাবা ও তাবেয়ীনরা মক্কা থেকে বিভিন্ন স্থানে যম্‌যমের পানি নিয়ে যেতেন। এ কারণে চার ইমামের মতে, কাউকে পানি পান করানোর জন্য যম্‌যমের পানি নেয়া সওয়াবের কাজ।

যম্‌যমের পানির মাসআলা ঃ

১। যম্‌যমের পানি অধিক পরিমাণ পান করা মুস্তাহাব; বরং ঈমানের আলামত।

২। যম্‌যম্ আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অবলোকন করাও এবাদত।

৩। যম্‌যমের পানি দ্বারা বরকত হিসাবে ওযূ-গোসল করা জায়েয।

৪। যম্‌যমের পানি দ্বারা কোন নাপাক বস্তু ধৌত করা উচিত নয়– চাই কাপড়ই হোক অথবা অন্য কোন নাপাক বস্তু। নাপাক ব্যক্তির জন্য তা দ্বারা গোসল করাও উচিত নয়। (শরহে লুবাব) কিন্তু 'দুররে মুখতার' এবং 'রদ্দুর মুহতার' থেকে জানা যায় যে, যমযমের পানি দ্বারা বিনা কারাহাতে হাদাসে আসগর (ছোট নাপাকী) এবং হাদাসে আকবর (বড় নাপাকী) দূরীভূত করা জায়েয, কিন্তু নাপাক বস্তু দূরীভূত করা মাকরূহ।

৫। যম্‌যমের পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা মাকরূহ। কোন কোন আলেমের মতে হারাম। কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তি জমজমের পানি দ্বারা ইস্তিনজা করেছিল। ফলে তার অর্শ্ব রোগ দেখা দেয়।

৬। যম্‌যমের পানি অন্যত্র তাবাররুক হিসাবে নিয়ে যাওয়া এবং মানুষকে পান করানো মুস্তাহাব। এ পানি পীড়িত লোকদের উপরে ঢালাও জায়েয।

৭। যদি কারো নিকট যমযমের পানি থাকে আর তা ছাড়া ওযূ গোসলের অন্য কোন পানি পাওয়া না যায়, তবে তার দ্বারা ওযূ গোসল ওয়াজিব হবে, তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না।

৮। যম্‌যম্ কূপ মসজিদের ভেতরে অবস্থিত। তার চারপাশের ভূমি মসজিদ। এজন্য তাতে ওযূ অথবা জানাবাতের গোসল জায়েয নয়। এমনিভাবে থুথু ফেলা, নাকের শে- ষ্মা নিক্ষেপ করা অথবা জানাবাতের অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করাও জায়েয নয়।

৯। যম্‌যমের পানি আনয়ন করা জায়েয।

জান্নাতুল মুয়াল্লা

মসজিদুল হারাম থেকে উত্তর দিকে আনুমানিক দুই কিলোমিটার দূরে এ গোরস্থান। এখানে খাদিজা (রাঃ), নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাতা আমিনা, দাদা আবদুল মোত্তালিব, চাচা আবূ তালেব, পুত্র কাসেম (রাঃ) সহ অনেক সাহাবীর রওজা পাক অবস্থিত।

মক্কা মুকাররমাহ্ ও মিনার মসজিদ সমূহ

মসজিদে হারাম ছাড়াও মক্কা মুকাররমা এবং তার আশে-পাশে আরো অসংখ্য যিয়ারত করার উপযুক্ত মসজিদ বিদ্যমান রয়েছে। সেইগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ঃ

মসজিদে রায়াহ্ ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন এই স্থানে বিজয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। এটা জান্নাতুল মোয়াল্লার রাস্তায় অবস্থিত।

মসজিদে জ্বিন ঃ এখানে জ্বিনেরা উপস্থিত হয়ে কোনআন শরীফ শ্রবণ করেছিলেন।

মসজিদে তানঈম ঃ এখানে লোকজন উমরার ইহরাম বেঁধে থাকেন। এটা মক্কা মুকাররমাহ্ হতে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। একে মসজিদে আয়েশাও বলা হয়।

মসজিদে গনম বা মসজিদুল ইজাবাহ ঃ এটা ওয়াদিয়েমুহাস্‌সাবের নিকটবর্তী মুয়াবিদাহ মহল্লায় অবস্থিত।

মসজিদে যি-তুয়া ঃ এটি তানঈমের রাস্তায় অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় এখানে অবতরণ করেছিলেন।

মসজিদে খায়েফ ঃ এটা মিনার সবচেয়ে বড় মসজিদ। কথিত আছে যে, এখানে ৭০ জন নবী সমাহিত রয়েছেন।

মসজিদে নামিরাহ্ ঃ এটা আরাফাতের প্রান্তদেশে অবস্থিত।

মসজিদে মাশআরুল-হারাম ঃ এটা মুযদালিফায় অবস্থিত।

মসজিদে জাবালে আবি কুবাইস ঃ এটা জাবালে আবি কুবাইসে অবস্থিত।

মসজিদে আকাবা ঃ এটা মিনার সন্নিকটে বাম দিকে রাস্তা হতে সামান্য দূরে অবস্থিত।

মসজিদে দারুন্নাহর ঃ এটা মিনায় জামরায়ে উলা এবং উসতার মাঝখানে অবস্থিত।

মসজিদে কাবাশ ঃ এটা ঠিক সেই স্থানে অবস্থিত যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে যবেহ করার জন্য শোয়ানো হয়েছিল।

মসজিদে জিইররানা ঃ এটা তায়েফের পথে অবস্থিত। এখান হতেও উমরার ইহরাম বাঁধা সুন্নত। কিন্তু তানঈম হতে বাঁধাই উত্তম।

মসজিদুল হারামের অদূরে দক্ষিণে মিস ফালাহ এলাকায় আবূ বকর (রাঃ) ও হামজা (রাঃ) এর বাড়ি ছিল। উভয় স্থানে দুটো মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

মক্কা শরীফের পবিত্র পাহাড় সমূহ

সাফা ও মারওয়া পাহাড় ঃ আল্লাহ্ কোরআনপাকে বলেন, "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটো আল্লাহর নিদর্শনস্বরূপ।"

এ পাহাড় দুটো কা'বা ঘর থেকে পূর্ব দিকে সামান্য দূরে অবস্থিত। একটু দক্ষিণ-পূর্বে সাফা এবং উত্তরে-পূর্বে মারওয়া। দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় ২২৯ মিটার ও উচ্চতা ৫ মিটার। হাজীরা পাহাড় দুটোর মধ্যবর্তী স্থানে সাতবার দৌঁড়া-দৌড়ি করেন। কারণ, হযরত মা হাজেরা (আঃ) তাঁর শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে যম্‌যম্ কূপের পাশে রেখে পানির জন্য পাহাড় দুটোর মধ্যবর্তী স্থানে সাতবার দৌঁড়ান। এ পাহাড়ের কাছেই হযরত আরকাম (রাঃ) এর বাসগৃহ ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখান থেকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। হযরত ওমর (রাঃ) এ বাসগৃহে ইসলাম গ্রহণ করেন।

নূর পাহাড় ঃ মসজিদুল হারাম থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এ পাহাড়ের হেরা গুহায় হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবাদত করেন। এখানে প্রথম ওহী নাযিল হয় এবং নবুওয়ত লাভ করেন। পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় দুই হাজার ফুট। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে দুই কিলোমিটার আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে চূড়ায় ওঠা যায়। পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায় হেরা গুহাটি। প্রবেশ পথ ছাড়া সব দিক ঘেরা।

সাওর পাহাড় ঃ মসজিদুল হারাম থেকে ছয় কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বকর (রাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় প্রথম হিজরতের সময় এ পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সাওর পাহাড়ের উচ্চতা চার হাজার ফুট।

জাবালে আবি কুবাইস ঃ এটা বায়তুল্লাহ্ শরীফের সম্মুখে অবস্থিত। সাফা পর্বত হয়ে এতে আরোহণ করা যায়। এর উচ্চতা বেশী নয়। কেহ কেহ বলেন চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা এখানেই সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু বোখারীর রেওয়ায়তে জানা যায় যে, উক্ত ঘটনা মিনায় সংঘটিত হয়েছিল। জাহেলীয়া যুগে উক্ত পাহাড়ের নাম ছিল ‘আমীন’। কারণ, হযরত নূহ (আঃ)-এর মহা প-াবনের পর হতে এখানে হাজরে আসওয়াদ সংরক্ষিত ছিল। আবু কুবাইস নামক জনৈক ব্যক্তি যখন সেখানে গৃহ নির্মাণ করেন, তখন হতে এটা জাবালে আবি কুবাইস নামে অভিহিত হয়ে আসছে। ইমাম মুজাহিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা’আলা সকল পাহাড়ের পূর্বে পৃথিবীর বুকে উক্ত পাহাড়টি সৃষ্টি করেছিলেন।

জাবালে রহমত ঃ আরাফাত ময়দানে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ এ পাহাড়টি হযরত আদম (আঃ)-এর দোয়া কবুল ও হযরত হাওয়া (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাতের স্থান। এখানে কান্নাকাটি করে হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অছিলায় রহমত লাভে ধন্য হয়েছেন বলেই এ পাহাড়ের নাম ‘জাবালে রহমত’। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ পাহাড়ের পাদদেশেই বিদায় হজ্জের ভাষণ দিয়েছিলেন। হাজীগণ এখানেই গুনাহ্ মাফের আশায় কান্না-কাটি করেন ও আল্লাহ্র রহমত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

মক্কা শরীফ দোয়া কবুলের স্থান

নং	স্থান	নং	স্থান
০১	মাতাফ (তাওয়াফের স্থান)	০২	মুল্তাজিম
০৩	মিজাবে রহমত	০৪	মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে
০৫	হাতীমের মধ্যে	০৬	রোকনে ইয়ামানী ও হাজারে আছওয়াদের মধ্যে
০৭	দরজা সোজা বিস্তৃত স্থান	০৮	যমযম কুয়ার নিকট
০৯	সাফা পাহাড়ের উপর	১০	মারওয়া পাহাড়ের উপর
১১	সাঈ করার স্থানে, বিশেষভাবে সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান	১২	বাইতুল্লাহ্ শরীফের দিকে চোখ পড়ার সময়
১৩	মসজিদে খায়েফ ও মিনা ময়দান	১৪	আরাফাতের ময়দান
১৫	জাবালে রহমত	১৬	মোজদালেফার নিকট

১৭	জামারার নিকট	১৮	জাবালে নূর
১৯	জাবালে ছাওর	২০	জান্নাতুল মুয়াল্লায়
২১	মসজিদে কাবাশ	২২	মসজিদে মাশ্‌য়ারেল হারাম
২৩	মসজিদে রায়াহ	২৪	মসজিদে জ্বিন
২৫	মসজিদে গনম বা ইজাবাহ্	২৬	মসজিদে যি তুয়া
২৭	মসজিদে নামেরা	২৮	মসজিদে জাবালে আবি কুরাইস
২৯	মসজিদে আকাবাহ্	৩০	মসজিদে দারুন্নাহার
৩১	মাওলুদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	৩২	দারে আরকাম (রাঃ)
৩৩	গারে হেরা	৩৪	মসজিদে জিরানা

পবিত্র হজ্জ ও ওমরা সম্পাদনকারীদের নেক আমল

মক্কা শরীফে করণীয় নেক আমল ঃ

১। পবিত্র হজ্জ ও ওমরা আদায় করা।

২। প্রাণের নবিজীর নামে, নিজ পীরের নামে, মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধবের নামে ওমরা সম্পাদন করা বা তাওয়াফ করা।

৩। মক্কা শরীফ অবস্থানের সময় বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো ওমরা আদায় বা বাইতুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করা।

৪। বুক ভরা আশা নিয়ে মালিকের বাড়ী আসছেন। বিনা প্রয়োজনে সময় নষ্ট না করে যত বেশি সম্ভব হেরেম শরীফেই এবাদত করে সময় কাটাবেন। বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে তাকিয়ে থাকাও ইবাদত। জীবনের তৃষ্ণা মিটে যাবে, অনন্য প্রশান্তিতে হৃদয়ে ভরপুর হয়ে যাবে।

৫। নামাজের তালিকা দেখে বিভিন্ন নামায আদায় করা।

৬। সম্ভব হলে কোরআন শরীফ খতম করা বা যথাসাধ্য তেলাওয়াত করা, সূরা ইয়াছিন, সূরা আর-রহমান, সূরা মুলক্, সূরা দোখান, সূরা মুজাম্মেল, সূরা ওয়াকিয়া, দরূদে তাজ, দরূদে লাখি ইত্যাদি পড়া।

৭। সকাল সন্ধ্যা অজিফা, জিকির আজকার আদায় করা।

৮। সম্ভব হলে ২/১টি রোজা রাখা।

৯। কিছু দান খয়রাত করা।

১০। বেশি বেশি তওবা করা, জিকির আজকার করা, দরূদ শরীফ পড়া।

মদীনা শরীফে করণীয় নেক আমল ঃ

মদীনা মুনাওয়ারার কাছাকাছি পৌঁছালে প্রাণের নবীজীর মহব্বতে দরূদ-সালাম বেশি বেশি করে পড়বেন। মসজিদে নববীতে প্রবেশের পূর্বে মেছওয়াক করে অযু করবেন। সম্ভব হলে গোসল করে নিবেন। মসজিদে প্রবেশ করে দুখুলুল মসজিদ ২ রাকআত সুন্নাত নামায পড়বেন। যখনই প্রবেশ করবেন তখনই সম্ভব হলে এই নামায পড়বেন।

প্রাণের নবিজীর রওজা পাকের জেয়ারত করা, জান্নাতুল বাকী, শোহাদায়ে উহুদদের জন্য ছোয়াব রেছানী করা, জেয়ারতের স্থান সমূহে যাওয়া এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বন্ধুদের স্মরণ করা, লিখিত মক্কা শরীফের আমল সমূহ যাহা মদীনা শরীফে করা যায়, তা সহজ সাধ্যমত করা। বিশেষভাবে ৪০ ওয়াক্ত নামায তকবিরে উলার সাথে মসজিদে নববীতে আদায় করা।

সেরা ইবাদত নামায ঃ

১। হেরেম শরীফে জামাতের সাথে ফরয নামায আদায়ের চেষ্টা করা।

২। কাজা নামায থাকলে তা আদায় করা।

৩। তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা।

৪। এশরাক নামায আদায় করা।

৫। চাশত/দোহা নামায আদায় করা।

৬। যাওয়ালের (সূর্য হেলার পর) নামায আদায় করা।

৭। আছর ও এশার নামাযে ফরযের পূর্বে ৪ রাকআত সুন্নাত আদায় করা।

৮। আওয়াবিন নামায আদায় করা।

৯। দুখুলুল মসজিদ নামায আদায় করা।

১০। তাহিয়্যাতুল অযু নামায আদায় করা।

১১। ছালাতুত তাছবীহ্ আদায় করা।

১২। কাফ্ফারাতুল বাউল নামায আদায় করা।

১৩। ছালাতুত তওবা আদায় করা।

১৪। ছালাতুশ শোক্র আদায় করা।

১৫। ছালাতুল হাজাত আদায় করা।

১৬। প্রাণের নবিজীর নামে, নিজ পীরের নামে, মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধবের নামে নফল নামায পড়ে বকশিয়া দেওয়া। আপনজনের পরকালে উপকারের জন্য এ আমল করা অতীব জরুরী।

১৭। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য নফল নামায পড়া।

জানাযার নামায ঃ

বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন– "যে ব্যক্তি জানাযায় হাজির হয়ে জানাযার নামায আদায় করবে সে এক কীরাত সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত হাজির থাকবে, সে দুই কীরাত সাওয়াব লাভ করবে। জিজ্ঞাসা করা হল দু'কীরাত কি? তিনি বললেন– দুটি বড় পাহাড় সমতুল্য।"

আল্লাহ্ তা'য়ালা মক্কা ও মদীনা শরীফে আমলের ছওয়াব লক্ষ ও হাজার গুণে বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন।

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে ফরয নামাযের পর পরই (সুন্নতের আগে) জানাযার নামায পড়া হয়ে থাকে।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানেরই জানাযার দু'আগুলো শিখে নেয়া উচিত। কেননা তার নিজের জানাযাও তো অতি নিকটেই রয়েছে।

অতীব আনন্দের সাথে সৌভাগ্য মনে করে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের জানাযায় শরীক হওয়া কর্তব্য। কারণ আপনি একটি অতিরিক্ত ফরয আদায়ের সুযোগ পেলেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহে আপনার আমলনামায় ফরয আদায়ের সারিতে এ নামায জমা হবে, আলহামদুলিল্লাহ্। স্মরণ রাখবেন, এ নামায নফল নয়, সুন্নাত নয় বরং ফরযে কিফায়া। তাই হেলায় এ সুযোগ হারাবেন না।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানেরই জানাযার দু'আগুলো শিখে নেয়া উচিত। কেননা তার নিজের জানাযাও তো অতি নিকটেই রয়েছে।

জানাযা নামায পড়ার নিয়ম ঃ

আরবী বা বাংলায় নিম্নের নিয়ত করতে হবে–

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى صَلٰوةَ الْجَنَازَةِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ وَ الثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ "নাওয়াইতু আন্ উওয়াদ্দিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা সালাতিল জানাযাতি ফারদ্বুল কিফায়াতে ওয়াদ্দুয়াউ লিহাযাল মাইয়েতে ওয়াস্সানাউ লিল্লাহি তা'য়ালা ওয়াস্সালাতু আ'লা রাসুলিল্লাহি মুতাওয়াজ্ জিহান্-ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।"

বাংলায় ঃ "আমি জানাযার ফরযে কিফায়া নামায চার তাকবীরের সাথে কিবলামুখী হয়ে এ ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তিকে দোয়া করার উদ্দেশ্যে আদায় করছি, আল্লাহু আকবার।"

মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে “লিহাযা” এর স্থলে “লিহাযিহি” বলতে হবে। এরপর উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলে হস্তদ্বয় কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমার মত হাত বেঁধে নিম্নের দোয়া পড়তে হয়–

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

“সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়াতাবারা কাস্মুকা ওয়া তা’য়ালা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুক।”

সানা পড়ার পর পুনরায় হাত না উঠিয়ে তাকবীর বলে নিম্নের দোয়া পড়তে হয়–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

“আল্লাহুম্মা সাল্লি-আ’লা মুহাম্মাদিউ ওয়া আ’লা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা আ’লা ইব্রাহিমা ওয়া আ’লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক্ আ’লা মুহাম্মাদিউ ওয়া আ’লা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্তা আ’লা ইব্রাহিমা ওয়া আ’লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্মাজিদ।

এরপর তাকবীর বলে মৃতের জন্য দোয়া পড়তে হয়। মৃত (পুরুষ বা মহিলা) প্রাপ্ত বয়স্ক হলে এ দোয়া পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

“আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লি হাইয়েনা ওয়া মাইয়েতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়েবিনা ওয়া সাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান্ আহ্-ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্ইহি আলাল্ ইসলামী ওয়া মান্ তাওয়াফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আ’লাল ইমানী বি-রাহ্মাতিকা ইয়া আর-হামার রাহিমীন।”

তারপর চতুর্থ তাকবীর বলে ইমাম ডানে ও বামে সালাম ফিরাবেন, সাথে সাথে মুক্তাদীগণও সালাম ফিরাবেন।

মৃত অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে হলে দোয়া পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا

"আল্লাহুম্মাজ্ আল্হু লানা ফারাতাও্ ওয়াজ্আলহু লানা আজরাও্ ওয়াজুখরাও্ ওয়াজ্আলহু লানা শাফিয়াও্ ওয়া মুশাফ্ফাআ।"

মৃত অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে হলে পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

"আল্লাহুম্মা আজআল্হা লানা ফারাতাও্ ওয়াজ্আলহা লানা আজরাও্ ওয়াজুখরাও্ ওয়াজ্আলহা লানা শাফিয়াও্ ওয়া মুশাফ্ফাআতা।"

উপরের দোয়া কারো জানা না থাকলে তারা বলবেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ

"আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লিল্ মু'মিনিনা ওয়াল্ মু'মিনাতি।"

হে আল্লাহ! তুমি নারী-পুরুষ মু'মিনদের ক্ষমা করে দাও।

এত বলতে না পারলে, কেবলমাত্র চার তাকবীর বললেও নামায হয়ে যাবে।

সালাতুত্তাসবীহ্ ঃ

হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে এ নামায শিখিয়ে দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, এ নামায আদায়ে আপনার আগে-পরের নতুন-পুরাতন, সগীরা-কবীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। যদি পারেন তাহলে এ নামায দৈনিক পড়ুন, নতুবা সপ্তাহে একবার, নতুবা প্রত্যেক মাসে একবার, নতুবা বছরে একবার, যদি তাও সম্ভভ না হয়, তাহলে সারা জীবনে একবার হলে ও আদায় করবেন।

এ নামাযে নিম্নলিখিত তাসবীহ্ ৩০০ বার পড়তে হয়–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

"সোবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।"

সালাতুত্তাসবীহ পড়ার নিয়ম ঃ

চার রাকআত সালাতুত্তাসবীহ্র নিয়ত করবেন এবং সানা পড়ার পর সূরা ফাতিহা পড়ার আগে উক্ত তাসবীহ ১৫ বার, ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়ে রুকুতে যাওয়ার আগে ১০ বার, রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহ্র পর ১০ বার, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ১০ বার, প্রথম সিজদাহর তাসবীহর পর ১০ বার, দুই সিজদাহ্র মাঝখানের বৈঠকে ১০ বার, দ্বিতীয় সিজদাহ্র তাসবীহ্র পর ১০ বার। এভাবে (১৫+১০+১০+১০+১০+

১০+১০=৭৫) প্রথম এক রাকআত শেষ হল। এরপর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবেন। দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার আগে ১৫ বার, রুকুতে যাওয়ার আগে ১০ বার, রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহ্র পর ১০ বার, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ১০ বার, প্রথম সিজদাহ্র তাসবীহর পর ১০ বার, দুই সিজদার মাঝখানের বৈঠকে ১০ বার এবং দ্বিতীয় সিজদায় তাসবীহ্র পর ১০ বার, এইভাবে (১৫+১০+১০+১০+১০+ ১০+১০=৭৫) দ্বিতীয় রাকআত শেষ হলো।আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর ৩য় রাকআতের জন্য দাঁড়াবেন।

উক্ত নিয়মে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত পড়বেন। প্রত্যেক রাকআতে ৭৫ বার এবং চার রাকআতে মিলে মোট ৩০০ বার তাসবীহ্ পাঠ করতে হবে।

নামাযের অপেক্ষায় থাকার ফজীলত ঃ

বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন– সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তাঁর আরশের ছাঁয়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন আরশের ছাঁয়া ছাড়া আর কোন ছাঁয়া থাকবে না। তাঁরা হলেন– ১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২) যে যুবক ইবাদতের মধ্যে বড় হয়েছে, ৩) যে ব্যক্তির মন সর্বদা মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে, ৪) যে দু'ব্যক্তি একে অপরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসে। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই একত্রিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই পৃথক হয় ৫) যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে মর্যাদাসম্পন্ন সুন্দরী নারীর কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ৬) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান-খয়রাত করে, তার বাম হাতও জানতে পারে না যে তার ডান হাত কি দান করেছে এবং ৭) যে ব্যক্তি নিরালা বসে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– তোমাদের মন যতক্ষণ কোরআনের সাথে নিবিষ্ট থাকে, ততক্ষণ পাঠ কর। যখন মনে বিরক্তি এসে যায়, তখন তেলাওয়াত বন্ধ করে উঠে যাও।

অর্থাৎ প্রশান্ত চিত্তে ও মনোযোগের সাথে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করা উচিত। যখন মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন জোরপূর্বক নিজেকে কোরআন তেলাওয়াত করতে বাধ্য করা সমীচীন নয়।

মসজিদুল হারামে অধিক ফযীলতের যে বর্ণনা এসেছে, তা শুধু নামাযের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়. বরং অন্যান্য সকল ইবাদতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং হজ্জের সময় দান-সদকা, রোজা, এতেকাফ, যিকির, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি আমলে নিজেকে নিবিষ্ট রাখুন। জীবনের এ মহামূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করুন। এর উসীলায় আল্লাহপাক পরকালে নাজাত দিতে পারেন।

দূরপাল্লার বিমান ভ্রমণে যাত্রীদের জন্য কিছু ব্যায়ামের অনুশীলন

১। প্রতি ঘণ্টা পর পর অন্ততঃ একবার সীট ছেড়ে কয়েক মিনিট হাঁটা-চলা করুন।

২। বসে থাকলেও মাঝে মাঝেই পা নাড়াচাড়া করুন, যাতে শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে।

৩। চা, কফি বা কোমল পানীয় পান করে শরীরের আদ্রতা বজায় রাখুন।

৪। ভ্রমণকালে সর্বদা ঢিলে-ঢালা পোষাক পরিধান করুন।

৫। উপরে ওঠা-নামার কারণে যদি আপনার কানে চাপ অনুভব করেন, তাহলে হাই তোলার চেষ্টা করুন, অথবা মিষ্টি জাতীয় কিছু চুষতে থাকুন।

৬। বিমানে অযু করা সম্ভব না হলে সালাত আদায়ের জন্য তায়াম্মুম করে পবিত্র হতে হবে।

স্বাস্থ্য সচেতনতা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি লাভের জন্য প্রায়ই দু'আ করতেন।

বাংলাদেশ থেকে বেশীর ভাগ লোকই বৃদ্ধ বয়সে হজ্জে যান। বাংলাদেশ থেকেই প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সাথে করে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং প্রত্যেক হাজী সাহেবকে সাবধানে চলাফেলা করা উচিত।

বৃদ্ধ বয়সে নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত–

১। শরীরের ওজন বেশী থাকলে তা কমিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা বিশেষ দরকার। কারণ মেদ-বহুল শরীর বিভিন্ন জটিল রোগব্যধিতে আক্রান্ত হতে পারে।

২। খাদ্য তালিকায় যেগুলোর পরিমাণ কম থাকবে ঃ ঘি, মাখন, চর্বি, ডালডা, চর্বিদার গোশত, চিনি-মিষ্টি জাতীয় খাবার, কাঁচা লবন, ডিমের কুসুম ও চিংড়ি মাছ ইত্যাদি।

৩। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, তাদের জন্য ইসবগুলের ভুসি দু'বেলা খাওয়ার আগে ২/৩ চামচ করে খাওয়া উত্তম।

৪। আঁশ জাতীয় খাদ্য বেশী খেতে হবে, যেমন– ডাল, শাক-সব্জী, ফলমূল (আপেল, পেয়ারা ইত্যাদি খোসাসহ)।

৫। সব রকমের মাছ বিশেষতঃ সমুদ্রের মাছ এবং উদ্ভিদ তেল, বিশেষতঃ কর্ণ অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি খেতে হবে। ক্যালরী ঠিক রেখে খেতে হবে।

৬। ফলমূল হচ্ছে সবচেয়ে ভাল খাবার এবং পানি হচ্ছে সবচেয়ে ভাল পানীয়।

৭। সফ্‌ট ড্রিংক বা কোমল পানীয় পান করার ব্যাপারে সাবধান থাকা দরকার। কারণ প্রতি ১২ আউন্স কোমল পানীয় বোতলে ১১ চা চামচ চিনি থাকে।

৮। নিয়মিত ও পরিমানমত সুষম খাদ্য খাওয়া দরকার, নিয়মিত ও পরিমাণমত ব্যায়াম (দৈনিক প্রায় আধ ঘণ্টা হাটা) বা দৈহিক পরিশ্রম করা উচিত।

৯। সব সময় নিজের শরীর, জামা-কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। এ সাথে শারিরীক ও মানসিক চাপ কমাতে হবে। যেসব মানুষ খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অস্থির ও কোন না কোন লক্ষ্যের পেছনে ছুটছেন এবং যারা বন্ধনহীন জীবন যাপন করেন, তাদের মধ্যে হার্ট এ্যাটাকের সম্ভবনা বেশী।

১০। শান্ত হোন, ধৈর্যধারণ করুন, সুস্থ থাকুন, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা পরিহার করে সুন্দর শান্তিময় নির্বিঘ্নে জীবন-যাপন করুন। বৃদ্ধ বয়সে একাকী না থেকে মসজিদ, মাদ্রাসা, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবা ইত্যাদির সাথে নিজেকে জড়িত থাকুন।

তিরমীজী শরীফে কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে কোন ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে ততটুকু বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে না, দ্বীনের মধ্যে যতখানি ফেতনার সৃষ্টি করে মানুষের সম্পদ ও আভিজাত্যের মোহ।

"হজ্জের দাওয়াত"

মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহ্‌র হজ্জের দাওয়াত ঃ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) বাইতুল্লাহ্ শরীফ পুনঃনির্মাণের কাজ সমাধা করে আল্লাহ্‌র আদেশে তাওয়াফ ও হজ্জ সম্পন্ন করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীর মানুষকে হজ্জের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দেন। আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে–

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

"মানুষের নিকট হজ্জের আযান (ঘোষণা করে) দাও।"– কোরআন (২২ঃ২৭)। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উচু স্থানে আরোহন করে দাওয়াত দিলেন– "হে লোক সকল, বাইতুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও।" যাদের হজ্জ নসীব হবে তারা বলেছেন "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক", "হাজির হে প্রভু, আমরা হাজির"। কেউ সাড়া দিয়েছে একবার, কেউ একাধিকবার। যে যতবার সাড়া দিয়েছেন তার ততবারই হজ্জ নসীব হবে।

আল-কোরআনের ২ঃ১২৫ আয়াতে বাইতুল্লাহ্ শরীফকে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ ঘর বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ঘরের মালিক যাকে প্রবেশাধিকার দিবেন, যার জন্য দরওয়াযা

খুলে দিবেন, তিনিই প্রবেশ লাভে ধন্য হবেন। এটা তাঁরই দয়া, তারই বিশেষ অনুগ্রহ। পবিত্র হজ্জ নসিব হওয়া তাঁরই মেহেরবাণী।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্‌র হজ্জের দাওয়াত ঃ

মসজিদে হারামের দরজা মোশরেকরা মুসলমানদের জন্য ছয় বছর বন্ধ রেখেছিল। এরপর মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল্লাহ্ স্বপ্নে দেখালেন, আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সত্য করে দেখিয়েছেন আপন রাসূলের সত্য স্বপ্নকে, নিশ্চয়ই তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে।”–কোরআন (৪৮ঃ২৭)

তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন। আরও দেখলেন তিনি কা’বা ঘরের চাবি নিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম সহ তাওয়াফ করেন। এরপর কয়েক জন সাহাবী মাথা মুন্ডান, কয়েক জনে চুল ছেটে ফেলেন। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামদেরকে এ স্বপ্নের কথা জানান। সাহাবারা শুনে খুশি হন। সফরের প্রস্তুতি নেওয়া হল। ষষ্ঠ হিজরী পহেলা যিলকদ মক্কা শরীফ রওনা হলেন। ইহাই আল্লাহর দাওয়াত।

কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সুফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) এর প্রতি মহান আল্লাহর হজ্জের দাওয়াত (১ম বারে হজ্জ সম্পাদন) ঃ

(উদ্ধৃত ঃ ‘লুকানো মানিক’, পৃষ্ঠা- ২৫৮-২৬৬)

কুতুবুল এরশাদ লিখেছেন– “অনেক দিন যাবত আমার মনে হজ্জ করবার জন্য প্রবল বাসনা ছিল। কিন্তু সংসার দেখাশুনার জন্য আমার পরিবারে কোন বয়স্ক সন্তানাদি না থাকায় আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র খলিলুর রহমান বড় হলে তার হাতে সংসারের ভার অর্পণ করে আমি হজ্জে যাব। ১৯৪৫ সনের নভেম্বর মাসে এক বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবার পূর্ণিমার রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতে একখানা চিঠি এসেছে, এতে নিম্নে বর্ণিত কবিতাটি লেখা ছিল ঃ

কি হবে তোর স্ত্রী পুত্র দিয়ে, বল না দেখি বল,
ও তুই হজ্জ করিতে শীঘ্র করি চল,
কাঁদ-কাঁদ ভাল করে যার চোখে আছে জল,
ও তুই হজ্জ করতে শীঘ্র করি চল।’

আমি সজাগ হয়ে দেখলাম যে, চোখের জলে বালিশ ভিজে গিয়েছে। স্বপ্নে দৃষ্ট কবিতাটি যাতে স্মরণ রাখতে পারি তার জন্য এটা পূর্ণিমার আলোতে বসে কাগজে লিপিবদ্ধ করে রাখলাম।”

এরপর তিনি ঘোষণা দিলেন যে, স্বপ্নে আমার হজ্জে যাওয়ার নির্দেশ হয়েছে, যারা আমার সঙ্গে হজ্জে যেতে ইচ্ছুক তারা দরখাস্ত করেন। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নত মোতাবেক যদি হজ্জ হয়, তাহলে এবার আমরা হজ্জে যেতে পারব না। কারণ স্বপ্নে নির্দেশে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমবার হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসেন এবং পরবর্তী বৎসর হজ্জ সম্পাদন করেন।

মুর্শিদ কেবলারও উক্ত সুন্নাত আদায় হয়েছিল। তিনি ১৯৪৫ সনে হজ্জের অনুমতি পেলেন না। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৬ সনে ২৮ জনের নাম লিপিবদ্ধ করে দরখাস্ত করেন এবং অনুমতি লাভ করে পবিত্র হজ্জ সম্পাদন করেন। এটাই মালিকের পক্ষ থেকে দাওয়াত।

স্মরণীয় বিষয় ঃ আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি মক্কা শরীফ ৪০ দিন অবস্থান পূর্বক ৭ জুম্মা এবং মদীনা শরীফে ২৪ দিন অবস্থান পূর্বক ৩ জুম্মা এবং নিজে একাই কোরআন তেলাওয়াত করে ১ দিনে মক্কা শরীফে এক খতম কোরআন শরীফ পড়েন। সঙ্গী মুরীদগণ শ্রবণ করে খতমের বরকত লাভে ধন্য হয়।

কুতুবুল এরশাদের দ্বিতীয়বারের হজ্জ সম্পাদন ঃ

আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ্ দ্বিতীয় বার হজ্জ সম্পাদন করবার জন্য ১৯৭৬ইং সনে ভোলা হতে ঢাকা রওয়ানা হবার দিন হুজুরের ইমামতিতে ফজরের জামাতে অনেক মুরীদ নামায আদায় করেন। উক্ত জামাতে উপস্থিত ছিলেন মৌলভী আঃ সোবহান মোল্লা সাহেব (খলিফা)। মোল্লা সাহেব নামাজের মধ্যে কাশফযোগে দেখতে পেয়েছিলেন যে, হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর আহলে বাইয়েতগণ, হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসমাইল (আঃ) ও হযরত বিবি হাজেরা (রাঃ) হুজুরকে পবিত্রভূমিতে ইস্তিকবাল করে নেয়ার জন্য রুহানীভাবে উপস্থিত হয়েছেন এবং অনেক ফেরেশতাগণকেও তিনি তথায় হাজির দেখলেন। এমন সময় মোল্লা সাহেবের নিকট আল্লাহপাকের তরফ হতে ইলহাম হল “সত্তর হাজার ফেরেশতা এই হজ্জ সফরে তোমার পীর সাহেব ও তাঁহার সঙ্গীগণকে হেফাজত করার জন্য দেয়া হল। এই বাসা হতে রওয়ানা হয়ে হজ্জ অনুষ্ঠানের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতঃ পুনরায় এই বাসায় ফিরে আসা পর্যন্ত তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করার ভার এদের উপর অর্পিত হল। ইহারা আরামের সাথে সুস্থ শরীরে হজ্জ সম্পাদন করতঃ পুনরায় নিরাপদে বাড়ী ফিরে আসতে পারবে, সুতরাং তোমাদের ভয় ও চিন্তা করার কোন কারণ নেই।” এই কাশফটি সম্পূর্ণরূপে সত্যে পরিণত হয়েছিল। মোবারক দাওয়াত। মোবারক দাওয়াত।

কুতুবুল এরশাদের ওমরাহ সম্পাদন ঃ

হযরত মুর্শিদ কেবলা ১৯৯৬ ইং সনে তাঁর মুরীদগণসহ ওমরাহ সম্পাদন করেন। এই সফরে তাদের প্রতি আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামতের বিষয় হুজুরের সফর সঙ্গী ও সাহেবজাদা গদ্দীনশীন পীর সাহেব কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান সাহেবের বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

"২৬/১২/১৯৯৬ ইং তারিখে আমি (মৌলভী অদুদুর রহমান সাহেব) ঢাকার ১৭তম বার্ষিক মাহফিলের প্রয়োজনীয় বাজার করে অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় বাসায় বিছানায় শোয়ার পর রাত্র প্রায় ২:০০ টার সময় দেখতে পেলাম যে, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সশরীরে এসে আমাকে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে বললেন, "কখন (মক্কা ও মদীনা) আসবেন?" আমি উত্তর করলাম, "জানুয়ারী মাসের ৫ বা ৭ তারিখ।" এতে তিনি বললেন, "ঠিক আছে, কোন চিন্তার কারণ নেই।" এটা বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমরা ইং ০৭/০১/১৯৯৬ তারিখ মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ হতে সৌদি এয়ারলাইন্স-যোগে রওয়ানা হই এবং ০৭/০১/১৯৯৬ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে মক্কা শরীফে উপস্থিত হই এবং বাসা ভাড়া করে প্রায় রাত্রি ৯:০০ টায় বাসায় উপস্থিত হই। পীর সাহেব কেবলাসহ আমি, আমার মা, স্ত্রী ও কন্যা এক কক্ষে অবস্থান নেই। রাত্রি ২:৩০ মিনিটে আমি হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে স্বপ্নে আমাদের কক্ষে উপস্থিত দেখতে পেলাম এবং হুর ও ছোট ছোট বাচ্চা আকারে অনেক "গেলমান" সমস্ত কক্ষটি পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। প্রাণের নবীজী শুধু দাওয়াতই দিলেন না বরং মেহমানের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। কতইনা সৌভাগ্যবান এই কাফেলা। আলহামদুলিল্লাহ।

গদ্দীনশীন পীর সাহেব কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃআঃ) এর প্রতি দাওয়াত ঃ

উপরে উল্লেখিত ২৬/১২/১৯৯৬ ইং তারিখে গদ্দীনশীন পীর সাহেব কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান সাহেবের যে ঘটনাটি লেখা হয়েছে তাতে উল্লেখ হয়েছে তিনি বলেন– রাত ২:০০ টার সময় প্রাণের নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বশরীরে এসে আমাকে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে বললেন– "কখন মক্কা ও মদীনা আসবেন?" আমি উত্তর করলাম জানুয়ারির ৫ বা ৭ তারিখ। এতে তিনি বললেন– "ঠিক আছে, কোন চিন্তার কারণ নেই।" প্রকাশ্যভাবেই দাওয়াত দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আলহাজ্জ মাওলানা মনসুরুর রহমান সাহেবের মাধ্যমে গদ্দীনশীন পীর সাহেবকে হজ্জের দাওয়াত ঃ

কুতুবুল এরশাদের বিশিষ্ট মুরীদ নাটোরের বাকশোর আলীয়া মাদ্রসার সুপার আলহাজ্জ মাওলানা মনসুরুর রহমান সাহেব ২০১০ইং সালে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি হজ্জের পর মদীনা শরীফ যান। মদীনা শরীফ অবস্থানকালে ২৫/১১/২০১০ইং (১৮ই যিলহজ্জ) তারিখে রিয়াজুল জান্নাহ্য় তাজাজ্জুদ নামায আদায় করেন। এরপর রওজা পাকের পাশেই বসে অজিফা আদায় করছিলেন। একটু হালকা ঘুম আসছিল। এমন সময় আওয়াজ হচ্ছে– “নবীজী আসছেন”, “নবীজী আসছেন”। চতুর্দিকে শোরগোল পড়ে গেল। তিনিও উঠে অগ্রসর হলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুব্বা পরা ছিলেন। প্রাণের নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে তিনি কোলাকুলি করলে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাড়ী মোবারক পর্যন্ত উনার গায়ে লাগলো। এরপর বললেন, আমার পীর সাহেব কেবলা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর করলেন– “তাকে আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত দিবেন, আগামী বৎসর যেন তিনি হজ্জে আসেন।” এই দাওয়াত পেয়ে আমার পীর সাহেব ২০১০ইং সালের ঢাকা বাৎসরিক মাহফিলে ঘোষণা দিলেন যে, ইন্শাআল্লাহ্ ২০১১ইং সালে তিনি হজ্জে যাবেন। এই ঘটনা থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হলো যে, **প্রাণের নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশেক উম্মতকে দাওয়াত দেন** এবং হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে হায়াতুন্নবী, এতে কোন সন্দেহ নেই।

কুতুবুল এরশাদের বিশিষ্ট খলিফা জগন্নাথ কলেজের হিসাব বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আলহাজ্জ মৌলভী আঃ হাই সাহেব (অবঃ)-কে দাওয়াত ঃ

তিনি বলেন যে, এক হজ্জে যাওয়ার পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, মক্কা শরীফ গিয়েছি, কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে আছি। কা'বা শরীফের উপর “আল্লাহ্” ও “মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)” নাম দুটি সুন্দর আরবী অক্ষরে ঝলমল করছে। এরপর কা'বা শরীফ তাওয়াফ করলাম। এরপর মদীনা শরীফ রওযায়ে পাকে উপস্থিত হলাম ও আমার মুর্শিদ কেবলাকে জিকির হালকা করতে দেখলাম। গদ্দীনশীন হুজুর কেবলা কুতুবুল এরশাদ সূফী অদুদুর রহমান সাহেব তদারকী করছেন। মুর্শিদ কেবলার কাছে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বললে তিনি ব্যাখ্যা দিলেন এবার আপনার হজ্জ নসিব হবে। আলহামদুলিল্লাহ স্বপ্নের এক মাস পর হজ্জে যাই। স্বপ্নে হজ্জের দাওয়াত পেলাম।

আলহামদুলিল্লাহ্ প্রফেসর ভাই সাহেব ২৯ (উনত্রিশ) বার হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন করেছেন।

অধম লেখকের প্রতি দাওয়াত ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালার অশেষ করুণা, ১৯৭৬ সনে আমার মুর্শিদ কেবলার সাথে হজ্জ নসিব হয়। হজ্জে রওনা হওয়ার পূর্বে ৮ই নভেম্বর ১৯৭৬ দিবাগত শেষ রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি বাইতুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করছি, হজ্জের অন্যান্য কাজও সমাধা করি। মনে করলাম যে, আমার হজ্জে যাওয়া হবে না, তাই আল্লাহ্ বাতেনী হজ্জ করিয়ে অধমকে সান্তনা দিলেন। পরে আমার মুর্শিদ কেবলার সাথে হজ্জে যাই, তিনি বলেন, এটাই আমার হজ্জের দাওয়াত। আলহামদুলিল্লাহ।

১৭ই ডিসেম্বর ২০০৫ইং তারিখ হজ্জে রওনা হই। এবারের প্রোগ্রাম হলো- প্রথমে মদীনা তইয়্যাবা যাব। বিমানে সিটে বসে মদীনা শরীফের বিস্তারিত আলোচনা পড়ছিলাম। হঠাৎ তন্দ্রাবিষ্ট হলাম, দেখলাম আমি আমার মুর্শিদ কেবলার প্রশস্ত করা দু'খানা হাতের উপর দুধের শিশুর মত ছোট আকারে। এরপর দেখলাম দুধের বাচ্চাকে আমার মুর্শিদ কেবলা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মোবারক হাতে তুলে দিলেন। তন্দ্রা কেটে গেল। মনে যে কত প্রশান্তি। ভাবলাম পীর সাহেব কেবলা আমাকে নবীজীর হাতে তুলে দিলেন।

অন্য একবার হজ্জে যাওয়ার সময় বিমানে বসে আছি, তন্দ্রার মধ্যে দেখলাম যে, আমাদের এগিয়ে নিতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত হাজেরা (আঃ) আসছেন। আলহামদুলিল্লাহ, ইহা মালিকের পক্ষ থেকে দাওয়াত।

হজ্জ সম্পর্কীয় ত্রুটি বিচ্যুতি ও মাস্আলা

সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা ঃ

পুরুষের জন্য ইহরামের অবস্থায় যে সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ তা দ্বারা এমন সব কাপড় বুঝানো হয়, যা পূর্ণ দেহের অথবা কোন অঙ্গের মাপ অনুসারে তৈরী করা হয় এবং এটা পুরা দেহ অথবা অঙ্গকে আবৃত করে ফেলে। চাই এই অবস্থায় সেলাই-এর মাধ্যমেই হউক কিংবা অন্য কোন উপায়ে হউক এবং এই কাপড় রীতি-অভ্যাস মোতাবেক ব্যবহার করা হয়।

মাসআলা ঃ

১। যদি কোন পুরুষ ইহরামের অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করেন এবং যেভাবে সাধারণতঃ পরিধান করা হয় তেমনিভাবেই পূর্ণ একদিন অথবা একরাত পরিধান করেন, তবে দম ওয়াজিব হবে, আর যদি এটা হতে কম অর্থাৎ ১ ঘণ্টা পরিমিত সময় পরিধান করেন, তবে পৌণে দুই সের গম সদকা করবেন, আর যদি এক ঘণ্টা হতেও কম সময় পরিধান করেন, তা হলে এক মুষ্টি গম সদকা করবেন। আর একদিনের বেশি যতদিনই পরিধান করেন, একটি দমই ওয়াজিব হবে। যদি কেউ রাত্রে

তা এই নিয়তে খুলে রাখেন যে, সকালে পরে নিবেন এবং প্রত্যহ এইভাবে রাত্রে খুলে রেখে পরবর্তী ভোর থেকে পুনরায় পরিধান করেন, তবুও একটি মাত্র দমই ওয়াজিব হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই নিয়তে না খুলবেন যে, এখন হতে আর পরব না। যদি কেউ এই নিয়তে খুলে থাকেন যে, আর পরিধান করবেন না এবং তারপরও পরিধান করেন, তা হলে দ্বিতীয় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, চাই প্রথম কাফ্ফারা আদায় করে থাকুন বা নাই থাকুন।

২। যদি কেহ জ্বরের কারণে সেলাই করা কাপড় পরেন, কিন্তু জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরও সে কাপড় না খোলেন এবং তারপর আবার জ্বর দেখা দেয় অথবা অন্য কোন অসুখ দেখা দেয়, তা হলে দুটি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। সারকথা এই যে, প্রত্যেক অসুখকে স্বতন্ত্র কারণ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং প্রত্যেকটিরই জন্য সেলাইকৃত কাপড় ব্যবহার করার স্বতন্ত্র কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

জুতার মাসআলা ঃ

১। যদি জুতা না থাকে তা হলে মোজা কেটে জুতার মত বানিয়ে পরিধান করা জায়েয। কিন্তু এই পরিমাণ কেটে ফেলা জরুরী যাতে পায়ের মধ্যবর্তী হাড়টি বের হয়ে পড়ে।

২। এমন জুতা পরিধান করা নিষিদ্ধ, যাতে পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢাকা পড়ে যায়।

৩। দেশীয় জুতা অথবা শ্লীপার যদি এত বড় হয় যে, পায়ের মাঝখানকার হাঁড় ঢাকা পড়ে যায় তবে এটা পরিধান করা নিষিদ্ধ। একে এই পরিমাণ কেটে ফেলতে হবে যাতে হাঁড় বের হয়ে পড়ে অথবা জুতার ভিতরে কাপড় অথবা তুলা ইত্যাদি ভরে দিতে হবে, যেন মধ্যখানের হাঁড় বের হয়ে যায়।

৪। যদি এমন জুতা বা মোজা– যা পায়ের মাঝখানের উত্থিত হাঁড় আবৃত করে ফেলে, তা না কেটে একদিন অথবা একরাত পর্যন্ত পরিধান করেন, তা হলে দম ওয়াজিব হবে এবং এর চেয়ে কম সময়ের জন্য সদকা প্রদান করতে হবে। যদি মোজা কেটে পরার পর চপ্পল অথবা এমন কোন জুতা পেয়ে যান, তা পায়ের মাঝখানের হাঁড়কে আবৃত করে না, তা হলে সেই কাটা মোজা খুলে ফেলা জরুরী নয়। যদি এটাই পরে থাকেন তবে কোন ক্ষতিপূরন ওয়াজিব হবে না। কিন্তু চপ্পল থাকা অবস্থায় এটা পরিধান করা মাকরূহ।

মাথা এবং মুখমন্ডল আবৃত করার ত্রুটি ঃ

মাসআলা ঃ

১। পুরুষের জন্য ইহরাম অবস্থায় মাথা এবং মুখমন্ডল আবৃত করা নিষিদ্ধ। মহিলাদের জন্য শুধু মুখমন্ডল আবৃত করা নিষিদ্ধ। যদি কোন পুরুষ ইহরাম অবস্থায়

সমগ্র মাথা অথবা মুখমন্ডল অথবা মাথা কিংবা মুখমন্ডলের এক চতুর্থাংশ এমন কোন বস্তু দ্বারা আবৃত করেন, সাধারণতঃ যেসব বস্তু দ্বারা আবৃত করা হয়ে থাকে যেমন– পাগড়ী, টুপি অথবা অন্য কোন কাপড়, সেলাইযুক্ত হউক অথবা সেলাইবিহীন, নিদ্রিতাবস্থায় হউক অথবা জাগ্রতাবস্থায়, ইচ্ছাকৃত হউক অথবা ভুলক্রমে, স্বেচ্ছায় হউক অথবা বলপূর্বক, নিজে আবৃত করুক অথবা অন্য কেউ আবৃত করে দিক, ওযরবশতঃ হউক অথবা বিনা ওযরে– সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

২। যদি কেউ পূর্ণ এক দিন, রাত অথবা তদপেক্ষা বেশী সময় মাথা অথবা মুখমন্ডল অথবা এর চতুর্থাংশ কোন কাপড় দ্বারা আবৃত করেন অথবা কোন মহিলা শুধু মুখমন্ডলকে আবৃত করেন, তবে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি চতুর্থাংশ হতে কম আবৃত করেন অথবা একদিন অথবা একরাত হতে কম সময় আবৃত করেন, তা হলে শুধু সদকা ওয়াজিব হবে।

৩। যদি কেউ এমন কোন কিছুর দ্বারা মাথা আবৃত করেন যাহা দ্বারা স্বভাবতঃ এবং সাধারণতঃ আবৃত করা হয় না (যেমন– বড় থালা, পেয়ালা, টুকরী, পাথর, লোহা, তামা প্রভৃতি) তা হলে কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না।

৪। যদি কেউ মাথায় কাদার প্রলেপ দেন, তবে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

৫। যদি কেউ নিদ্রিতাবস্থায় কোন মুহরিমের মাথা আবৃত করে দেন, তা হলে এটা যদি বিনা ওযরে করে থাকেন, তবে অবশ্যই দম ওয়াজিব হবে।

সুগন্ধি এবং তেল ব্যবহার করার ক্রটি ঃ

প্রত্যেক এমন বস্তুকে সুগন্ধি বলা হয়, যার মধ্যে উত্তম ঘ্রাণ পাওয়া যায় এবং একে সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং তার দ্বারা সুগন্ধি তৈরী করা হয়; আর জ্ঞানী-গুণীরা একে সুগন্ধি বা খুশবু হিসাবে গণ্য করেন, যেমন– কর্পূর, আম্বর, চন্দন, গোলাপ, ওয়ারাস, যাফরান, কুসুম মেহেদী, গুল বনফ্শা, চামেলী, বেলী, নার্গিস, তিলের তৈল, যয়তুনের তৈল, খতমী, আগর, এসেন্স এবং আরো অন্যান্য আতর ও সুগন্ধি বস্তু।

খুশবু লাগানোর অর্থ শরীর অথবা কাপড়ে এমনভাবে সুগন্ধি লেগে যাওয়া, যাতে শরীর অথবা কাপড় হতে সুগন্ধি আসতে থাকে। যদিও খুশবুর কোন অংশ লেগে না থাকে।

মাসআলা ঃ

১। ফুল এবং সুগন্ধিযুক্ত ফল ঘ্রাণ নেওয়ার কারণে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু এটা মাকরূহ।

২। ইচ্ছাকৃতভাবে খুশবু লাগানো হউক অথবা ভুলক্রমে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছা-জবরদস্তিক্রমে অথবা স্বেচ্ছায়– প্রত্যেক অবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

৩। শরীর, লুঙ্গি, চাঁদর, বিছানা এবং কাপড়-চোপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ। এমনিভাবে সুগন্ধিযুক্ত খেযাব, ঔষধ অথবা তৈল লাগানো অথবা কোন সুগন্ধিযুক্ত বস্তু দ্বারা শরীর অথবা চুল ধৌত করা অথবা খাওয়া ও পান করা সবই নিষিদ্ধ।

৪। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা নাজায়েয।

৫। যদি কোন সুস্থমস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক মুহরিম কোন সমগ্র বড় অঙ্গ যেমন– মাথা, গোড়ালী, মুখমন্ডল, দাড়ি, উরু, হাত, হাতের তালু প্রভৃতির উপরে সুগন্ধি লাগান অথবা এক অঙ্গের চেয়ে বেশী অংশে লাগান, তবে দম ওয়াজিব হবে। যদিও লাগানোর সাথে সাথে দূরীভূত করে ফেলেন অথবা ধৌত করে ফেলেন। আর যদি পূর্ণ অঙ্গের উপরে না লাগিয়ে অল্প অথবা অধিকাংশের উপরে লাগান অথবা কোন ছোট্ট অঙ্গ যেমন– নাক, কান, চক্ষু, অঙ্গুলি, কজ্জা প্রভৃতির উপরে লাগান, তা হলে সদকা ওয়াজিব হবে।

৬। অঙ্গ ছোট-বড় হওয়ার বিবেচনা তখন করতে হবে, যখন সুগন্ধি অল্প হবে। যদি বেশী হয়, তা হলে যদি কেউ বড় অঙ্গের অল্প অংশে অথবা ছোট অঙ্গেও লাগান, তবুও দম ওয়াজিব হবে। 'অল্প' এবং 'বেশি' এটা সাধারণের প্রচলন অনুযায়ী সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ যা সাধারণের প্রচলনে 'বেশি' তা বেশি বলে বিবেচিত হবে এবং যা সাধারণের প্রচলনে 'অল্প' তা অল্প বলে সাব্যস্ত হবে।

৭। যদি কেউ ইহরামের নিয়ত করার পূর্বের খুশবু লাগান এবং তারপর তা অন্য অঙ্গে লেগে যায়, তা হলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না এবং এটা শুঁকালেও মাকরূহ হবে না।

৮। যদি কেউ ইহরাম বাঁধার পূর্বে আতর লাগান এবং ইহরামের পর এর সুগন্ধ অবশিষ্ট থাকে, তা হলে কোন অসুবিধা নেই, এটা যত দীর্ঘকালই স্থায়ী থাকুক না কেন।

৯। যদি কেউ এক জায়গায় বসে সারা দেহে সুগন্ধি লাগান, তবে শুধু একটি দমই ওয়াজিব হবে। আর যদি বিভিন্ন স্থানে লাগান, তবে প্রত্যেক স্থানের জন্য স্বতন্ত্র দম ওয়াজিব হবে।

১০। যদি কেউ দেহের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সুগন্ধি লাগান এবং সব জায়গাকে একত্রিত করলে একটি বড় অঙ্গের সমান হয়, তা হলে দম ওয়াজিব হবে। নতুবা ওয়াজিব হবে না।

১১। যদি কোন মহিলা হাতের তালুতে মেহেদী লাগান, তা হলে দম ওয়াজিব হবে।

১২। আতরের দোকানে বসাতে কোন দোষ নাই। অবশ্য শুঁকার নিয়তে বসা মাকরূহ।

১৩। যদি এক মুহরিম অন্য মুহরিমকে সুগন্ধি লাগিয়ে দেন, তা হলে যিনি সুগন্ধি লাগিয়ে দিবেন তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। যিনি অন্যকে দিয়ে নিজ দেহে সুগন্ধি লাগাবেন, তার উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

১৪। যদি কেউ কাপড়ে সুগন্ধি লাগান অথবা সুগন্ধি লাগানো কাপড় পরিধান করেন, আর তা অর্ধ বর্গহাত পরিমিত স্থান অথবা ততোধিক স্থানে লাগানো হয়ে থাকে এবং তা পূর্ণ একদিন অথবা পূর্ণ একরাত পরিধান করে থাকেন, তা হলে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি অর্ধহাত অপেক্ষা কম জায়গায় লাগানো হয় অথবা পূর্ণ একদিন অথবা একরাত পরিধান করা না হয়, তবে শুধু সাদকা ওয়াজিব হবে।

হরমের বৃক্ষ ও উদ্ভিদ কর্তনের ত্রুটি ঃ

মাসআলা ঃ

১। হরমের বৃক্ষ এবং উদ্ভিদ অপরাধ অনুপাতে চার প্রকার। যথা–

প্রথম ঃ সেই সকল উদ্ভিদ যা মানুষ সাধারণতঃ বপণ করে থাকে এবং কোন ব্যক্তি এটা হরমের অভ্যন্তরে বপণ অথবা রোপণ করেছে। যথা- গম, যব ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ঃ যা কোন ব্যক্তি বপণ করেছে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ সেগুলি বপণ করে না। যেমন– পীলু ইত্যাদি।

তৃতীয় ঃ যা নিজে নিজে জন্মিয়েছে, কিন্তু সাধারণতঃ সেগুলি মানুষ বপণ করে থাকে।

চতুর্থ ঃ যা নিজে নিজে জন্মিয়েছে, কিন্তু মানুষ সাধারণভাবে এটা বপণ করে না। যেমন– বাবলা গাছ প্রভৃতি।

উপরোক্ত প্রথম তিন প্রকারের বৃক্ষ কর্তন করলে হরমের কারণে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। সেগুলি কাটা, উপড়িয়ে ফেলা এবং কাজে লাগানো জায়েয। কিন্তু যদি কারও অধিকারভুক্ত হয়, তবে মালিককে এর মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। চতুর্থ প্রকারের বৃক্ষ কাটা, উপড়ানো মুহরিম এবং হালাল উভয়ের জন্যই হারাম। চাই সেগুলি কারও অধিকারভুক্ত ভূমিতে হউক অথবা মালিকবিহীন ভূমিতে হউক। অবশ্য শুকনা বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয। ইযখির নামক ঘাস কর্তন করাও জায়েয। ইযখির এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ– যা ছাদ এবং কবরের কাজে ব্যবহৃত হয়।

২। হরমের ঘাস বা উদ্ভিদ কর্তন করলে এর মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

৩। ব্যাঙের ছাতা এবং শুকনা ঘাস অথবা শুকনা বৃক্ষ– যার পুনরায় সজীব হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই অথবা ভাঙ্গা বৃক্ষ অথবা উদ্ভিদ এবং ইযখির প্রভৃতি চাই সেগুলি তাজাই হউক অথবা শুকনা, এটা কর্তন করা জায়েয।

৪। যদি কোন বৃক্ষের পাতা ছিঁড়লে গাছের ক্ষতি না হয়, তা হলে পাতা ছেঁড়া জায়েয, নতুবা জায়েয নয়।

৫। যে ধরনের বৃক্ষে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় সেগুলি যদি কারও অধিকৃত হয় অর্থাৎ তার জমিতে জন্মে থাকে, তা হলে দুটি মূল্য প্রদান করতে হবে। একটি হরমের কারণে এবং দ্বিতীয়টি মালিককে প্রদান করতে হবে।

৬। ফলবান বৃক্ষ– এটা নিজে নিজে জন্মে থাকলেও কর্তন জায়েয, কিন্তু অধিকৃত ভূমিতে হলে মালিকের অনুমতি শর্ত।

৭। তাঁবু টানানোর কারণে অথবা চুলা প্রভৃতি খনন করার কারণে অথবা সওয়ারী অথবা নিজে চলাফেলা করার কারণে যদি কোন উদ্ভিদ অথবা কাঠ ভেঙ্গে যায়, তা হলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

৮। বৃক্ষের মূলের বিবেচনা করা হবে। যদি মূল হরমে থাকে এবং শাখা-প্রশাখা হিল্ল এলাকায় থাকে তা হলে এটা হরমের বৃক্ষ। আর যদি মূল 'হিল্ল' এলাকায় থাকে এবং শাখা-প্রশাখা হরমে থাকে, তা হলে এটা 'হিল্ল'-এর বৃক্ষ বলে গণ্য হবে। আর যদি অর্ধেক মূল হিল্ল এলাকায় এবং অর্ধেক হরমে থাকে, তা হলেও এর হরমের বৃক্ষ বলেই গণ্য হবে।

৯। বৃক্ষ অথবা উদ্ভিদের মূল্য দ্বারা খাদ্যশস্য ক্রয় করে সদকা করে দিতে হবে এবং মিসকীনকে মাথাপিছু এক সের সাড়ে বার ছটাক গম যেখানে ইচ্ছা প্রদান করতে পারবেন। যদি সেই মূল্যে কোরবানীর পশু ক্রয় করা যায়, তবে এটা যবেহ করবেন। ক্ষতিপূরণ আদায় করার পর উদ্ভিদ এবং কাঠ কর্তনকারীর অধিকারভূক্ত হয়ে যাবে এবং এর ব্যবহার করা জায়েয হবে। কিন্তু বিক্রয় করা মাকরূহে তাহরীমী। অবশ্য ক্রেতার জন্য মাকরূহ নয়। যদি বিক্রয় করে ফেলেন, তা হলে এর মূল্য সদকা করা ওয়াজিব হবে।

১০। হরমের তাজা বৃক্ষের দ্বারা মিসওয়াক তৈরী করাও নাজায়েজ।

১১। মুহরিম এবং হালাল ব্যক্তির জন্য হরমের উদ্ভিদ এবং বৃক্ষ উপড়ানো সমভাবে হারাম। এইজন্য উভয়ের উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর যদি দুই জন মুহরিম মিলে একটি বৃক্ষ কর্তন করেন, তা হলে উভয়ের উপরে একটি মূল্য ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে ক্বেরান পালনকারীর উপরেও একটি ক্ষতিপূরণই ওয়াজিব হবে। হরমের বৃক্ষ দেখিয়ে দেয়ার কারণে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

১২। বৃক্ষের ক্ষতিপূরণে রোযা রাখা জায়েয নয়।

১৩। উদ্ভিদ কর্তন করার পর যদি পুনরায় গজিয়ে পূর্ববৎ হয়ে যায়, তা হলে ক্ষতিপূরণ মাফ হয়ে যাবে। আর যদি পূর্বের চেয়ে অল্প কম থাকে, তা হলে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি এর মূল একেবারে শুকিয়ে যায়, তা হলে এর মূল্য দেয়া ওয়াজিব হবে।

১৪। কাঁটা প্রভৃতি কর্তন করাও হারাম।

হজ্জের ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফ্ফারা

হজ্জের ওয়াজিব তরক হলে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যম হলো– (ক) দম (খ) রোজা (গ) সদ্কা। বিনা ওজরে ইচ্ছাপূর্বক যদি একটি ওয়াজিব হুকুম তরক করে তবে একটি দম দিতে হবে। যদি ওজর বশতঃ একটি ওয়াজিব তরক হয় তবুও একটি দম দিতে হবে।

(ক) দমের মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় হওয়ার শর্তসমূহ ঃ

দমের মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় হওয়ার জন্য নিম্ন লিখিত শর্ত রয়েছে, যথা–

১। পশুতে নিজের মালিকানা হওয়া। যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তির বকরী যবেহ করেন এবং তারপর এর মালিক অনুমতি প্রদান করেন অথবা এর ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেন এবং যবেহ করার পর মালিক হন, তা হলে দম আদায় হবে না।

২। পশু কোরবানীর প্রকারসমূহের মধ্য হতে অর্থাৎ গরু, মহিষ, উট, বকরী, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি হওয়া। যদি অন্য কোন প্রকার পশু হয়, তা হলে জায়েয হবে না।

৩। সেই সমস্ত ত্রুটি হতে মুক্ত থাকতে হবে যা কোরবানীর জন্য প্রতিবন্ধক।

৪। উট পূর্ণ পাঁচ বৎসরের, গরু, মহিষ দুই বৎসরের এবং বকরী এক বৎসরের হওয়া শর্ত। যদি মেষ অথবা দুম্বার বাচ্চা এমন মোটা-তাজা হয় যে, ৬ মাসের বাচ্চাকে এক বৎসরের বলে মনে হয়, তা হলে ৬ মাসের বাচ্চা হলেও জায়েয হবে।

৫। যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা।

৬। যবেহ করা। যদি জীবিত সাদকা করে দেয়া হয়, তা হলে আদায় হবে না। অবশ্য যদি কোন ফকীরকে দান করা হয় এবং যবেহর জন্য উকীল বানিয়ে দেয়া হয়, তা হলে জায়েয হবে।

৭। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর যবেহ করা।

৮। হরমের ভিতরে যবেহ করা।

৯। যবেহকারী মুসলমান অথবা আহ্লে কিতাব হওয়া।

১০। যদি ফকীর উপস্থিত থাকে, তা হলে সদকার গোশত তাকে দিয়ে দেয়া, নিজে না খাওয়া। যদি ফকীর উপস্থিত না থাকে, তা হলে যবেহ করে ফেলে রাখাই যথেষ্ট।

১১। যবেহ করার পর নিজে গোশত নষ্ট না করা। যদি কেউ নিজে নষ্ট করে ফেলেন অথবা বিক্রয় করে ফেলেন, তা হলে মূল্যের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে এবং ফকীর-মিসকীনকে এটা সদকা করা ওয়াজিব হবে। আর যদি যবেহ করার পর এটা আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর যদি যবেহর পূর্বে আপনা আপনি পশুটি বিনষ্ট হয়ে যায়, তা হলে এর পরিবর্তে দ্বিতীয় দম ওয়াজিব হবে।

১২। ফকীর -মিসকীনদের উপস্থিতি সত্ত্বেও এমন লোকদেরকে গোশ্ত প্রদান করা যারা সদকার উপযুক্ত। যদি কেউ নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় অথবা শাখা অথবা গোলাম অথবা স্বামী অথবা স্ত্রী অথবা হাশেমীকে দান করেন, তা হলে এর মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। কাফের জিম্মী হলেও তাকে এই গোশ্ত প্রদান করা জায়েয নহে।

১৩। দম-এর নিয়ত করা।

১৪। এমন কোন লোক শরীক না হওয়া, যাহার নিয়ত আল্লাহ্পাকের নৈকট্য এবং সওয়াব নয়।

১৫। দমে তামাত্তো' এবং দমে ক্বেরানের জন্য কোরবানীর দিবস হওয়াও শর্ত। অন্যান্য দম-এর জন্য এটা শর্ত নয়।

মাসআলা ঃ

১। দম-এর পরিবর্তে মূল্য সদকা করা জায়েয নয়। অবশ্য যদি কেউ এমন কোন দম হতে গোশ্‌ত ভক্ষণ করে ফেলেন যা হতে ভক্ষণ করা জায়েয নয়, অথবা তাকে নষ্ট করে ফেলেন, তা হলে ভক্ষণকৃত পশুর মূল্য সদকা করা ওয়াজিব।

প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ঃ হজ্জের মাসআলায় যেখানেই সাধারণভাবে 'দম' শব্দের ব্যবহার হবে সেখানে এর অর্থ হবে একটি বকরী।

(খ) রোযার মাধ্যমে কাফ্‌ফারা আদায় হওয়ার শর্তসমূহ ঃ

রোযার মাধ্যমে কাফ্‌ফারা আদায় হওয়ার জন্যনিম্নলিখিত শর্ত রয়েছে, যথা-

১। যদি ওজর বশতঃ একটি ওয়াজিব তরক হয় তবে একটি দমের পরিবর্তে ০৬ (ছয়) জন গরীব প্রত্যেককে অর্দ্ধ 'ছা' (এক সের সাড়ে বার ছটাক) করে মোট তিন 'ছা' গম বা এর দ্বিগুন যব বা খোরমা দান করবে অথবা তিনটি রোযা রাখবে।

(গ) সদ্‌কার মাধ্যমে কাফ্‌ফারা আদায় হওয়ার শর্তসমূহ ঃ

সদ্‌কার মাধ্যমে কাফ্‌ফারা আদায় হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত শর্ত রয়েছে, যথা–

১। পরিমাণ– অর্থাৎ এক সের সাড়ে বার ছটাক গম অথবা গমের আটা অথবা গমের ছাতু অথবা তিন সের নয় ছটাক যব অথবা যবের আটা অথবা যবের ছাতু অথবা খেজুর অথবা কিশমিশ। যদি নির্ধারিত পরিমাণ হতে কম হয়, তা হলে জায়েয হবে না।

২। জাতি– অর্থাৎ গম, যব, খেজুর, কিশমিশ এই চার প্রকারের মধ্য হতে হওয়া শর্ত। ওদের মধ্যে বর্ণিত ওজন বিবেচ্য। বাকী অন্যান্য যত রকম শস্য দানা রয়েছে, সেগুলির ওজনের হিসাবে সদকা প্রদান করা জায়েয নয়; বরং এতে মূল্যের বিবেচনা করা হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ- চাউল এই পরিমাণ দান করা ওয়াজিব হবে– যা এক সের সাড়ে বার ছটাক গম অথবা তিন সের নয় ছটাক যবের মূল্যের সমান হবে। এমনিভাবে জোয়ার, বাজরা, চানা প্রভৃতিরও হুকুম একই। রুটি (যদি গমের হয়) এবং পনিরের মধ্যে মূল্যের বিবেচনা করা হবে এবং টাকা-পয়সা প্রভৃতিও মূল্য নির্ধারণ করে প্রদান করা জায়েয; বরং উত্তম।

৩। একজন ফকীরকে এক সের সাড়ে বার ছটাক গমের চেয়ে কম দেয়া ঠিক নয়। এমনিভাবে যদি মূল্য দান করা হয়, তা হলে একেও এক সের সাড়ে বার ছটাক গমের মূল্যের চেয়ে কম কোন ফকীরকে দান করা ঠিক হবে না।

৪। এমন ব্যক্তিকে দান করতে হবে যিনি সদকা গ্রহণের উপযুক্ত। নেসাব পরিমাণ মালের অধিকারী ব্যক্তি এবং নিজের গোলাম অথবা হাশেমী বংশীয় কোন লোক অথবা কোন দারুল হরবের কাফের অথবা জিম্মীকে দান করলে আদায় হবে না। মুসাফির এবং এমন সব লোক যারা জেহাদ ও হজ্জে গমন করতে সক্ষম নয়– তাদেরকে দান করা জায়েয। যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে দানের পাত্র মনে করে দান করার পর জানতে

পারেন যে, ঐ ব্যক্তি দান গ্রহরণের উপযুক্ত নয়, তা হলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী আদায় হয়ে যাবে। তবে ঐ ব্যক্তি যদি দাতার গোলাম বলে ধরা পড়ে, তা হলে আদায় হবে না।

৫। যদি কেউ মুবাহর হিসাবে খানা খাওয়ান, তা হলে ফকীরকে মোটামুটি দুই বেলা পেট ভরে খাওয়ানোর উপরে সক্ষম থাকা যথেষ্ট। যে বালক বালেগ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে, তাকেও খাওয়ানো যথেষ্ট হবে। যে বালক খুবই ছোট এবং তার বালেগ হওয়ার যথেষ্ট দেরী আছে, তাকে খাওয়ালে যথেষ্ট হবে না।

৬। মুবাহ হিসাবে খাওয়ানোর জন্য এটাও একটি শর্ত যে, দুই ওয়াক্ত সকাল-সন্ধ্যা খাওয়াতে হবে। অথবা দুই দিন সকালে অথবা দুই দিন বিকালে খাওয়াতে হবে। অর্থাৎ দুই বেলা খাওয়ানো জরুরী। শুধু এক বেলা খাওয়ানো জায়েয নয়।

৭। উভয় বেলা পেট ভরে খাওয়ানো শর্ত। যদি কারও প্রথম হতেই পেট ভরা থাকে এবং সে খাওয়ায় শরীক হয়ে যায়, তা হলে তার খাওয়া যথেষ্ট হবে না। পরিমাণের কোন নিশ্চয়তা নেই। পেট পূর্ণ হওয়াই বিবেচ্য। যদি খানা আবশ্যকীয় পরিমাণ হতে কম হয় এবং সবার পেট ভরে যায়, তা হলে জায়েয হবে। আর যদি পেট না ভরে, তাহলে জায়েয হবে না– যদিও আবশ্যকীয় পরিমাণ খাবারই রান্না করা হয়ে থাকে। বরং আরো এই পরিমাণ খাবার খাওয়ানো জরুরী হবে যাতে তাদের পেট ভরে যায়। যদি এক বেলা পেট ভরে খাওয়ানো হয় এবং আরেক বেলার মূল্য অথবা সোয়া চৌদ্দ ছটাক গম দিয়ে দেয়া হয়, তা হলেও জায়েয হবে।

৮। কাফ্ফারা দেওয়ার সময় কাফ্ফারার নিয়ত থাকা। যদি দান করার সময় নিয়ত না থাকে বরং দেয়ার পূর্বে অথবা পরে নিয়ত করা হয়, তা হলে কাফ্ফারা আদায় হবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মদীনা মুনাওয়ারা

আল-মদীনার বিবরণ ঃ

মদীনা মুনাওয়ারা মক্কা মুকাররামা হতে ঠিক উত্তর দিকে অবস্থিত। জাহেলিয়া যুগে ইহাকে ‘ইয়াসরিব’ বা ‘আসরাব’ বলা হত। কোন কোন বর্ণনায় এ নামের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ইয়াসরিব অর্থ অপমান এবং ধূলি-মলিনতা। সুতরাং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ নাম পাল্টিয়ে এর নাম মদীনা রেখেছেন। কোরআনপাকের অধিকাংশ স্থানে এই নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا – কোরআন (৯ঃ১০১)

এর বরকতের প্রভাবেই তার তামাদ্দুন ও সভ্যতা হতে পৃথিবীর প্রতিটি ভূ-খন্ড শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং করছে। ‘ওয়াফাউল-ওয়াফা’ গ্রন্থে মদীনা মুনাওয়ারার

চৌরানব্বইটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা দ্বারা মদীনা মুনাওয়ারার গৌরব ও মর্যাদা প্রতীয়মান হয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা মুনাওয়ারার বহু ফযীলত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারার সম্মান ও মর্যাদার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, এটা সরদারে দো-আলম, আল্লাহ্‌র হাবিব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাসস্থান এবং রওযাপাক।

মদীনা মুনাওয়ারা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী ঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনার জন্য দোয়া করলেন–

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন লোক প্রথম ফসল লাভ করত তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট নিয়ে আসত। যখন তিনি তা গ্রহণ করতেন বলতেন, "আল্লাহ্! আমাদের ফল শস্যে বরকত দাও, আমাদের এ শহরে বরকত দাও। আমাদের বাড়ীতে বরকত দাও ও আমাদের সেরিতে বরকত দাও। আল্লাহ্, ইব্রাহীম তোমার বান্দা, তোমার দোস্ত ও তোমার নবী এবং আমিও তোমার বান্দা ও নবী। তিনি তোমার নিকট মক্কার জন্য দোয়া করেছেন এবং আমি তোমার নিকট মদীনার জন্য দোয়া করছি যেরূপ দোয়া তিনি তোমার নিকট মক্কার জন্য করেছিলেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপন পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ ছেলেকে ডাকতেন এবং তাকে ঐ ফল দান করতেন।" –(মুসলিম)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনাকে সম্মানিত করেছেন–

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাকে সম্মানিত করে উহাকে হারাম করেছেন, আর আমি মদীনাকে এর দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থলকে সম্মানিত করলাম যথাযোগ্য সম্মানে, এতে রক্তপাত করা চলবে না; যুদ্ধের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করা যাবে না এবং পশুর খাদ্যের জন্য ছাড়া এতে কোন গাছের পাতা ঝাড়া যাবে না। –(মুসলিম)

মদীনায় দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ করলে কিয়ামতে সুখী হবে–

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, উম্মতের যে ব্যক্তি মদীনার অনটন ও দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, নিশ্চয় আমি কেয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হব। –(মুসলিম)

মদীনার দরজা ফেরেশতাগণ পাহারা দিচ্ছেন–

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মদীনার দ্বারসমূহে ফেরেশতাগণ পাহারায় রয়েছে সুতরাং তাতে প্রবেশ করতে পারবে না মহামারী ও দাজ্জাল। –(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনা শরীফকে মহব্বত করা উচিত–

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন সফর হতে আগমনকালে মদীনার প্রাচীর দেখতে আপন সওয়ারীর উটকে তাড়া করতেন আর যদি তিনি ঘোড়া বা খচ্চরে থাকতেন ওটাকে নাড়া দিতেন মদীনার মহব্বতের কারণে। –(বোখারী)

উহুদ পাহাড় মুসলমানদের ভালবাসে–

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– উহুদ এমন একটি পর্বত, যে আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি। –(বোখারী)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় ইন্তেকালকারীকে সুপারিশ করবেন–

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– যে মদীনায় মরতে পারে সে যেন তাতে মরে। কেননা, যে মদীনায় মরবে আমি তার জন্য সুপারিশ করব। –(আহমদ ও তিরমিযী)। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্ তবে সনদ হিসাবে গরীব।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজার শরীফ জিয়ারত করা পূণ্যের কাজ–

হযরত খাত্তাব পরিবারের এক ব্যক্তি (সাহাবী) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– যে কেবল আমার জিয়ারত উদ্দেশ্যে এসে আমার যিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার পার্শ্বে থাকবে, আর যে মদীনাতে বসবাস এখতিয়ার করবে এবং তার কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী বা সুপারিশকরী হব এবং যে দুই হেরেম শরীফের কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা বিপদমুক্তদের অন্তর্ভূক্ত করে উঠাবেন।

হজ্জের পর মদীনা শরীফ জিয়ারত করতে হয়–

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম করে বলেন যে, তিনি বলেছেন– যে হজ্জ করার পরে আমার জিয়ারত করেছে আমার মৃত্যুর পরে, সে হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আমার জীবনে আমার জিয়ারত করেছে। –(উক্ত হাদীস দুইটি বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)

আকীক উপত্যকায় দু'রাকাআত নামায এক উমরাহর সমতুল্য–

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন– আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তখন তিনি আকীক উপত্যকায় ছিলেন, এ রাতে আমার পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে আমার নিকট একজন আগমনকারী আগমন করেন এবং বলেন, আপনি এ মোবারক উপত্যকায় নামায পড়ুন এবং তাকে উমরাহ্‌সহ এক হজ্জ গণ্য করুন। অপর বর্ণনায় আছে, উমারাহ্ ও হজ্জ গণ্য করুন। –(বোখারী)

হরমে মদীনা

হানাফীদের মতে মদীনা মুনাওয়ারার জন্য হরম নেই এবং বাকী তিন ইমামের মতে মদীনা মুনাওয়ারার জন্যও হরম রয়েছে। তাঁদের মতে সেখানকার শিকার ধরা অথবা বৃক্ষ-লতা-পাতা ইত্যাদি কর্তন করা জায়েয নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– "আমি মদীনাকে হরম ঘোষণা করেছি।" অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন– মদীনা মুনাওয়ারার জাবালে ইর এবং জাবালে সওরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু হরম। জাবালে ইর মদীনা মুনাওয়ারার প্রসিদ্ধ পাহাড়। জাবালে সওর উহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে একটি ছোট্ট পাহাড়ের নাম। এ ব্যাপারে সাধরণভাবে লোকজন অবহিত নয়। কিন্তু 'কামুস' গ্রন্থকার এবং অন্যান্য আলেমদের মতে এটি মুহাক্কাকভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, সওর মদীনা মুনাওয়ারায় উহুদ পাহাড়ের পেছনে একটি ছোট্ট গোলাকার পাহাড়। কিন্তু অন্য বর্ণনার ভিত্তিতে হানাফীদের নিকট হরমে মদীনার হুকুম হরমে মক্কার অনুরূপ নয়। তার দ্বারা মদীনা মুনাওয়ারার হুরমত এবং সম্মানই উদ্দেশ্য। এর অর্থ হলো, মদীনা মুনাওয়ারার সীমানার ভেতরে প্রাণী ধরা এবং তার গাছ-বৃক্ষ কর্তন করা যদিও হারাম নয়, কিন্তু আদবের পরিপন্থি।

মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের জাহেরী ও বাতেনী গুরুত্ব

মক্কা মুয়াজ্জামা ও মদীনা মুনওয়ারার গুরুত্ব সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ), হযরত ইমাম মালেক (রাঃ), ও হযরত ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এই তিন ইমামের মতে শহর হিসাবে মক্কা শহর মদীনা থেকে উত্তম। কেননা, আল্লাহ্‌পাক মক্কা শহরের শপথ করেছেন।

মক্কা মোয়াজ্জামায় আল্লাহ্রই ঘর খানায়ে কা'বা, হাজরে আসওয়াদ, যমযম, সাফা মারওয়া, মাকামে ইব্রাহীম, মিনা-মোজদালেফা আরাফাত সবকিছুই মক্কা শরীফে অবস্থিত। প্রাণের নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এখানেই জন্ম, কৈশর, যৌবন এমনকি এখানেই জীবনের ৫৩ টি বৎসরই অতিবাহিত করেন।

হযরত ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) এর মতে মদীনা শহরই উত্তম। তাঁর যুক্তি হলো– মক্কাতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবস্থানের কারণেই আল্লাহ্ তা'য়ালা মক্কা শহরের শপথ করেছেন।– (সূরা বালাদ-এ)। সুতরাং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐ হুকুমেরও পরিবর্তন হওয়া যুক্তিযুক্ত। তদুপরি, তাবরানী শরীফে আছে "মক্কা হতে মদীনা উত্তম" (শেখ দেহলভীর জযবুল কুলুব সূত্রে তাবরানী)।

কোন কোন অভিমতে জানা যায়, হযরত ইমাম মালেক (রাঃ) এর মতে মদীনা মুনাওয়ারাই উত্তম।

প্রাণের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন– "মক্কা থেকে মদীনা উত্তম।" (তাবরানী শরীফ- জযবুল কুলুব ও মাওয়াহিব)।

তাবরানী শরীফের এ হাদীসের আলোকে হযরত শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) তাঁর রচিত জযবুল কুলুব গ্রন্থে বলেছেন– হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফ ছিল উত্তম। হিজরতের পর মদীনা শরীফই এখন উত্তম। নবীজীর অবস্থানের কারণেই মদীনা শরীফের ফযিলত বেশী।

ইমামগণের এই মত কেবল শহরের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কিন্তু রওযা মোবারকের পবিত্র স্থানটুকু সম্পর্কে সকল ইমামই একমত যে, রওযা মোবারকের যে স্থানটুকু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র দেহের সাথে সংযুক্ত, তা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এমনকি, বাইতুল্লাহ, বাইতুল মামুর, আরশ-কুরছি-লাওহ-কলম থেকেও উত্তম। (ফতোয়ায়ে শামী যিয়ারত অধ্যায়)। আরবী এবারত ৬০তম অধ্যায়ে দেখুন। জনৈক আশেক কবি বলেন–

কাব্যানুবাদ ঃ

আরশ হতে অধিক উত্তম দয়াল নবীর রওযাপাক,
সেই রওযাতে আশেকদেরই লক্ষ কোটি সালাম যাক।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে– আইনের চোখে যাই হোক না কেন, প্রেমের চোখে কিন্তু মদীনার মূল্যই আলাদা। প্রেমিকজনের কাছে প্রেমাস্পদের শহরই সর্বোত্তম। ইমাম মালেক (রাঃ) মদীনাবাসী হয়েও জীবনে মাত্র একবার ফরয হজ্জ আদায় করতে মক্কা শরীফ এসেছিলেন। তিনি মদীনা ছেড়ে জীবনে আর কোথাও ভ্রমণ করেননি। তিনি জীবনে কখনো জুতা পায়ে দিয়ে মদীনার গলিতে চলতেন না এবং প্রস্রাব পায়খানার কাজও মদীনার বাইরে যেয়ে সেরে আসতেন। রূহানী জগতে বিচরণকারী আশেকান মদীনার জমিনে যেই প্রশান্তি লাভ করেন– মক্কার জমিনে সেই

প্রশান্তি পান না। মদীনাতে হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুয়ে আরাম করছেন। সুতরাং প্রেমিকজনের দিলের কা'বা হচ্ছে মদীনা। "মক্কা হচ্ছে কপালের কা'বা কিন্তু মদীনা হচ্ছে ক্বলবের কা'বা (খাজা আজমেরী)। সত্যি বলতে কি– কা'বারও কা'বা হচ্ছে সোনার মদীনা।

জনৈক কবি বলেন– "আমাদের মুখ কা'বার দিকে, কিন্তু কা'বার মুখ মদীনার দিকে। সত্যিই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হচ্ছেন কা'বারও কা'বা।

মক্কা হলো নবিজীর প্রিয় মাতৃভূমি, আর মদীনা হলো আল্লাহর প্রিয় হাবীবের রওযা ভূমি। আমাদের আক্বিদা হলো ফতোয়ায়ে শামী বর্ণিত ফতোয়া এবং তাবরানী বর্ণিত হাদীস।

মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশকালীন আদব

মদীনা মুনাওয়ারার নিকটে পৌঁছে মনের মধ্যে অত্যন্ত বিনয়, নম্রতা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করবেন, সওয়ারী বা যানবাহন সামান্য দ্রুত চালাবেন; আর প্রচুর পরিমাণে দুরূদ ও সালাম পাঠ করবেন।

মাসআলা ঃ

১। যখন মদীনা মুনাওয়ারা দৃষ্টিগোচর হবে এবং তার গাছ-পালা চোখে পড়বে, তখন প্রচুর দোয়া প্রার্থনা করবেন আর দুরূদ ও সালাম পাঠ করবেন। সওয়ারী হতে অবতরণ করে খালি পায়ে ক্রন্দন করতে করতে এগিয়ে যাওয়া এবং যথাসম্ভব আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য। সত্যি বলতে কি, **এ পবিত্র ভূমিতে যদি মাথার উপর ভর দিয়েও চলাফেলা করা হয় তবুও হক আদায় হবে না,** কিন্তু যতটুকু করা সম্ভব সে ব্যাপারে কোন ত্রুটি করতে নেই।

২। যখন মদীনার নগর প্রাচীর সম্মুখে আসবে, তখন দুরূদের পর এ দোয়া পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ لِيْ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ

"আল্লাহুম্মা হাজা হারামু নাবিয়্যিকা ফাজ্'আল্হু-লি বেকায়াতাম মিনান্নারী ওয়া আমানাম্ মিনাল আজাবী ওয়া সুওআল হিসাবী।"

নগরীতে প্রবেশের পূর্বে যদি সম্ভব হয় গোসল করে নিবেন। অগত্যা যদি প্রবেশ করার সময় তা সম্ভব না হয়, তবে প্রবেশ করার পর গোসল করবেন। যদি গোসল করতে সক্ষম না হন, তাহলে অযু অবশ্যই করবেন। কিন্তু গোসল করাই উত্তম। তারপর পাক-সাফ কাপড় পরিধান করবেন। নতুন কাপড়ই উত্তম। খুশবু লাগাবেন। যখন নগরের দরজায় উপনীত হবেন, তখন পড়বেন–

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّارْزُقْنِىْ مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ مَا رَزَقْتَ اَوْلِيَاءَكَ وَاَهْلَ طَاعَتِكَ وَ اَنْقِذْنِىْ مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْ لِىْ وَ ارْحَمْنِىْ يَا خَيْرَ مَسْئُوْلٍ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِيْهَا قَرَارًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا .

"বিছমিল্লাহি মাশাআল্লাহু লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি রাব্বি আদখিলনী মুদখালা সিদকিও ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদকিও ওয়ারঝুকনী মিন যিয়ারাতি রাসূলিকা মা রাঝাকতা আওলিয়া ইকা ওয়া আহলা ত্ব'আতিকা ওয়ান কিজনী মিনান্ নারী ওয়াগ্ফির লি ওয়ার্হাম্নী ইয়া খাইরা মাস্উলিন আল্লাহুম্মাজ্আল্ লানা ফিইহা ক্বারারাও ওয়া রিঝকান হাসানান।"

৩। যখন সবুজ গম্বুজ (তার অধিকারীর প্রতি হাজার হাজার দুরূদ ও সালাম) দৃষ্টিগোচর হবে, তখন তার পরিপূর্ণ মর্যাদা, সম্মান ও আভিজাত্যের কথা স্মৃতিতে ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা, এটা সারা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত স্থান, স্মৃতি সৌধ।

৪। নগরে প্রবেশ করে সর্বাগ্রে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার চেষ্টা করবেন। যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তা হলে তা সেরে সাথে সাথে মসজিদে চলে আসবেন এবং যিয়ারত করবেন। অবশ্য মহিলাদের জন্য রাতের বেলাই যিয়ারত করা উত্তম।

৫। মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার সময় অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে ডান পা প্রথমে রাখবেন এবং এ দোয়া পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া সাহবিহী ওয়াসাল্লিম আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী জুনুবী ওয়াফ্তাহ্ লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিকা।"

যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারেন, তবে বাবে জিবরাঈল (আঃ) দিয়ে প্রবেশ করাই উত্তম এবং চিরাচরিত নিয়ম। মসজিদে প্রবেশ করে মিম্বর এবং রওযা শরীফের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়বেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, এ নামায যেন মাকরূহ ওয়াক্তে না হয়। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতেহার পরে সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা এখ্লাস পাঠ করবেন। মিম্বর এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওযা শরীফের মাঝখানে যে ভূমিখন্ড রয়েছে তাকে 'রিয়াযুল জান্নাহ্' বলা হয়। এ সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন–

مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ

"মা বাইনা বাইতী ওয়া মিম্‌বারী রাওদ্বাতুম মিন্ রিয়াদ্বিল জান্নাতি।"

অর্থাৎ "আমার ঘর (বর্তমান রওযা শরীফ) এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান।"

বেহেশতের টুকরার মধ্যে মিহরাবে নববীতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পাঠ করা উত্তম। আর যদি সেখানে স্থান না পাওয়া যায়, তবে ভেতরে যেখানে স্থান পাওয়া যাবে সেখানেই পড়ে নেবেন। সালাম ফিরায়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার হামদ ও সানা এবং শুকরিয়া আদায় করবেন, আর যিয়ারত কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করবেন। কোন কোন আলেমের মতে আল্লাহ্ তা'য়ালা এ সর্বোত্তম নিয়ামত দ্বারা পুরস্কৃত করার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদায়ে শোকরও করতে হবে। তবে শোকরিয়া আদায়ের নিয়তে আল্লাহ্‌র দরবারে দু'রাকআত শোকরানার নামায আদায় করাই উত্তম। শুধু সিজদা করবেন না, যদিও তা জায়েয আছে।

৬। যদি তখন ফরয নামাযের জামা'আত হতে থাকে অথবা নামায ক্বাযা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে প্রথমে ফরয নামায আদায় করে নেবেন। এতে তাহিয়্যাতুল মসজিদও আদায় হয়ে যাবে।

মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং রওযা শরীফ পরিচিতি

পবিত্র মসজিদে নববীর স্থানটি প্রাথমিক পর্যায়ে সাহল ও সুহায়েল নামে দুটি এতিম বালকের মালিকানাধীন ছিল। লোকে এখানে নামায পড়তো ও খেজুর শুকাতো। কয়েকটি পুরাতন কবরও এখানে ছিল। হিজরতের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর বাহনটি এখানে এসে বসে পড়লো এবং তিনি এরশাদ করলেন- "ইনশাআল্লাহ্ এখানেই মনজিল হবে।"

মসজিদের উদ্দেশ্যে স্থানটি খরিদ করার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উক্ত বালকদ্বয়ের কাছে প্রস্তাব পাঠালে তারা বললো, "আমরা বরং এটা আপনার জন্য হেবা (দান) করে দিলাম।" কিন্তু হেবাকৃত জমির উপর মসজিদ করতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অস্বীকৃতি জানালে তারা এটা মসজিদের জন্য বিক্রি করে দিল।

স্থানটি পরিষ্কার ও সমতল করা হলে, পাথর ও কাঁচা ইটের সাহায্যে মসজিদের কাজ আরম্ভ হলো। হযরত সাহাবা (রাঃ) গণ ইট বহন করে আনতেন এবং দেয়াল গাঁথতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাজে সাহায্য করতেন এবং দোয়া করতেন–

اَللّٰهُمَّ لَاخَيْرَ اِلَّاخَيْرُ الْاٰخِرَةِ . فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

"আল্লাহুম্মা লা খাইরাল্ আখয়ারুল আখিরাতা ফাগ্‌ফিরিল আন্‌ছারা ওয়াল মুহাযিরা।"

"আয় আল্লাহ, আখেরাতের কল্যাণই কল্যাণ; সুতরাং আনসার ও মুহাজিদদের মাফ করে দিন।"

পবিত্র মসজিদের খুঁটি খেজুর গাছের এবং ছাউনি ছিল খেজুর পাতার। বৃষ্টির সময় ভিতরে পানি পড়তো এবং মেঝে কাঁচা থাকার কারণে ইহা কর্দমাক্ত হয়ে যেত। এটাই ছিল ইসলামের আযিমুশ্‌শান মসজিদের প্রাথমিক অবস্থা।

পবিত্র মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে, হযরত উম্মুল মু'মিনীনদের বাস গৃহ তৈরি হয় এবং বর্তমান রওযা শরীফের স্থানে ছিল হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ঘর। উমাইয়া খলিফা আল্ ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেকের সময় উক্ত বাসগৃহগুলো ভেঙ্গে পবিত্র মসজিদের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়। 'রওযা শরীফ"– ঐ মহাপবিত্র জায়গাটুকু যেখানে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুয়ে আছেন।

হযরত ওসমান (রাঃ) এর খেলাফত আমলে পবিত্র মসজিদের কলেবর বৃদ্ধি করে ইমারতের পর্যায় ভুক্ত হয়। অতঃপর বিভিন্ন যুগে ইসলামের নেতৃবৃন্দগণ এর সংস্কার সাধন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে, তুর্কী সুলতান আবদুল মজীদ ইহার চূড়ান্ত সংস্কার করেন। মূল মসজিদটি আজও তাঁদের অর্থ, শ্রম ও সদিচ্ছার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

বর্তমান শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে, পবিত্র মসজিদ আকার-আয়তনে আরো বিস্তৃত হয়। ইহার বাইরেও দীর্ঘ শেড তৈরী করা হয় বহুদূর পর্যন্ত। দক্ষিণের মেহরাবের দিকটা অবশ্য এই বিস্তারের আওতায় পড়েনি। এই পাশে কোন দরজাও হয়নি। অন্যান্য পার্শ্বে দরজা স্থাপিত হয় দশ জোড়া। এগুলো স্বকীয় নামে ও আকারে অতিশয় মর্যাদাবান।

পবিত্র মসজিদের পশ্চিমে দেয়াল, দক্ষিণ থেকে উত্তরে যথাক্রমে বাবুস সালাম, বাবে আবু বকর, বাবে রহমত ও বাবে ইবনে সউদ অবস্থিত। উত্তর দেয়ালের মধ্যের দরজাটি বাবে মজিদী, পশ্চিমেরটি বাবুল ওমর এবং পূর্ব দেয়ালের সর্বোত্তরে বাবে ইবনে সউদ, দক্ষিণ দেয়ালে বাবে বেলাল এবং পূর্ব দেয়ালে বাবুন্ নেছা এবং সর্ব দক্ষিণে বাবে জিব্রাঈল ও বাবে জান্নাতুল বাকী অবস্থিত।

বাবে জিব্রাঈল বরাবর সামনে ডানপার্শ্বে, স্বল্পোচ্চ রেলিংয়ে ঘেরা অঙ্গনটি আস্‌হাবে সুফ্‌ফা নামে পরিচিত। এটা ছিল দরিদ্র সাহাবাদের আশ্রয়াঙ্গণ। এরই দক্ষিণ পার্শ্বে সংলগ্ন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর রওযা শরীফ অবস্থিত। পবিত্র রওজা শরীফের চারদিকে লোহার গ্রীলের বেষ্টনী এবং মাটির নীচে বেশ গভীর পর্যন্ত রয়েছে ঢালাই সীসার দেয়াল।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মাথা মোবারক পশ্চিম দিকে এবং চেহারা মোবারক দক্ষিণে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে রয়েছে। তাঁর পবিত্র সীনা

মোবারক বরাবর উত্তর পার্শ্বে শরীর মোবারক রেখে শুয়ে আছেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং তাঁর সীনা মোবারক বরাবর উত্তর পার্শ্বে শরীর মোবারক রেখে শুয়ে আছেন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)। তাঁরও উত্তরে এবং রওজা শরীফের মধ্যেই আরো একটি কবরের স্থান খালি রয়েছে; এটা হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্য সংরক্ষিত।

বাবে রহমত ও বাবুন নেছা বরাবর দক্ষিণের অংশ প্রাচীন মসজিদের অন্তর্গত এবং উত্তরের অংশ আধুনিক সম্প্রসারণ। প্রাচীন অংশের মধ্যে রয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর মেহরাব এবং অনেকগুলো স্তম্ভ। এগুলোর প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র নাম ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এই স্তম্ভগুলোর পেছনে দাঁড়িয়ে, বিশেষ করে 'রওযাতুম মিন্ রিয়াযুল জান্নাতে' নামায পড়া, তিলাওয়াত ও জিকির করা খুবই ফজিলত পূর্ণ আমল। এটা দোয়া কবুলের স্থান বলে বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– "আমার গৃহ এবং মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটি, বেহেশতের বাগানসমূহ থেকে একটি বাগান (রওযাতুম মিন্ রিয়াযুল জান্নাত)। আমার এই মিম্বার (হাশরের ময়দানে), আমার হাউজে কাওসারের কিনারে স্থাপিত হবে।"– (বুখারী)। এই পবিত্র স্থানে ইবাদত বাস্তবিকই জান্নাতী সুখকালীন সময়ে অনুভব করা যায়।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর মেহরাব ও মিম্বার, রিয়াযুল জান্নাতের মধ্যে এবং হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এর মেহরাব ইহার বাইরে অবস্থিত। হযরত ওসমান (রাঃ) এর মেহরাব, পবিত্র মসজিদের দক্ষিণ দেয়ালের সঙ্গে যুক্ত এবং এর মাত্র কয়েক কাতার উত্তর পার্শ্বে এই তিনটি জিনিস সুরক্ষিত হয়ে আছে। হযরত ওসমান (রাঃ) এর মেহরাবই মসজিদে নববীর বর্তমান ইমাম সাহেবদের মেহরাব; জুম'য়ার খুতবা অবশ্য হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর মিম্বার থেকেই প্রদান করা হয়ে থাকে।

পবিত্র রিয়াজুল জান্নাতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, প্রায় ৭ ফুট উঁচু চেক পোস্টের মত একটি প-াটফর্ম আছে। এটা মূল্যবান শ্বেত পাথরের তৈরী একটি স্-াব। তার চারটি খুঁটিও একই পাথরের তৈরী। এই প-াটফরম মুয়াজ্জিন, মুকাব্বির ও নিরাপত্তা বিভাগের কতিপয় কর্মচারীর অবস্থান।

আসহাবে সুফ্ফার পূর্ব পার্শ্বে অর্থাৎ বাবে জিব্রাইল দিয়ে ঢুকতে ডান পার্শ্বে একটি কক্ষ দেখা যায়। এটা মসজিদে নববীর খাদেম সম্প্রদায়ের ব্যবহারে রয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়।

মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর একটি কক্ষ আছে; যা নযুলে অহী নামে পরিচিত। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কখনও কখনও এখানে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর নিকট অহী নিয়ে আসতেন।

উত্তর পাশের বাবে মজিদী দিয়ে প্রবেশ করলে, পবিত্র মসজিদের মধ্যে ছাদ বিহীন একটি অঙ্গণ সামনে পড়ে। এর অল্প দক্ষিণে অনুরূপ আরো একটি অঙ্গণ ছাদ বিহীন

অবস্থায় আছে। বিগত কয়েক বৎসর যাবত, আলোচ্য মুক্ত অঙ্গণ দু'টির উপর বিদ্যুৎ চালিত ছাতা নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোকে রোদ বৃষ্টির সময় খোলা এবং অন্য সময় বন্ধ রাখা হয়। এই খোলা এবং বন্ধ প্রক্রিয়াটি দেখতে অতিশয় মনোরম। পূর্বে এখানে এরকম বারটি ছাতা নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে চারিদিকে সম্পূর্ণ আঙ্গিনা বিদ্যুৎ চালিত ছাতা দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়েছে।

মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে, আবু লুলু ওরফে ফিরোয নামে এক গোলামের ছুরিকাঘাতে, পবিত্র মসজিদের মেহরাবের মধ্যে শহীদ হন।

৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে খারিজী বিদ্রোহীদের হাতে স্বীয় বাসগৃহে শহীদ হন তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)। এই দুই মহাত্মনের পূণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে, উক্ত অঙ্গণ দু'টিকে ছাদ বিহীন অবস্থায় রাখা হয়েছে বলে এদেশের কোন কোন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। তবে কারণ যাই হোক, পবিত্র মসজিদে মুক্ত আলো-বাতাস চলাচলের পথ সুগম রাখার জন্য এটা যে একটি বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ এতে কোন সন্দেহ নেই।

ছাদ মুক্ত অঙ্গণ দু'টির পূর্ব পার্শ্বে এবং বাবুল ওসমান থেকে বাবুন নেছা পর্যন্ত সমগ্র এলাকাটি বর্তমানে মহিলাদের নামাযের জন্য স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে।

কিন্তু মসজিদে নববীর সে প্রাচীন চিত্র ঠিক সেভাবে আর খুঁজে পাওয়া যায় না; বর্তমানে এর ভিতর-বাইরের আয়তন অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। দক্ষিণ পার্শ্বের মেহরাব-যুক্ত দেয়ালটি, পূর্ব স্থানে বহাল তবিয়তে আছে সত্য, কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বিত একটি নতুন কক্ষ তৈরী এবং এর তিন পার্শ্বে, নাম নম্বর বিহীন তিনটি দরজা খোলা হয়েছে। এ পথটি ইমাম সাহেবের গমানাগমন এবং মাইয়েতের নামাযে জানাযার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, জানাযার নামায এখানে মসজিদের মধ্যেই আদায় করা হয়।

আলোচ্য লম্বা কক্ষটির দক্ষিণে বহু দূর পর্যন্ত প্রাচীন ঘর বাড়ি ভেঙ্গে, খোলা ময়দান সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এর বাড়িও এ ভাঙ্গা অভিযান থেকে রক্ষা পায়নি।

পশ্চিম পার্শ্বের বাবুস সালাম, বাবে আবু বকর ও বাবে রহমতকে স্ব স্ব স্থানে রেখে এবং বাকী দেয়াল ও দেয়াল সংলগ্ন বাইরের শেড ভেঙ্গে, পবিত্র মসজিদকে পশ্চিমে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। তারও পশ্চিমে ছেড়ে রাখা হয়েছে বিস্তির্ণ খোলা ময়দান।

পবিত্র মসজিদ উত্তরেও বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে; এ পার্শ্বের খোলা ময়দানও বিপুল। পূর্বে এখানে অনেক দোকানপাট ছিল। খোলা ময়দানের উত্তর পার্শ্বে রাজপথ এবং তারও উত্তরে তৈরী করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের আবাসিক হোটেল।

মসজিদে নববীর পূর্ব পার্শ্বে প্রাচীন কালের অনেক দালান-কোঠা এবং সংকীর্ণ গলিপথ বিদ্যমান ছিল; এর পূর্বে দ্বিমুখী-চওড়া রাজপথ এবং তারও পূর্ব পার্শ্বে ছিল মদীনা শরীফের সাধারণ কবরস্থান 'জান্নাতুল বাকী'। এসব দালানকোঠা গলিপথ ও

রাজপথ ভেঙ্গে পবিত্র মসজিদকে পূর্ব দিকে বহু দূর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। অতঃপর যে খোলা ময়দান রয়েছে তার পূর্ব সীমানা একেবারে জান্নাতুল বাকীর পশ্চিম দেয়ালে গিয়ে মিলেছে।

তবে, বাবুন নেছা ও বাবে জিব্রাঈল পূর্ব স্থানেই আছে এবং নজুলে অহীর কেবল উত্তর পার্শ্বে 'বাবুল বাকী' নামে একটি নতুন দরজা খোলা হয়েছে। এটা রওজা শরীফ জিয়ারতকারীদের নির্গমনের পথ।

পবিত্র মসজিদের চারদিকের খোলা ময়দানে বিছানো হয়েছে অতি মূল্যবান শ্বেত পাথর। যা মক্কার বায়তুল্লাহ্ শরীফের মাতাফে বিছানো পাথরেরই অনুরূপ। প্রচন্ড গরমের দিনেও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিধায় এটা গরম হয় না; এটা একটি পরীক্ষিত সত্য। এখানেও নামায আদায় করা হয়।

পূর্বে মসজিদে নববীর আয়তন ছিল ষোল হাজার পাঁচশত বর্গ মিটার এবং বর্তমানে আয়তন এক লক্ষ পয়ষট্টি হাজার বর্গ মিটার। এখানে একত্রে প্রায় সাত লক্ষ লোক নামায আদায় করতে পারে। পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর সর্বশেষ সম্প্রসারণের জন্য যত অর্থ খরচ হয়েছে তার পরিমাণ সত্তর বিলিয়ন রিয়ালের চেয়ে কিছু বেশী।

পবিত্র মসজিদের মোট স্তম্ভ তিন হাজার তিনশো ষাটটি, গম্বুজ একশত চুয়ান্নটি, ছাদ মুক্ত অঙ্গণ একশত ছাপ্পান্নটি এবং মিনার মোট দশটি। ছাদ মুক্ত অঙ্গণের কতিপয়ের উপর তো ছাতা টানানো এবং কতিপয়ের উপর আলো প্রবেশ করতে পারে এমন স্বচ্ছ পদার্থের ছাউনি দেয়া হয়েছে। মিনারগুলো অতি উচ্চ এবং এগুলো কেবল মদীনা শরীফের নয়, সমগ্র মুসলিম জাহানের ল্যান্ড মার্ক।

প্রায় সকল পার্শ্বের খোলা ময়দানের নীচে গাড়ি পার্কিং এবং চারতলা বিশিষ্ট মাটির নীচে হাম্মামখানা তৈরী করা হয়েছে। উঠা-নামার জন্য সিঁড়ির পাশাপাশি বিদ্যুৎ চালিত এসক্যালেটরের ব্যবস্থাও আছে। প্রতিটি হাম্মামের মধ্যে বহু সংখ্যক গোসলখানা, পায়খান, প্রস্রাব ও অযুখানা রয়েছে। এগুলোর সংখ্যা পনের; তন্মধ্যে দশটি সাধারণ পুরুষের এবং বাকীগুলো মহিলা ও ভি.আই.পি-দের জন্য সংরক্ষিত।

মসজিদে নববী ও রওযা মোবারক যিয়ারতে উত্তম পোশাক পরিধান করা

আল্লাহ তা'য়ালা মসজিদে প্রবেশে, বিশেষভাবে নামায পড়ার সময়ে উত্তমভাবে সাজতে বলেছেন। তবে সাজার জন্য এমন কিছু ব্যবহার করা যাবে না, যার কারণে অপচয় বা অপব্যয় হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন–

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا
ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ .

অর্থাৎ, "হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা করে নাও, খাও, পান কর; তবে অপচয় করো না, নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।"–সূরা আরাফ ঃ ৩১

এ আয়াতের তাফসীরে মুফতী শফী (রঃ) বলেন– "এ আয়াতে পোশাককে যিনাত (সাজসজ্জা) শব্দে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযে শুধু আবরণীয় অঙ্গ আবৃত করা ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করা শ্রেয়। হযরত হাসান (রাঃ) নামাযের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, "আল্লাহ্ সৌন্দর্য পছন্দ করেন। তাই আমি প্রতিপালকের সামনে সুন্দর পোষাক পরে হাজির হই।"

আমরা দুনিয়ার কোন সম্মানিত ব্যক্তির সামনে যাওয়ার জন্য সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করার চেষ্টা করি। অথচ আমরা আল্লাহর সামনে যেনতেন পোশাক পরিধান করে নামায আদায় করি। মসজিদে যাওয়ার সময় উত্তম পোশাক পরিধান করে যাওয়া, বিশেষত মসজিদে নববী যিয়ারত করতে সামর্থ্য অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পোশাক পরিধান করা ভালো।

দুর্গন্ধযুক্ত কিছু নিয়ে মসজিদে প্রবেশ না করা

মসজিদে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আগমন করে। বিশেষত মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মিলন কেন্দ্র। কেউ দুর্গন্ধযুক্ত কিছু নিয়ে মসজিদে গেলে অন্যদের কষ্ট হয়। এ কারণে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– "যে ব্যক্তি পেঁয়াজ বা রসুন খেল সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং সে যেন তার ঘরে বসে থাকে।"

অন্য হাদীসে আছে, এতে ফেরেশতা ও অন্য মানুষের কষ্ট হয়। উপরে উল্লিখিত হাদীসে পেঁয়াজ ও রসুনের কথা বলে এমন সব জিনিস বোঝানো হয়েছে, যা দুর্গন্ধ ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত কিছু নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা ঠিক নয়। সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে প্রবেশ করা উত্তম।

রওযা শরীফ যিয়ারতে লক্ষণীয় বিষয়

রওযা শরীফ যিয়ারত করার সময় কতিপয় বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। রওযা শরীফ যিয়ারতের সময় সকলের মনেই আবেগ আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রেমের ঢেউ জাগে। জীবনে কোন দিন না দেখেও যাঁর প্রতি মনের এত

অনুরাগ, তিনি আজ খুবই কাছে। তাঁকে স্বচোখে দেখতে না পেলেও তিনি আমাদের সালাম শুনছেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এভাবে সালাম দেয়ার সৌভাগ্য পৃথিবীতে ক'জনেরই বা হয়।

এ সময় মানুষের মনে অতি আবেগ থাকার কারণে কেউ কেউ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে মনের আকুতি জানান। কেউ বাইরের জালি চুমু দেয়ার চেষ্টা করেন। আর কাউকে কাউকে সিজদা করার চেষ্টায় দেখা যায়, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম। অবশ্য সেখানে নিয়োজিত পুলিশ কোন ধরণের শিরক যেন কেউ না করতে পারে সে দিকে সচেতনভাবে লক্ষ্য রাখেন, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে বা দোয়ার মধ্যে কেউ কেউ এমন কিছু করার চেষ্টা করেন, যা করতে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন। এ সময় বেশি বেশি মাসনুন দোয়া পাঠ করা যেতে পারে। কিয়ামতের দিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শাফায়াত যেন নসীব হয়, সে ধরণের নেক আমল করার তাওফীক কামনা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করা উত্তম।

রওযা শরীফ যিয়ারত

সরওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মওজুদাত, তাজদারে মদীনা সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত সর্বসম্মতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ নৈকট্য এবং সর্বোত্তম সওয়াবের কাজ এবং সম্মান, মর্যাদা, উন্নতির জন্য সমস্ত মাধ্যমের চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কোন কোন আলেম সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের জন্য এ যিয়ারতকে ওয়াজিব গণ্য করেছেন।

স্বয়ং ফখরে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিয়ারতের প্রতি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যিয়ারত না করবে তাদেরকে অভদ্র এবং জালেম বলে অভিহিত করেছেন। সেই ব্যক্তি বড়ই ভাগ্যবান যাকে এ দৌলত দ্বারা পুরস্কৃত করা হয় এবং **অত্যন্ত দুর্ভাগা সেই লোক যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এ সর্বোত্তম নিয়ামত হতে বঞ্চিত থাকে।**

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন–

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِىْ كَانَ فِىْ جَوَارِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْحَدِيْثُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ (مِشْكٰوة)

অর্থাৎ, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার আশে-পাশে থাকবে।”–(মেশকাত)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন–

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ . كَانَ كَمَنْ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ (مِشْكٰوة)

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি হজ্জ সম্পন্ন করল এবং আমার মৃত্যুর পর আমার রওযা যিয়ারত করল, সে যেন জীবদ্দশায়ই আমার যিয়ারত করল।”–(মেশকাত)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন–

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ (رَوَاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ)

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করল অথচ আমার যিয়ারত করল না, সে আমার ওপর জুলুম করল।”–(ইবনে আদ্দীই)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন–

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِىْ وَالْبَزَّار (فَتْحُ الْقَدِيْر)

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি আমার রওযা যিয়ারত করল, আমার ওপর তার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল।” –(দারে কুতনী)

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহে আকায়ে নামদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যিয়ারতের প্রতি যারপরনাই উৎসাহ প্রদান করেছেন। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের এ পরম সৌভাগ্য অর্জন করা উচিত।

রওযা শরীফে সালাম পাঠ করার নিয়ম

মাসআলা ঃ

১। নামাযে তাহিয়্যাতুল মসজিদ সমাপ্ত করে অত্যন্ত আদব সহকারে পবিত্র রওযা মোবারকের নিকটে আগমন করবেন এবং অন্তরকে পৃথিবীর যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা হতে মুক্ত করে রওযা মোবারকের নিকটে আগমন করবেন এবং রওযা শরীফের শিয়রের দেওয়ালের কোণায় যে স্তম্ভ রয়েছে তা হতে ৪ হাত দূরে দাঁড়াবেন এবং কেবলার দিকে পিঠ করে সামান্য বাম দিকে ঝুকে যাবেন–যেন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম)-এর পবিত্র চেহারা সামনে পড়ে। এদিক সেদিক তাকাবেন না, চক্ষু নিম্নগামী করবেন। আদবের পরিপন্থী কোন প্রকার নড়াচড়া করবেন না। খুব নিকটেও দাঁড়াবেন না, সিজদাও করবেন না। এসব কাজ আদব ও সম্মানের পরিপন্থি ও নাজায়েয। সিজদা করা শিরক। এরূপ খেয়াল করবেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রওযা মোবারকে কেবলার দিকে মুখ করে আরাম করছেন এবং সালাম-কালাম শ্রবণ করছেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মান ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করে মধ্যম আওয়াজে সালাম পাঠ করবেন। খুব উচ্চঃস্বরে চিৎকার করবেন না এবং অত্যন্ত নিম্নস্বরেও পড়বেন না। সালাম এভাবে পাঠ করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ
اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللهِ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وُلْدِ اٰدَمَ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ
لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّيْتَ
الْاَمَانَةَ وَ نَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ فَجَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرًا جَزَاكَ اللهُ عَنَّا اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ
مَا جَزٰى بِهٖ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ
الْمَحْمُوْدَ ن الَّذِيْ وَعَدْتَهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَ اَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ اِنَّكَ
سُبْحَانَكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

“আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ্। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খাইরা খাল্‌কিল্লাহ্। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খাইরাতাল্লাহি মিন্ জামীই খাল্‌কিল্লাহি আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদা উল্‌দি আ-দামা আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ইয়া রাসূলাল্লাহি ইন্নী আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শরীকা লাহু ওয়াআশ্‌হাদু আন্নাকা আবদুহু ওয়ারাসূলুহু ওয়াআশ্‌হাদু আন্নাকা ইয়া রাসূলাল্লাহি ক্বাদ্ বাল্লাগ্‌তার রিসালাতা ওয়াআদ্দাইতাল্ আমানাতা ওয়ানাসাহ্‌তাল্ উম্মাতা ওয়া-কাশাফ্‌তাল্ গুম্মাতা ফা জাযাকাল্লাহু আ'ন্না খাইরান্ জাযাকাল্লাহু আ'ন্না আফযালা ওয়াআকমালা মা জাযা বিহী নাবিয়্যান্ আন্ উম্মাতিহী। আল্লাহুম্মা আ-তিহিল্ অছীলাতা ওয়াল্ ফাযীলাতা ওয়াদ্‌দারাজাতার রাফীয়াতা ওয়াবআস্‌হুল মাক্বামাল্ মাহ্মুদানিল্লাযী ওয়াআত্‌তাহু ইন্নাকা লা তুখ্‌লিফুল্ মী'আদ্ ওয়াআনযিল্‌হুল্ মানযিলাল্ মুক্বাররাবা ইন্‌দাকা ইন্নাকা সুবহানাকা যুল্‌ফাযলিল্ আযীম্।”

তারপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উসীলায় দো'আ করবেন এবং নিম্নোক্ত বাক্যের মাধ্যমে শাফাআতের আবেদন জানাবেন–

يَا رَسُوْلَ اللهِ أَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَأَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللهِ فِيْ أَنْ أَمُوْتَ مُسْلِمًا عَلَى مِلَّتِكَ وَ سُنَّتِكَ

"ইয়া রাসূলাল্লাহি আস্আলুকাশ্ শাফাআ'তা ওয়াআতাওয়াস্সালু বিকা ইলাল্লাহি ফী আন্ আমূতা মুস্লিমান্ আলা মিল্লাতিকা ওয়াসুন্নাতিকা।"

সালামের শব্দে যত ইচ্ছা বৃদ্ধি করতে পারবেন। কিন্তু পূর্ববর্তী সালেহীনদের অভ্যাস ছিল সংক্ষিপ্তভাবে সালাম প্রদান করা। তাঁরা সংক্ষিপ্তভাবে সালাম প্রদান করাকেই মুস্তাহসান মনে করতেন। সালামের মধ্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করবেন না যার দ্বারা নৈকট্যজনিত মান-অভিমান প্রকাশ পায়। এটাও এক প্রকার বে-আদবী। যদি কেউ এই শব্দসমূহ পরিপূর্ণভাবে মুখস্থ রাখতে না পারেন, অথবা সময়ের স্বল্পতা থাকে, তাহলে যতটুকু মনে থাকে অথবা যতটুকু বলতে পারেন ততটুকুই বলবেন। সালাম পাঠের সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্।"

২। যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমতে সালাম পেশ করবার জন্য বলে থাকেন, তা হলে ঐ ব্যক্তির সালামও আপনার সালামের পর এইভাবে নিবেদন করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ মিন (নাম) ইয়াছতাশফিউ বিকা ইলা রাব্বিকা।"

আর যদি অনেক অনেক লোক সালাম পেশ করার জন্য বলে থাকেন; আর তাদের নাম মনে না থাকে, তা হলে সবার পক্ষ হতে এইভাবে সালাম নিবেদন করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ جَمِيْعِ مَنْ أَوْصَانِيْ بِالسَّلَامِ عَلَيْكَ

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ মিনজামিয়ে মান আওছানী বিস্সালামি আলাইকা।"

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম পাঠ করার পর ডান দিকে এক হাত সরে এসে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মুখমন্ডল বরাবর দাঁড়াবেন এইভাবে সালাম পাঠ করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ وَثَانِيَهُ فِي الْغَارِ وَرَفِيْقَهُ فِي الْأَسْفَارِ وَأَمِيْنَهُ عَلَى الْأَسْرَارِ أَبَابَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া খালীফাতা রাসূলিল্লাহি ওয়াসানিয়াহু ফিল্গারি ওয়ারাফীক্বাহু ফিল্ আস্ফারি ওয়াআমীনাহু আলাল্ আস্রারি আবা বাক্রিনিস্ সিদ্দীক্বি জাযাকাল্লাহু আ'ন্ উম্মাতি মুহাম্মাদিন্ খাইরা।"

তারপর এক হাত আরো ডান দিকে সরে এসে হযরত ওমর (রাঃ)-এর চেহারা বরাবর দাঁড়িয়ে এইভাবে সালাম পাঠ করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقِ الَّذِىْ اَعَزَّ اللّٰهُ بِهِ الْاِسْلَامَ اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ مَرْضِيًّا حَيًّا وَّمَيِّتًا جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল্ মু'মিনীনা উমারাল্ ফারুক্বিল্লাযী আআ'যযাল্লাহু বিহিল্ ইসলামা ইমামাল্ মুসলিমীনা মারযিয়্যান্ হাইয়্যান্ ওয়া মাইয়্যিতান্ জাযাকাল্লাহু আ'ন্ উম্মাতি মুহাম্মাদিন্ খাইরান্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপর সালাম পাঠ করার শব্দ বাড়ানো কমানোর এখতিয়ার রয়েছে। যদি কেউ সালাম পৌঁছানোর জন্য বলে থাকেন, তা হলে তার সালামও পৌঁছিয়ে দিবেন। কোন কোন আলেম বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে সালাম পাঠ করার পর সরে এসে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর মোকামের (কবর) মাঝখানে দাঁড়িয়ে আবার এইভাবে সালাম পাঠ করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا ضَجِيْعَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَوَزِيْرَيْهِ جَزَاكُمَا اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَزَاءِ جِئْنَا كُمَا نَتَوَسَّلُ بِكُمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَدْعُوَ لَنَا رَبَّنَا اَنْ يُحْيِيَنَا عَلٰى مِلَّتِهِ وَسُنَّتِهِ وَيَحْشُرَنَا فِىْ زُمْرَتِهِ وَجَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ اٰمِيْنَ

"আস্সালামু আলাইকুমা ইয়া দাজীআই রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়াওয়াযীরাইহি জাযাকুমাল্লাহু আহ্সানাল্ জাযাই জি'নাকুমা নাতাওয়াস্সালু বিকুমা ইলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা লি-ইয়াশ্ফাআ লানা ওয়াইয়াদউয়া লানা রাব্বানা আন্ য়ুহ্ইয়ানা আলা মিল্লাতিহি ওয়াসুন্নাতিহি ওয়াইয়াহ্শুরানা ফী যুমরাতিহি ওয়াজামীআ'ল্ মুসলিমীনা আমীন।"

তারপর দ্বিতীয়বার হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওযা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করবেন এবং দরূদ শরীফ পড়বেন; আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উসীলায় দো'আ করবেন এবং শাফাআতের দরখাস্ত করবেন; আর হাত উঠিয়ে নিজের জন্য, নিজের মাতা-পিতা, পরিবার-পরিজন, মাশায়েখ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সকল মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য আর মেহেরবানী করে অত্র পুস্তকের লেখকের জন্যও মনে-প্রাণে দো'আ করবেন। সালাম পাঠ করবার পর এই কথাগুলি উচ্চারণ করা উত্তম–

يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى سُبْحَانَهُ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا فَجِئْنٰكَ ظَالِمِيْنَ لِاَنْفُسِنَا مُسْتَغْفِرِيْنَ مِنْ ذُنُوْبِنَا فَاشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّنَا وَاسْئَلْهُ اَنْ يُّمِيْتَنَا عَلٰى سُنَّتِكَ وَاَنْ يَحْشُرَنَا فِيْ زُمْرَتِكَ

"ইয়া রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ক্বাদ্ কালাল্লাহু তা'আলা সুবহানাহু ওয়ালাও আন্নাহুম্ ইয্ যালামু আন্ফুসাহুম জা-ঊকা ফাসতাগ্ফারুল্লাহা ওয়াস্তাগ্ফারা লাহুমুর-রাসূলা লা ওয়াজাদুল্লাহা তাওয়্যাবার্ রাহীমা। ফাজি'নাকা যালিমীনা লিআন্ফুসিনা মুসতাগ্ফিরীনা মিন্ যুনূবিনা ফাশ্ফা' লানা ইলা রাব্বিনা ওয়াস্আল্হু আন্ য়ুমীতানা আলা সুন্নাতিকা ওয়াআন্ ইয়াহ্শুরানা ফী যুমরাতিকা।"

অতঃপর নিজের জন্য এবং অন্যান্য সকলের জন্য দো'আ করবেন।

অত্র গ্রন্থের সকল পাঠকের নিকট আবেদন, অধম লেখক, তার পরিবার ও বন্ধুদের সহস্র সালাম হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর পবিত্র দরবারে আদব সহকারে পৌঁছিয়ে খাতেমা বিল-খায়ের (শুভ সমাপ্তি) ও মাগফেরাতের দো'আ করে কৃতার্থ করবেন। আল্লাহ্ পাক এর দরুন আপনাদিগকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। যিয়ারত শেষে দো'আ সমাপ্ত করে আবু লুবাবার স্তম্ভের নিকটে এসে দুই রাকআত নফল নামাজ পড়ে দো'আ প্রার্থনা করবেন। অতঃপর রওযা মোবারকে এসে নফল নামায আদায় করবেন। তবে তা যেন মাকরূহ ওয়াক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। রওযা মোবারকে যত বেশী সম্ভব নামায ও দো'আ পাঠ করবেন। তারপর মিম্বরের নিকটে এসে হাত তুলে দো'আ দরূদ পাঠ করবেন। অতঃপর হান্নানার স্তম্ভ এবং অন্যান্য স্তম্ভসমূহের নিকটে এসে দো'আ ও ইস্তিগফার করবেন। সর্বদা কেবলামুখী হয়ে দোয়া করবেন।

মসজিদে নববীর ফজিলত

অধিকাংশ সময় মসজিদে নববীতে এতেকাফের নিয়তে কাটাবেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জাম'আতের সাথে মসজিদে নববীতে আদায় করবেন। তকবীরে ঊলা এবং প্রথম কাতারে শামিল হতে চেষ্টা করবেনই। মসজিদে নববীতে এক নামাযের সওয়াব বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী এক হাজারের অপেক্ষাও বেশী।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْ مَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ متفق عليه (مشكوة)

অর্থাৎ “হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন– আমার এই মসজিদে এক নামায মসজিদে হারাম ছাড়া অপরাপর মসজিদের এক হাজার নামায অপেক্ষাও উত্তম।

ইবনে মাজার এক রেওয়ায়তে পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (রাঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন– “যে ব্যক্তি আমার মসজিদে জামাআতের সাথে ৪০ নামায আদায় করবেন এবং একটি নামাযও বাদ দিবে না, তার জন্য দোযখ হতে মুক্তির ছাড়পত্র লিখে দেয়া হবে; আর আযাব ও নেফাক হতেও মুক্তি লিখে দেয়া হবে।” এজন্য মসজিদে নববীতে জামাআতে নামায পড়ার বিশেষ চেষ্টা রাখতে হবে। যদি সম্ভব হয় মসজিদে নববীতে স্বতন্ত্রভাবে এতেকাফও করবেন এবং কোরআন শরীফ খতম করবেন। সাধ্যানুযায়ী সদকা-খয়রাত করবেন। মদীনার মিসকীন, প্রতিবেশী এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন। তাদের সাথে ব্যবহারে ভালবাসা ও হৃদ্যতা বজায় রাখবেন। যদি তাদের পক্ষ হতে কোন প্রকার বাড়া-বাড়িও হয়ে যায়, তবুও ধৈর্য্যধারণ করবেন এবং ভদ্র ব্যবহার করবেন। ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ও তাদের সাহায্যের নিয়ত করবেন, তা হলেও সওয়াব পাবেন।

বিবিধ মাসআলা ঃ

১। প্রত্যহ পাঁচবার অথবা যখনই সুযোগ হয় রওযা মুবারকে উপস্থিত হয়ে সালাম পাঠ করা জায়েয।

২। যিয়ারতের সময় রওযা মোবারকের দেওয়ালসমূহ স্পর্শ অথবা চুম্বন করা অথবা জড়িয়ে ধরা না-জায়েয, বে-আদবী।

৩। রওযা মোবারকের তাওয়াফ করা হারাম। এর সম্মুখে মাথা নত করা এবং সিদজা করাও হারাম।

৪। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া রওযা মোবারকের দিকে পিঠ দিবেন না।

৫। যখনই রওযা মোবারকের সীমরেখার উপর দিয়ে অতিক্রম করবেন, তখন মসজিদের বাহিরে হলেও সুযোগ অনুযায়ী অল্প বেশি থেমে সালাম পাঠ করবেন।

৬। মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে দরূদ, সালাম, সদকা, মসজিদের বিশেষ বিশেষ স্তম্ভসমূহের নিকটে দো'আ প্রার্থনা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে করতে থাকবেন। বিশেষভাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যামানার যেসব মসজিদ রয়েছে সেগুলির প্রতি খেয়াল রাখবেন– যদিও সওয়াব সকল মসজিদেই সমান।

৭। রওযা মোবারকের দিকে তাকানোও সওয়াব। মসজিদের বাইরে থাকলে সবুজ গম্বুজের প্রতি তাকালেও সওয়াব হবে।

৮। যিয়ারতের সময় নামাযের ন্যায় হাত বাঁধা সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা কিরমানী হানাফী, মোল্লা আলী ক্বারী, আল্লামা সিন্ধী (রহঃ) প্রমুখ জায়েয বলেছেন। ইবনে হাজার মক্কী নিষেধ করেছেন। মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী

'সিআয়াহ্' নামক গ্রন্থে এতদসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ওলামায়ে কেরামের মতামত লিপিবদ্ধ করার পর জায়েয হওয়ার দিককে প্রাধান্য দিয়ে লিখেছেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যিয়ারতের সময় তো এভাবে হাত বাঁধাই উত্তম। কিন্তু অন্য লোকদের যিয়ারতের সময় বিশেষভাবে সাধারণ লোকদের কবরে এমন করা ভাল নয়।

অধম লেখকের অভিমত এই যে, যিয়ারতে নববীর সময় হাত বাঁধা অধিকাংশ বুযুর্গগণের ভাষ্য অনুযায়ী জায়েয, সুতরাং হাত বাঁধাই উত্তম। যতবেশী বিনয় ও নম্রতা এবং আদব রক্ষা করা সম্ভব তা অবশ্যই রক্ষা করবেন।

৯। হুজরা শরীফের পিছনে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মাজার যিয়ারতের জন্য যাওয়া জায়েয। কোন কোন আলেম হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কবর সেখানেই রয়েছে বলে লিখেছেন।

১০।কোন কোন অজ্ঞ লোক রওয়া মোবারকে বসে সায়হানী খেজুর ভক্ষণ করাকে সওয়াব মনে করেন এবং নিজের চুল কেটে ঝাড়বাতির মধ্যে নিক্ষেপ করেন। এছাড়াও আরো অনেক আজে-বাজে কাজ-কর্ম করে থাকেন। এই সবই ভিত্তিহীন, গর্হিত ও বে-আদবীমূলক কাজ। এসব গর্হিত কাজ হতে নিজেও বেঁচে থাকবেন এবং এইসব কাজে লিপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণকেও কোমল ভাষায় বিরত রাখার চেষ্টা করবেন।

রিয়াযুল জান্নাতে রহমতের স্তম্ভসমূহ

রিয়াযুল জান্নাত ঃ

হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন–

مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَ مِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

"আমার ঘর (বর্তমানে রওজা শরীফ) এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান।" 'রিয়াযুল জান্নাহ্' অর্থ বেহেশতের বাগান। মিম্বর মুবারক হতে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রওজা শরীফ সমেত স্থানটুকুকে রিয়াযুল জান্নাহ্ বলা হয়।

রিয়াযুল জান্নাতে প্রাচীন মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে সাতটি স্তম্ভ রয়েছে। সেগুলিকে রহমতের খুঁটি বলা হয়। এগুলির উপরে মর্মর পাথর বসানো রয়েছে এবং স্বর্ণের কারুকার্য বিদ্যমান রয়েছে। প্রথম কাতারে চারটি স্তম্ভ লাল পাথরের এবং পার্থক্য করার সুবিধার জন্য সেগুলির গায়ে নাম অঙ্কিত রয়েছে।

১। **হান্নানার স্তম্ভ ঃ** এই স্তম্ভটি সেই খেজুর গাছের খুঁটির স্থানে তৈরী হয়েছে যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিম্বর স্থানান্তর হওয়ার সময় উচ্চঃস্বরে ক্রন্দন করেছিল।

২। **হারাস বা পাহারার স্তম্ভ ঃ** যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র হুজরা শরীফে তশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন কোন না কোন সাহাবী পাহারা দেওয়ার নিমিত্ত এখানে এসে বসতেন।

৩। **উফুদ বা প্রতিনিধিবর্গের স্তম্ভ ঃ** বাহির হতে যে সকল প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য আগমন করতেন, রিয়াযুল জান্নাতের এই স্তম্ভের পাশে বসে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র হাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করতেন।

৪। **আবু লুবাবার স্তম্ভ ঃ** সাহাবী হযরত আবু লুবাবা (রাঃ) হতে মানবিক দুর্বলতাস্বরূপ তবুক যুদ্ধের সময় একটি ভুল সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। যার বিস্তারিত বর্ণনা পবিত্র কোরআনের **১১** পারায় বিদ্যমান রয়েছে। যার দরূন হযরত আবু লুবাবা (রাঃ) নিজেকে স্তম্ভের সাথে বেঁধে নিলেন এবং বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং না খুলবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সাথে বাঁধা থাকব। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও বলে দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে আদেশ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খুলব না। সুতরাং ৫০ দিনের দীর্ঘ ক্লেশজনক অপেক্ষার পর আল্লাহপাক আবু লুবাবা (রাঃ)-এর তওবা কবূল করলেন এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের পবিত্র হস্তে তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন।

৫। **সরীর বা খাটের স্তম্ভ ঃ** এখানে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতেকাফ ফরমাতেন এবং রাত্রিবেলা আরাম করার জন্য তাঁর বিছানা মোবারক এখানেই স্থাপন করা হত।

৬। **জিব্রাঈল (আঃ)-এর স্তম্ভ ঃ** এখান জিব্রাঈল (আঃ) যখনই হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)-এর আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁকে এখানেই উপবিষ্ট দেখা যেত।

৭। **হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর স্তম্ভ ঃ** হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছিলেন, আমার মসজিদের ভিতরে একটি জায়গা এমন রয়েছে যে, যদি লোকজন সেখানে নামায পড়ার ফযীলত সম্পর্কে অবগত হত, তা হলে সেখানে স্থান পাওয়ার জন্য লটারীর প্রয়োজন দেখা দিত। ঐ সময় হতে সাহাবীগণ সে জায়গাটি চিহ্নিত করবার জন্য তালাশ অব্যাহত রাখলেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর ভাগিনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-কে সেই জায়গাটি চিনিয়ে দেন। সেখানেই বর্তমানে এই স্তম্ভটি রয়েছে। উপরোক্ত স্তম্ভসমূহের নিকটে গিয়ে দো'আ প্রার্থনা করবেন।

তারপর নিজের থাকার জায়গায় চলে আসবেন এবং যতদিন ইচ্ছা মদীনায় অবস্থান করবেন। এই অবস্থানকে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করবেন।

মদীনা শরীফে দোয়া কবুল ও জিয়ারতের স্থান

নং	স্থান	নং	স্থান
০১	প্রাণের নবীজীর রওজা পাকের নিকট	০২	হান্নানা স্তম্ভ, মসজিদে নববী
০৩	হারস স্তম্ভ, মসজিদে নববী	০৪	উফুদ স্তম্ভ, মসজিদে নববী
০৫	আবু লুবাবা স্তম্ভ, মসজিদে নববী	০৬	সারীর স্তম্ভ, মসজিদে নববী
০৭	হযরত জিব্রাঈল স্তম্ভ, মসজিদে নববী	০৮	হযরত আয়েশা স্তম্ভ, মসজিদে নববী
০৯	জান্নাতুল বাকী	১০	মসজিদে কোবা
১১	মসজিদে জুম’আ	১২	মসজিদে গামামা
১৩	মসজিদে সুকইয়্যা	১৪	মসজিদে ফাতাহ
১৫	মসজিদে যুবাবত	১৬	মসজিদে কেবলাতাইন
১৭	মসজিদে ফাযীহত	১৮	মসজিদে বনী কুবায়যা
১৯	মসজিদে বনী যাফর	২০	মসজিদে ইজাবাহদ
২১	মসজিদে সাজদা	২২	মসজিদে উবাই
২৩	মসজিদে বনী হারাম	২৪	মসজিদে আবু বকর
২৫	মসজিদে আলী	২৬	মসজিদে উম্মে ইব্রাহীম
২৭	বীরে উসমান	২৮	বীরে আরীস

আল-মদীনার মসজিদ সমূহের যিয়ারত

মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববী ছাড়াও শহরের আশে-পাশে বহু মসজিদ রয়েছে। তন্মধ্যে যেসব মসজিদে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা তাঁর সাহাবীগণ নামায পড়েছেন সেগুলির যিয়ারত করাও মুস্তাহাব। এদের বেশ কয়টি এখনও আবাদ রয়েছে এবং অনেকগুলি বিধ্বস্ত ও অনাবাদী অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যমানার নির্মাণরীতির উপরে এখন কোন মসজিদই বর্তমানে নেই। বরং পরে এদের অনেকবার নবায়ন করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু জায়গা এটাই– এই জন্য বরকত ও রহমতের নিদর্শন হতে খালি নয়। সংক্ষিপ্তভাবে পাঠকের উপকারের উদ্দেশ্যে নিম্নে প্রসিদ্ধ মসজিদসমূহের বর্ণনা প্রদান করা হল–

মসজিদে কোবা ঃ

এটা মদীনা মুনাওয়ারার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মসজিদে নববী হতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এটা মুসলমানদের সর্বপ্রথম মসজিদ। যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা মুকাররামা হতে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তশরীফ

আনয়ন করেন এবং বনী আউফ গোত্রে অবস্থান করেন, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে নিজের পবিত্র হাতে এই মসজিদ তৈরী করেছিলেন। এটা মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসার পর সমস্ত মসজিদ হতে উত্তম। হযরত রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায়ই মদীনা মুনাওয়ারা হতে মসজিদে কোবায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। যেদিন ইচ্ছা পদব্রজে অথবা সওয়ারীযোগে মসজিদে কোবার যিয়ারত করবেন। তবে শনিবারেই উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ صَلٰوةَ رَكْعَتَيْنِ فِيْهِ كَعُمْرَةٍ

অর্থাৎ "মসজিদে কোবায় দুই রাকআত নামাযের সওয়াব উমরার সওয়াবের মত।"

মসজিদে জুমআ ঃ

এটা কোবার নতুন রাস্তা হতে পূর্ব দিকে যানুনা উপত্যকায় 'বুস্তানুল জাযাঅ'-এর নিকট অবস্থিত। এখানে তখন বনী সুলাইম গোত্রের লোকেদের আবাদ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জুমআর নামায এই মসজিদে আদায় করেছিলেন।

মসজিদে মুসাল্লা অথবা মসজিদে গামামা ঃ

এটা মানাখার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই ঈদের নামায আদায় করতেন।

মসজিদে সুকইয়্যা ঃ

বাবে আম্বরিয়ার নিকটে রেল-ষ্টেশনের ভিতরে একটি গুম্বজ রয়েছে। একে 'কুব্বাতুর রউস' বলা হয়। এখানে একটি কূপ রয়েছে। একে 'বীরুস সুকইয়্যা' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাযওয়া-এ-বদরে গমনকালে এখানে নামায আদায় করেছিলেন এবং মদীনাবাসীদের জন্য বরকতের দো'আ করেছিলেন।

মসজিদে আহ্যাব বা মসজিদে ফাতাহ্ ঃ

এটা সিলা'অ পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। গাযওয়া-এ-আহযাবের সময় অর্থাৎ যখন আরবের সমস্ত কাফের গোত্র সম্মিলিতভাবে মদীনা মুনাওয়ারা আক্রমণ করতে এসেছিল এবং খন্দক খনন হয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে তিন দিন– সোম, মঙ্গল ও বুধ বার দো'আ করেছিলেন। আল্লাহ্পাক তাঁর দো'আ কবুল করেন এবং মুসলমানগণ বিজয়ী হন।

মসজিদে যুবাব ঃ

উহুদ পাহাড়ের রাস্তায় 'সানিয়্যাতুল বিদা' হতে অবতরণ করে রাস্তার বাম পাশে জাবালে যুবাবের ওপরে এই মসজিদটি অবস্থিত। খন্দকের যুদ্ধে এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাঁবু টানানো হয়েছিল এবং তিনি এই জায়গায় নামায আদায় করেছিলেন।

মসজিদে কেবলাতাইন ঃ

এটা মদীনা মুনাওয়ারার উত্তর-পশ্চিমে আকীফ উপত্যকার নিকটবর্তী এক টিলার উপর অবস্থিত। এতে একটি মিহরাব বায়তুল মুকাদ্দাস-মুখী এবং অন্যটি কা'বামুখী নির্মিত রয়েছে। কেবলা পবির্তনের ঘটনাটি এই মসজিদে সংঘটিত হওয়ায় একে মসজিদে কেবলাতাইন, (দুই কেবলার মসজিদ) বলা হয়। (কেউ কেউ বলেন, কেবলা পবির্তনের ঘটনা মসজিদে কোবায় সংঘটিত হয়েছিল।)

মসজিদুল ফাযীহ্ ঃ

ইহা আওয়ালিয়ে মদীনার উত্তর দিকে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে ইহুদি গোত্র বনী নাযীরের অবরোধের সময় নামায আদায় করেছিলেন। খেজুরের মদকে ফাযীহ্ বলা হয়। হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) একদল লোকের সাথে মদ্যপানে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মদ্য হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাঁরা তা অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মদের সকল মটকা ও কলসী ভেঙ্গে ফেলেন। এজন্য একে 'মসজিদে ফাযীহ্' বলা হয়। এই মসজিদের আরেক নাম 'মসজিদে শামস্'। যেহেতু এটা উঁচুতে অবস্থিত এবং অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানেই সূর্যোদয় প্রথমে চোখে পড়ে, তাই একে মসজিদে শামস্ও বলা হয়।

মসজিদে বনী কুরায়যা ঃ

এটা মসজিদে ফাযীহ হতে সামান্য উত্তরে অবস্থিত। ইহুদি গোত্র বনী কুরায়যার অবরোধের সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই জায়গায় অবস্থান করেছিলেন এবং ইহুদীরা হযরত সা'দ ইবনে মায়ায (রাঃ)-কে বিচারক মনোনীত করেছিল। হযরত সা'দ ইবনে মায়ায (রাঃ) এখানেই ইহুদি পুরুষদেরকে হত্যা এবং শিশু ও মহিলাদেরকে বন্দী করার ফায়সালা শুনিয়েছিলেন।

মসজিদে বনী যাফর বা মসজিদুল বাগলাহ্ ঃ

এটা বাকী' হতে উত্তর দিকে হুররায়ে ওয়াকিমের প্রান্তে অবস্থিত। বনী যাফর গোত্র এখানে বসবাস করত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হন এবং জনৈক সাহাবীকে কোরআন পাঠ করার নির্দেশ দেন।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

অনুবাদ ঃ "অনন্তর কাফেরদের অবস্থা তখন কেমন হবে, যখন আমি (আল্লাহ্) প্রত্যেক উম্মত হতে একজন করে স্বাক্ষী অর্থাৎ, তাদের নবীকে ডেকে পাঠাব এবং তাদের অর্থাৎ, অন্যান্য সমস্ত নবীগণের উপরে আপনাকে স্বাক্ষীস্বরূপ আনয়ন করব"– এই আয়াত পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। দাঁড়ি মোবারক নড়াচড়া করতে থাকে এবং তিনি কেঁদে বলে উঠেন, "ইয়া আল্লাহ্! যেসব লোক আমার সম্মুখে রয়েছে, তাদের উপর তো আমি স্বাক্ষী হতে পারব, কিন্তু যাদেরকে কোনদিন দেখিনি তাদের উপরে কেমন করে স্বাক্ষী হব?" এই মসজিদের নিকটে একটি পাথরের উপরে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খচ্চরের ক্ষুরের চিহ্ন রয়েছে। এইজন্য উহাকে 'মসজিদে বাগলাহ্'ও বলা হয়।

মসজিদুল ইজাবাহ্ ঃ

এটা বাকী' হতে উত্তর দিকে 'বুস্তানে সাম্মান'-এর নিকটে অবস্থিত। এখানে বনি মুয়াবিয়া ইবনে মালিক ইবনে আউফ'গণ বসবাস করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এখানে তশরীফ আনয়ন করেন এবং নামায আদায় করার পর দীর্ঘক্ষণ দো'আয় লিপ্ত থাকেন। অতঃপর বলেন, আমি আমার রব সমীপে তিনটি আবেদন করেছি। এক ঃ আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করা না হয়। দুই ঃ আমার উম্মতকে যেন পাইকারীভাবে পানিতে নিমজ্জিত করে হালাক করা না হয়। এই দুইটি দো'আ মঞ্জুর হয়েছে। তৃতীয় ঃ তাদের মধ্যে যেন পারস্পরিক বিরোধ ও গৃহযুদ্ধ না হয়। এটা মঞ্জুর হয়নি।

মসজিদে সজদা বা মসজিদুল বাহীর ঃ

এটা 'বুস্তানে বাহীরী' এবং সদকার বাগানসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে দুই রাকআত নামায আদায় করেছিলেন এবং খুব দীর্ঘ করেছিলেন।

মসজিদে উবাই ঃ

এটা বাকী'র সন্নিকটে অবস্থিত। এখানে হযরত উবাই ইবনে কা'বের বাড়ী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই এখানে গমন করতেন এবং নামায আদায় করতেন।

মসজিদে বনী হারাম ঃ

এটা 'মসজিদে ফাতাহ্'-এর দিকে যাওয়ার পথে 'সিলা' পর্বতের উপত্যকার ডান দিকে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেও নামায আদায় করেছেন। এর নিকটে একটি গুহা রয়েছে। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে

ওহী অবতীর্ণ হয়েছে এবং গাযওয়া-এ-খন্দকের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে সেখানে আরাম ফরমান। এ গুহারও যিয়ারত করা উচিত।

মসজিদে আবু বকর ঃ

এটা মসজিদে মুসাল্লার নিকট উত্তর দিকে অবস্থিত।

মসজিদে আলী ঃ

এটাও মসজিদে মুসাল্লার নিকটে অবস্থিত।

মসজিদে উম্মে ইবরাহীম ইবনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঃ

এটা আওয়ালিয়ে মদীনায় মসজিদে বনী কুরায়যা হতে উত্তর দিক অবস্থিত। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রাঃ)-এর জন্মস্থান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেও নামায আদায় করেছেন।

আল-মদীনার কূপ সমুহ

মদীনা মুনাওয়ারায় বর্তমানে ২৪টি খাল বা নালা রয়েছে। কিন্তু পূর্বে এইসব খাল-নালা ছিল না। তখন মদীনাবাসীগণ কূপের পানি পান করতেন। এদের কোন কোনটির পানি ছিল মিষ্ট, আবার কোন কোনটির লবণাক্ত। যেসব কূপ হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করেছেন এবং অযু করেছেন, সেগুলি যিয়ারত করা এবং তাবাররুক হিসাবে সে পানি পান করা উচিত। পূর্বে এই ধরণের বহু কূপ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সবগুলির অস্তিত্ব নেই। কাহারও কাহারও মতে ১৭ট কূপ ছিল। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টিই প্রসিদ্ধ–

বীরে আরীস ঃ

এটা মসজিদে কোবার সন্নিকটে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এর নীচের অংশে দুইটি নালা-মুখ খোলা ছিল। যা দিয়ে পাহাড়ী ঝর্ণার পানি আগমন করত। তৃতীয় মুখটি ছিল 'নাহরে যারক' এর– যা কূপের মধ্যে পতিত হয়ে সামনের দিকে চলে গিয়েছিল। এর পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও মিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তশরীফ আনয়ন করে এতে পা ঝুলিয়ে পাড়ের উপর বসে পড়লেন। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) তশরীফ আনলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুকরণে এমনিভাবে বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পানি পান করলেন এবং এর দ্বারা অযু করলেন; আর থুথু মোবারকও উক্ত কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন। এই কূপকে 'বীরে খাতম'ও বলা হয়। কেননা, এতে খাতমে নবুওয়ত অর্থাৎ, নুবুওয়তের অঙ্গুরীয়টি হযরত উসমান (রাঃ)-এর হাত হতে পড়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক তালাশ করিয়েছিলেন, কিন্তু পাওয়া যায়নি। বর্তমানে এই কূপটি শুকিয়ে গিয়েছে এবং বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

বীরে গারাস ঃ

এটা 'কুরবান' নামক স্থানে মসজিদে কোবা হতে প্রায় চার ফার্লং দূরে উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর পানি দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করেছেন এবং পানও করেছেন। আর পবিত্র থুথু এবং মধুও এতে ঢেলেছেন।

বীরে বুদাআহ ঃ

এটা শামী দরজা দিয়ে বের হয়ে দরজার নিকটবর্তী 'বাগে জামালুল-লাইন' নামক স্থানে অবস্থিত। এর মধ্যেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর থুথু মোবারক নিক্ষেপ করেছিলেন এবং বরকতের দো'আ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় কারও অসুখ হলে লোকজন তাকে এই কূপের পানি দ্বারা গোসল করাত। আল্লাহর অনুগ্রহে সে আরোগ্য লাভ করত।

বীরে বুস্‌সা ঃ

এটা কোবার পথে বাকী'র সন্নিকটে অবস্থিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু সাঈদ খুদরীর নিকট গমন করেছিলেন এবং এই কূপে নিজের পবিত্র মস্তক ধৌত করেছিলেন এবং গোসল করেছিলেন। সেখানে দুইটি কূপ রয়েছে। একটি ছোট এবং অন্যটি বড়। এতদ্‌সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যে, বীরে বুস্‌সা কোনটি। বিশুদ্ধ মতে বড়টিই বীরে বুস্‌সা। তবে উভয় কূপ হতেই তাবাররুক হাসিল করা উত্তম।

বীরে হা-অ ঃ

এটা বাবে মজিদীর সামনে উত্তর প্রাচীরের বাইরে অবস্থিত। এটা হযরত আবু তালহা (রাঃ)-এর বাগান ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই সেখানে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং এর পানি পান করতেন। যখন–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

অর্থাৎ "তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বাধিক প্রিয় বস্তু হতে আল্লাহর রাস্তায় দান না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে না," আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন হযরত আবু তালহা (রাঃ) দরবারে রিসালাতে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমনপূর্বক নিবেদন করলেন– ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বীরে হা'অ-ই আমার সবচাইতে প্রিয় বস্তু। সুতরাং এটা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সদকা করে দিলাম। আপনি যেখানে ইচ্ছা তা ব্যয় করতে পারবেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরামর্শ দিলেন, এটা নিজের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ওয়াকফ্ করে দাও। কূপটি বর্গাকৃতবিশিষ্ট। বর্তমানে সেখানে বাগান নেই। শুধুমাত্র খেজুরের দুইটি গাছ দন্ডায়মান রয়েছে। এই কূপটি বর্তমানে একটি বাড়ীর আঙ্গিনায় পড়ে গিয়েছে। যার পাশে কিছু খালি জমি পড়ে রয়েছে।

বীরে আ'হন ঃ

এটা আওয়ালিয়ে মদীনায় মসজিদে কোবা হতে পূর্বদিকে 'মসজিদে শামস'-এর নিকটে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা হতেও অযু করেছেন। বর্তমানে এর পানি লবণাক্ত। একে 'বীরুল ইয়াসীরাহ্'ও বলা হয়।

বীরে রুমাহ্ ঃ

এটা মদীনা মুনাওয়ারার উত্তর-পশ্চিম দিকে আকীক উপত্যকার প্রান্তদেশে জঙ্গলের মধ্যে মদীনা মুনাওয়ারা হতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এটা পূর্বে জনৈক ইহুদীর মালিকানাধীন ছিল। এর পানি ছিল খুব স্বচ্ছ ও মিষ্ট। সেই ইহুদী উক্ত কূপের পানি বিক্রয় করত। তখন মুসলমানদের দারুণ পানির কষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কূপের অর্ধেকাংশ নিজের মাল হতে ১২ হাজার দিরহাম দ্বারা ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন এবং ইহুদীকে বললেন– তুমি যদি বল তা হলে আমি আমার অর্ধেকাংশকে বেড়া দিয়ে দিব অথবা বার নির্দিষ্ট করে দিব ইহুদি বলল, বার নির্দিষ্ট করাই ভাল; একদিন আপনার জন্য এবং একদিন আমার জন্য। কিন্তু যখন ইহুদি লোকটি দেখল যে, মুসলমানগণ একদিনে দুই দিনের পানি তুলে নেন এবং তার পানি বিক্রয় হয় না, তখন পেরেশান হয়ে হযরত উসমান (রাঃ)-কে বাকী অর্ধাংশ ক্রয় করে নেয়ার জন্য অনুরোধ করে। সুতরাং হযরত উসমান (রাঃ) আট হাজার দিরহামের বিনিময়ে বাকীটুকুও ক্রয় করে নেন এবং তা ওয়াক্ফ করে দেন। উপরোক্ত সাতটি কূপই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এগুলিকে 'আবয়ারে সাবআহ্' বলা হয়। এছাড়াও আরো কূপ রয়েছে– যেগুলির পানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন। যেমন– ৮) বীরে আনা, ৯) বীরে আওয়াফ, ১০) বীরে আনাস, ১১) বীরুল হাযারম, ১২) বীরুস-সুকইয়া, ১৩) বীরে আবি আইয়্যূব, ১৪) বীরে উরওয়াহ্, ১৫) বীরে যারদান (যন্মধ্যে ইহুদী লুবাইদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে যাদু করে চুল চিরুনিতে বেঁধে দাফন করেছিল), ১৬) বীরুল কাওয়ীম, ১৭) বীরুস সুফইয়া, ১৮) বীরে বাউঈতাহ্ এবং ১৯) বীরে ফাতেমা।

শোহাদায়ে উহুদের যিয়ারত

জনাব রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন– "উহুদ আমাকে ভালবাসে এবং আমি উহুদকে ভালবাসি। রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "তোমরা যখন উহুদ পর্বতে আস, এর বৃক্ষ থেকে ফলমূল খাও– যদিও কাঁটাযুক্ত বৃক্ষই হোক।" হিজরী তৃতীয় সালে উহুদ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাজান হযরত হামজা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ), হযরত মাছআব বিন ওমাইর (রাঃ), হযরত হানজালাহ (রাঃ), হযরত আবু দাজানা (রাঃ) এবং অন্যান্য মোট ৭০ (সত্তর) জন ছাহাবী শহীদ হয়েছেন। তাঁদের মাযারগুলো এখানে অবস্থিত। সেখানে গিয়েও এভাবে সালাম পেশ করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
عَمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ نَبِيِّ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ
حَبِيْبِ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ الْمُصْطَفٰى، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ
الشُّهَدَاءِ، وَيَا اَسَدَ اللّٰهِ، وَيَا اَسَدَ رَسُوْلِهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ،
يَا سُعَدَاءُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اَلسَّلَامُ
عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَاءَ اُحُدٍ كَافَّةً عَامَّةً وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ .

অর্থ ঃ সালাম হে আমাদের সরদার হযরত হামজা (রাঃ), সালাম হে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাজান, সালাম হে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাজান (রাঃ), সালাম হে আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাজান, সালাম হে শহীদদের সরদার (রাঃ)। সালাম হে আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ), সালাম হে মাছআব বিন ওমাইর (রাঃ), সালাম আপনাদের সকলের উপর যারা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আপনাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক।

যিয়ারতে হযরত ফাতিমা (রাঃ)

হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর মাযার শরীফ কোথায় অবস্থিত, সে সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম ঃ তাঁর মাযার শরীফ মসজিদে নববীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আশ-পাশে রয়েছে। দ্বিতীয় ঃ হযরত আব্বাস (রাঃ) এর পাশে তাঁর মাযার অবস্থিত। তৃতীয় ঃ 'জান্নাতুল বাকী' এর দরজার নিকটে রয়েছে। সে কারণে হাজী সাহেবদের উচিত তিনটি স্থানেই হাজির হয়ে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করা–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا سَيِّدَتَنَا فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ، يَابِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكِ يَا بِنْتَ نَبِيِّ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ حَبِيْبِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ
يَابِنْتَ الْمُصْطَفٰى اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا خَامِسَةَ اَهْلِ الْكِسَاءِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ
يَا زَوْجَةَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا عَلِيِّ الْمُرْتَضٰى كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكِ يَا اُمَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ السَّيِّدَيْنِ الشَّهِيْدَيْنِ الْكَوْكَبَيْنِ
الْمُقَرَّبَيْنِ النَّيِّرَيْنِ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِى الْجَنَّةِ اَبِى مُحَمَّدِنِ
الْحَسَنِ وَاَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا وَعَنْكِ
وَاَرْضَاكِ اَحْسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكِ وَمَسْكَنَكِ وَمَحَلَّكِ وَمَاْوَاكِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ وَعَلٰى اَبِيْكِ الْمُصْطَفٰى وَبَعْلِكِ عَلِيِّ الْمُرْتَضٰى وَابْنَيْكِ
الْحَسَنَيْنِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ .

"আসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যেদাতানা ফাত্বিমাতু য্যাহরাই ইয়া বিনতা রাসূলুল্লাহি, আসসালামু আলাইকে ইয়া বিনতা নাবিয়্যাল্লাহি, আসসালামু আলাইকে ইয়া বিনতা হাবীবাল্লাহি, আসসালামু আলাইকে ইয়া বিনতাল মুসত্বফা, আসসালামু আলাইকে ইয়া খমিসাতা আহলিল কাসাই, আসসালামু আলাইকে ইয়া যাওজাতা আমীরিল মু'মিনীনা সাইয়্যেদিনা আলিয়্যিল মুরতাদ্বা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, আসসালামু আলাইকে ইয়া উম্মাল হাসানি ওয়াল হুসাইনিস সাইয়্যিদাইনিশ শাহিদাইনিল কাওকাবাইনিল মুক্বাররাবাইনিন্ নিইরাইনি সাইয়্যেদা শাবাবি আহলিল জান্নাতি ফিল জান্নাতি আবি মুহাম্মাদানিল হাসানি ওয়া আবি আবদিল্লাহিল হুসাইনি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা ওয়া আনকা ওয়া আরদ্বাকা আহসানার রিদ্বা ওয়া জায়ালাল জান্নাতা মানযিলাকা ওয়া মাসকানাকা ওয়া মাহাল্লাকা ওয়া মা'ওয়াকা আসসালামু আলাইকে ওয়া আলা আবিকিল মুসত্বফা ওয়া বা'লাকে আলিয়্যাল মুরত্বাদ্বা ওয়াব নাইকাল হাসনাইনি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।"

অর্থ ঃ "হে সাইয়্যেদা ফাতেমা-তুয্-যোহরা (রাঃ), আপনার প্রতি সালাম, সালাম হে রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের দুলালী। সালাম, হে হাবীবুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটি, সালাম হে আল্লাহর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহেবজাদী। সালাম হে আমিরুল মু'মেনীন আলী (রাঃ)-এর জীবনসঙ্গীনী। সালাম হে হযরত হাসান (রাঃ) ও হোসাইন (রাঃ)-এর জননী– যারা হলেন জান্নাতের যুবকদের সর্দার। আল্লাহ আপনার উপর উত্তমরূপে সন্তুষ্ট হোন এবং জান্নাতের উঁচুস্তরে আপনার অবস্থান হোক। আপনার প্রতি সালাম, আপনার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম। সালাম আপনার সম্মানিত স্বামী হযরত আলী (রাঃ) এর প্রতি, সালাম আপনার ছাহেবজাদা হযরত হাসান (রাঃ) ও হোসাইন (রাঃ) এর প্রতি। তাঁদের সকলের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত নাজিল হোক।

জান্নাতুল বাকীর নক্‌শা
মদীনা শরীফ

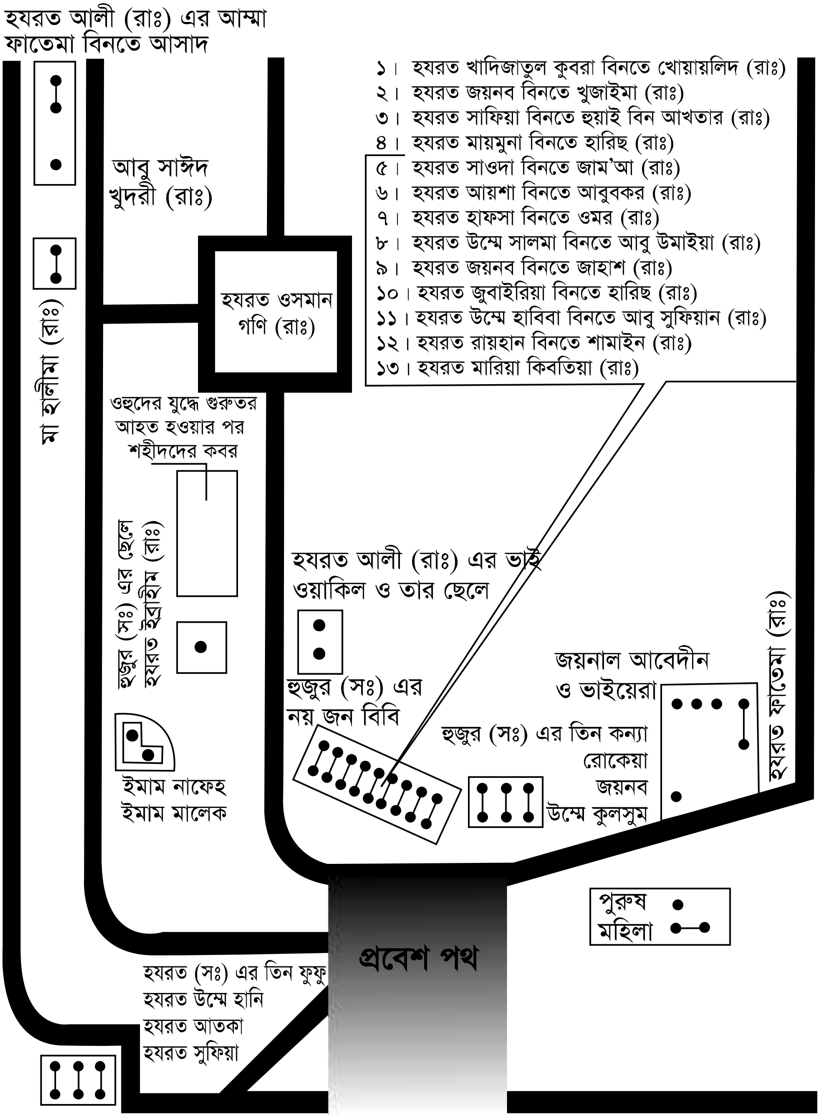

আহ্‌লে জান্নাতুল বাকীদের যিয়ারত

"বাকী" হচ্ছে মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান। এটি মদীনার সন্নিকটে উত্তর দিকে অবস্থিত। এ কবরস্থানে অসংখ্য সাহাবী এবং আওলিয়াগণের সমাধি রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এর যিয়ারতের পর আহলে বাকী-এর যিয়ারতও প্রাত্যহিক বিশেষ করে শুক্রবারে মুস্তাহাব। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গণী (রাঃ) ও জান্নাতুল বাকী' এর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সমাহিত আয্‌ওয়াজে মুতাহ্‌হারাত (হযরত খাদিজা ও মায়মূনা [রাঃ] ব্যতীত), হযরত ইবরাহীম ইবনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ), রুকাইয়্যাহ বিনতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ফাতেমা বিনতে আসাদ (হযরত আলী [রাঃ]-এর জননী), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), আসাদ ইবনে যাঁররাহ (রাঃ) প্রমুখ এ কবরস্থানেই সমাহিত রয়েছেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)ও এখানে সমাহিত। তাঁর বংশধরদের মধ্যে হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) এখানে সমাহিত আছেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মাযার সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মসজিদে নববীতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওযার পেছনে তাঁর হুযরার মধ্যে সমাহিত। কারও মতে দারুল আহযানে তাঁর মসজিদে সমাহিত। কারোও কারোও মতে হযরত আব্বাস (রাঃ) এর নিকটে সমাহিত। সকলের ওপরেই সালাম পাঠ করবেন। মালেকী মাযহাবের ইমাম মালেক (রহঃ) এবং অন্যান্য তাবেয়ীনগণও এখানে সমাহীত রয়েছেন।

"বাকী"তে সর্বাগ্রে কার মোকাম (কবর) যিয়ারত করতে হবে সে সম্পর্কে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রথমে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রাঃ) এর যিয়ারত করতে হবে। কেননা, এখানে যত লোক সমাহিত রয়েছেন তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম। কেউ কেউ বলেন, প্রথমে হযরত আব্বাস (রাঃ) দ্বারা শুরু করতে হবে। কেননা, তাঁর মাযারই শুরুতে রয়েছে। তাঁর নিকট দিয়ে বিনা সালামে অতিক্রম করা ঠিক নয়, কেননা তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মানিত পিতৃব্য। তারপর যার মাযার প্রথমে পড়বে তার উপর সালাম পাঠ করবেন এবং হযরত সাফিয়্যাহ্ (রাঃ)-এর মাযারে এসে যিয়ারত সমাপ্ত করবেন। এতে যিয়ারতকারীদের সুবিধা রয়েছে। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, সম্মানের দিক দিয়েও এ ব্যবস্থাই সঠিক। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর পিতা হযরত মালেক ইবনে সিনান (রাঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় শহরের ভেতরে সমাহিত আছেন। তাঁর মাযারও যিয়ারত করবেন। নাফসে যাকিয়্যা হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে আলী (রাঃ) শহরের নিকটে শামী দরজার দিকে সমাহিত রয়েছেন। তাঁরও যিয়ারত করবেন। হযরত ইসমাঈল ইবনে জা'ফর সাদিক (রাঃ) এর মাযার

নগর প্রাচীরের ভেতরে অবস্থিত। জান্নাতুল বাকী’ হতে ফেরার সময় তাঁরও যিয়ারত করবেন। জান্নাতুল বাকী’তে প্রবেশ করে পড়বেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ الْبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

“আস্‌সালামু আলাইকুম দারা ক্বাওমিম্ মু’মিনীনা ফাইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লাহিকুনা আল্লাহুম্মাগফিরলি আহলিল বাকী’ইল গারক্বাদি আল্লাহুম্মাগফিরলানা ওয়ালাহুম।”

অতঃপর যেসব লোকের মাযারের চিহ্ন জানা আছে তাদের যিয়ারত করবেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর উপরে এভাবে সালাম পাঠ করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ذَاالنُّوْرَيْنِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُجَهِّزَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ بِالنَّقْدِ وَالْعَيْنِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْهِجْرَتَيْنِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَامِعَ الْقُرْاٰنِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَبُوْرًا عَلَى الْاَكْدَارِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيْدَ الدَّارِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

“আসসালামু আলাইকা ইয়া ইমামাল মুসলিমীনা আসসালামু আলাইকা ইয়া ছালিছাল খুলাইফাইর রাশিদীনা আসসালামু আলইকা ইয়া জান-নুরাইন। আসসালামু আলাইকা ইয়া মুজাহহিযা জাইশিল উসরাতি বিন্নাক্বদি ওয়াল আইনি। আসসালামু আলাইকা ইয়া সহিবাল হিজরাতাইনি আসসালামু আলাইকা ইয়া জামিয়াল কোরআনি বাইনাদ দুফফাতাইনি। আসসালামু আলাইকা ইয়া সবুরান আলাল আকদারি। আসসালামু আলাইকা ইয়া শাহীদাদ্দারী। আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়অ বারাকাতাহু।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

“হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)”

আল্লাহ প্রেম ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেম-ই ঈমানের মূল। আল্লাহ্ প্রেমের সাথে নবী প্রেম ও পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ বলেন–

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

“নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকৃত ঈমানদারদের নিকট তাদের নিজ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এবং তাঁর (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীগণ তাদের (ঈমানদারদের) মাতা।”– কোরআন (৩৩ঃ৬)।

হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান– প্রত্যেক মুমিনের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে আমি সর্বাপেক্ষা উত্তম।– বোখারী ও মুসলিম)। আল্লাহ্ বলেন –

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।”– কোরআন (৪৯ঃ১০)

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন– সমস্ত নবী আপন আপন উম্মতের জন্য পিতা। যেহেতু তারা আপন নবীরই রূহানী বা দ্বীনি সন্তান। একারণেই মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। উপরের আয়াতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীগণকে যখন মাতা বলা হয়েছে তখন তিনি পিতা হওয়াই স্বাভাবিক। “আওলা” শব্দ উল্লেখ হয়েছে যার অর্থ অধিক নিকটে, অধিক হক্দার। মানুষ সবচেয়ে বেশী ভালবাসে নিজ প্রাণকে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রাণাধিক ভালবাসা মুমিন হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত। প্রাণের নবীজী আমাদের রূহানী পিতা।

আমরা দাবীদার যে, আমরা জীবিত। পিতা জীবিত আর পুত্রও জীবিত, পিতা-পুত্র দু’জনের দেখা সাক্ষাৎ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। **ভেবে দেখুন, কতবার নবীজীর যিয়ারত পেয়েছেন?**

হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তিরোধানের পর তাঁর শরীর মুবারক মদীনাস্থ রওজাপাকে অক্ষত অবস্থায় আছে। আল্লাহ্পাকের প্রদত্ত শক্তি বলে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আকৃতি ধারণ করতঃ পৃথিবী, আকাশ ও পাতালের যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারেন এবং বর্তমানেও করতেছেন। আল্লাহ্তা’য়ালা বলেন–

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ

“আল্লাহর আয়াত তোমাদের নিকট পঠিত হয় এবং এখনও তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল আছেন, তা সত্ত্বেও তোমরা কিরূপে কুফরী করছ?”– কোরআন (৩ঃ১০১)।

আল্লাহ্ বলেন–

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ

"তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল রয়েছেন।"– কোরআন (৪৯ঃ৭)।

আল্লাহ্ বলেন–

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

"যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে তখন তারা যদি আপনার নিকট আসত এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তা হলে তারা আল্লাহ্কে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পেত।"– (৪ঃ৬৪)

আল্লাহ্ বলেন–

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ

"আমি কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মতের জন্য স্বাক্ষী স্বরূপ তাদের মধ্য হতে একজনকে (তাহাদের নবীকে) দাঁড় করাব এবং হে নবী, আপনাকে এদের সকলের কার্যকলাপের স্বাক্ষ্যদাতারূপে আনয়ন করব।"– কোরআন (১৬ঃ৮৯)

আল্লাহ্ বলেন–

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

"ওহে নবী, আমি আপনাকে (সমস্ত বিশ্বমানবের জন্য) স্বাক্ষী, (ঈমানদারদের জন্য) সুসংবাদদাতা এবং (কাফিরদের জন্য) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।"– কোরআন (৪৮ঃ৮)

উল্লেখিত আয়াত অনুযায়ী বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাইয়াতুন্নবী (জীবিত নবী), তিনি আমাদের মধ্যে সবসময় অদৃশ্যভাবে আছেন, তাঁর জীবদ্দশায় কেউ পাপ করে তাঁর নিকট এসে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হলে তিনি যেমন তার জন্য সুপারিশ করতেন, তাঁর ইন্তিকালের পরেও অনুরূপভাবে পাপীগণ তাঁর রওজাপাকের নিকট এসে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হলে আর তিনিও তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহকে ক্ষমাকারী, দয়াবান হিসাবে পাবেন। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে মানব জাতির জন্য শাহেদ (স্বাক্ষ্যদাতা) এটা উল্লেখিত আয়াত ছাড়া ও ৩৩ঃ৪৫, ৭৩ঃ১৫, ২ঃ১৪৩, ৪ঃ৪১ ইত্যাদি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আল্লাহপাকের সৃষ্টির প্রথম হতে যত মানুষ পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং বর্তমানে আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যতে যত মানুষ

আসবেন তাদের সকলেরই কার্যকলাপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, করছেন ও করবেন এবং সকলেরই স্বাক্ষ্যদাতারূপে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। স্বাক্ষ্যদাতার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা ও ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শন একান্ত আবশ্যক। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সময় ও স্থান (Time and Space)-এর সংকীর্ণতার গন্ডির ঊর্ধ্বে থেকে আল্লাহপাক স্বয়ং যেরূপ সর্বকালে সর্বক্ষণ সর্বত্র উপস্থিত থাকতে এবং সবকিছু দর্শন ও শ্রবণ করতে সক্ষম, সেরূপ সর্বকালে সর্বক্ষণ সর্বত্র উপস্থিত থাকার, সবকিছু দর্শন ও শ্রবণ করার ক্ষমতা তিনি হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রদান করেছেন, তা না হলে কিয়ামত দিবসে তিনি সৃষ্টির আদি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের সর্বপ্রকার কার্যকলাপের স্বাক্ষ্যদাতা কিছুতেই হতে পারেন না।

আল্লাহ্তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হন তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত, হ্যাঁ, যদিও তোমরা তা বুঝনা।"– কোরআন (২ঃ১৫৪)।

আল্লাহ্ বলেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, কখনো তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করো না, বরং তারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছেন, জীবিকা পেয়ে থাকেন।"– কোরআন (৩ঃ১৬৯)।

উক্ত আয়াতে কারীমার আলোকে বুঝা যায়, শহীদগণ জীবিত এবং মহা প্রভুর নিকট থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। নবীগণ আর শহীদগণ মর্যাদায় কি সমান? নিশ্চয়ই না। সূরা নিছার ৬৯ নং আয়াতে নেয়ামত প্রাপ্ত বান্দাদের বর্ণনায় আল্লাহ্ নবীগণকে প্রথম আর শহীদগণকে তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তাই সাইয়্যেদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হায়াতুন্নবী, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

আল্লাহ্তা'য়ালা বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"আমি আপনাকে বিশ্ব ব্রম্মান্ডের রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।" এই 'রহমত' সর্বকালীন যা কোন স্থান ও কালের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। এই 'রহমত'ব্যতীত বিশ্ব সৃষ্টি এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং 'রহমতে'র আধার রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বকালে, সর্বস্থানে, সর্বক্ষণ বিরাজমান কিয়ামত পর্যন্ত ও কিয়ামতের পরও। তাই তিনি "হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম)”, প্রেমিকের সালামের জওয়াব দেন এবং প্রেমিক তা শ্রবণ করেন। সৃষ্টি জগত ও বিশ্ব ব্রহ্মান্ড আল্লাহ্‌র রহমতের বিকাশস্থল, আর সেই রহমতের মাধ্যম হলেন প্রাণের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

১। তিনি আছেন, তাই রহমত আছে, সৃষ্টি জগত ও বিশ্ব ব্রহ্মান্ড আছে।

২। “নবীদের শরীর ফেরেশতাদের শরীরের ন্যায় গঠিত।”– কাঞ্জুল উম্মাল

৩। “আল্লাহ নবীগণের শরীর ভক্ষণ (নষ্ট) করা মাটির উপর হারাম করেছেন, নবীগণ জীবিত এবং জীবিকা পেয়ে থাকেন।”– ইবনে মাজাহ

৪। “মহান আল্লাহপাক পয়গম্বরদের শরীরকে (পঁচানো) মাটির জন্য হারাম করেছেন। আমার জ্ঞান এখনও যেরূপ আছে, আমার ইন্তেকালের পরও তদ্রূপ থাকবে।”– আবু দাউদ, কাঞ্জুল উম্মাল

৫। “যে কোন ব্যক্তি আমার উপর সালাম পাঠ করুক না কেন, আল্লাহ্ তাহা আমার রুহে পৌঁছেয়ে দেন, আমি তখন তার সালামের জবাব দেই।

৬। “যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে (দাঁড়িয়ে) আমার উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করে আমি তা (স্বয়ং) শুনতে পাই, আর যে ব্যক্তি অনুপস্থিত বা অন্য কোন স্থানে থাকা অবস্থায় দরূদ পাঠ করে তা আমার নিকট (ফেরেশতা কর্তৃক) পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।”

৭। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের কবরে জীবিত থাকেন এবং নামাজ আদায় করেন।”

“স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)” কিতাব থেকে নিম্ন লিখিত উদ্ধৃতি ঃ

আল্লামা শেখ জালালুদ্দীন সয়ূতী (রঃ) ‘তানবীরুল হাওয়ালেক’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেহ ও রুহ মোবারকের সাথে জীবিত রয়েছেন। তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে ভ্রমণ করতে পারেন; তাঁর এন্তেকালের সময় যে আকৃতিতে ছিলেন; আজও সে আকৃতিতেই আছেন। তিনি ফেরেশতাদের ন্যায় মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রয়েছেন, আল্লাহ্‌পাক যখন কারো প্রতি দয়া করেন, তখন তিনি তাঁর যিয়ারত লাভে ধন্য হন। আম্বিয়ায়ে কেরামের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, মৃত্যুর পর রুহ সমূহ তাঁদের দেহ মোবারকে প্রত্যাবর্তন করে এবং কবর থেকে বের হয়ে জমীন ও আসমানে ভ্রমণ করার অনুমতি তাঁদেরকে প্রদান করা হয়।

আল্লামা হাফেজ ইবনে কাইয়েম (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রুহ মোবারক ‘আ’লা ইল্লীয়্যীনে রয়েছে, যেখানে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের পবিত্র রুহ সমূহ রয়েছে। তাঁর দেহ মোবারক মদীনায়ে তৈয়্যেবায় রওজায়ে পাকে সংরক্ষিত রয়েছে এবং রুহ মোবারকের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক এত গভীর, ঘনিষ্ঠ এবং সুদৃঢ় হয়েছে যে, তিনি কবর শরীফে নামাজ আদায় করেন এবং তাঁকে যারা সালাম দেয়, তাদের সালামের জবাব প্রদান করেন।

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১। তাঁর রওজাপাকে উম্মতের আমল পর্যবেক্ষণ করেন, ২। তিনি নামাজ আদায় করেন, ৩। সেই জগতের উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করেন, ৪। নিকট হতে মানুষের সালাম নিজেই শ্রবণ করেন, দূর হতে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সালাম গ্রহণ করেন, ৫। সালামের জবাব দিয়ে থাকেন, ৬। বিশেষ বিশেষ উম্মতের উদ্দেশ্যে হেদায়াত প্রদানও তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। স্বপ্নে এবং কাশফের অবস্থায় এমন অগণিত ঘটনা এ পর্যন্ত ঘটেছে।

আবু নাঈম (রঃ), ইবনে সাদ (রঃ), ইমাম দায়েমী (রঃ), জুবায়ের ইবনে বক্কার (রঃ) এবং আল্লামা ইবনে জওজী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব (রাঃ) বলেন, “যখন নামাজের সময় হত তখন হযরত রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওজায়ে পাক থেকে আমি আযান শ্রবণ করতাম, এরপর একামত হত, আর আমি একামতের পরেই মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করতাম। আমি এভাবে পনের ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেছি।

হযরত ইমাম আবদুল ওয়াহ্যাব সারানী (রঃ) লিখেছেন যে, তিনি তাঁর ৮ জন সঙ্গীসহ প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বোখারী শরীফ পাঠ করেছেন এবং বোখারী শরীফ খতম হওয়ার পর তিনি যে দোয়া করেছিলেন তাও হযরত সারানী (রঃ) লিখেছেন।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রঃ) ‘অলফওজুল কবীর’ গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমি কোরআন মজিদ হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রুহ মোবারক থেকে পাঠ করেছি। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবার থেকে তিনি স্বপ্নে এবং জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্ত হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং যে সব হাদীস তিনি সংশোধন করেছেন সেগুলো শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রঃ) একটি গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন “দুররে সামীন”।

এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামও একমত যে, রওজায়ে পাকের সম্মুখে অথবা মসজিদে নববীতে যত নিম্ন স্বরেই দরূদ ও সালাম পেশ করা হোক না কেন, তা শ্রবণ করেন হযরত রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

উম্মতে মুহাম্মাদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য জানাযার যে বিধান করা হয়েছে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বেলায় উহা করা হয়নি। যেমন– জানাযায় ইমাম, মুক্তাদী, কেবলা মুখী হওয়া, হাত বাঁধা ইত্যাদি কোন বিধান পালন করা হয়নি। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর প্রতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অসিয়ত মত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুজরা মোবারকে প্রবেশ করে কামরায় রক্ষিত খাটের কাছে গিয়ে দরূদ-সালাম ও মুনাজাত পেশ করে চলে আসতেন। প্রথম পুরুষগণ, তারপর মহিলা, তারপর বালক-বালিকা, তারপর দাস-দাসীগণ ছালাম পেশ করেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত

ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), মোহাজের আনসার সবাই ছালাম পেশ করেছেন। কিন্তু তারা "আদদুয়াউ লিহাজাল মাইয়েতে" বলেন নাই।

ইমাম বিহীন, তাকবীর বিহীন, শুধু দরূদ-সালাম ও মুনাজাতের মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সমাধিস্থ করা হয়। **সুতরাং নিঃসন্দেহে তিনি হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।**

রওজা মোবারকে প্রাণের নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেহ মোবারক রাখার পরে হযরত আব্বাস (রাঃ) দেখতে পেলেন কাফনের ভিতরে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঠোঁট মোবারক নড়ছে, তিনি তার কান হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখের কাছে নিলে শুনতে পেলেন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "রব্বি হাবলী উম্মতী" বলে কাঁদছেন।

স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যিয়ারত

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন–

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَتِىْ — متفق عليه

"যে আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে সত্যই (আমাকেই) দেখল; কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।"– বোখারী, মুসলিম

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন–

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَـامِ فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقْظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطٰنُ بِىْ — متفق عليه

"যে কেউ আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে তৎপর শীঘ্রই জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখতে পাবে এবং শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।"– বোখারী ও মুসলিম

হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

"যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমার দীদার লাভ করল সে নিশ্চয়ই আমাকেই দেখল, কেননা আমি সকল আকৃতিতেই দেখা দেই।"– মাদারেজুন্নবুওয়াত

"স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)" কিতাব থেকে নিম্ন লিখিত উদ্ধৃতি

হযরত রসূল নোমা ওয়ায়েছী দেহলভী (রঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দীদার লাভ করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর এ সৌভাগ্য অর্জিত হয় আল্লাহ্ ওয়ালাদের কাতারে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর। কোন দোয়া-দরূদ বা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে এই সৌভাগ্য অর্জনের দৃষ্টান্ত হ'ল এমন– যেমন কোন ঝাড়ুদার বাদশাহর দুয়ারে করাঘাত করে তাঁকে ডাকে; হয় তো বাদশাহ্ তাঁর বিনম্র ও মধুর ব্যবহারের কারণে তাঁকে তার শাস্তিবিধান না করেন, আর বাইরে তশরিফ আনয়ন করে তার দীদার থেকে তাঁকে মাহরুম না করেন, কিন্তু বিষয়টি তার মহান দরবারের আদবের খেলাফ। তবে স্বয়ং বাদশাহ্ যদি দয়া করে কোন ফকীরের কুটিরে তাঁর পদধূলি দান করেন, তবে তাতে তাঁর শানের খেলাফ কিছু হয় না; আর ফকীর তার দানে ধন্য হয়।

তিনি আরো বলেছেন– শয়তান তাঁর আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে ধোঁকা দিতে পারে না। এ কাজটি তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তিনি হলেন হেদায়েতের প্রাণকেন্দ্র, আর শয়তান হলো গোমরাহীর মূল উৎস।

হযরত শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) মাদারেজুন্নাবুওয়াতে লিখেছেন– "যে আকৃতিতেই কেহ হযরত রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীদার লাভ করে, সেই আকৃতি মোবারক তাঁরই, যদি কোন ব্যক্তি বলে দেয় অথবা তিনি নিজেই পরিচয় দেন আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তবে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি হযরত রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীদার লাভ করে। তাঁর ব্যাপারে শয়তান কোন ভূমিকা রাখতে পারে না।"

তিনি বলেন– মৃত্যুর পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের দীদার লাভ করা রূপক আকৃতিতে হয়, বা স্বপ্নেও হয় এবং জাগ্রত অবস্থায়ও হয়। যাঁর মোবারক অস্তিত্ব মদীনা মোনাওয়ারায় রওজায়ে পাকে বিদ্যমান রয়েছে, তিনি সেখানে জীবিত আছেন, আরামরত রয়েছেন, তাঁর রূপক আকৃতি প্রকাশ পায়। **সাধারণ লোকেরা স্বপ্নে, আর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পান।** মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর তার সওয়াল-জওয়াবের সময়ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রূপক আকৃতিতে প্রকাশিত হন।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর বক্তব্যের সারমর্ম– "হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় প্রকৃত আকৃতিতে এবং রূপক অবস্থায় দেখা যেতে পারে। এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য যে, তিনি তাঁর রুহ মোবারককে তাঁর দেহ মোবারকে প্রকাশ করাতে পারেন।"

হযরত ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) লিখেছেন– "তিনি জাগ্রত অবস্থায় ৩৫ বার প্রাণের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যিয়ারত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।" এর কারণ জানতে চাইলে বলেন– "অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা।"

হযরত মুসান্না ইবনে সাঈদ (রঃ) বর্ণনা করেন– আমি ইমাম মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, "এমন কোন রাত যায় না যখন আমি আমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে না দেখি, অতঃপর তিনি ক্রন্দনরত হলেন।"

হযরত আবু বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে জাফর (রাঃ) এর এক রাত্রে ৫১ বার প্রাণের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যিয়ারত নসীব হয়েছে, শুধু তাই নয়, বরং তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রশ্ন করে জবাব লাভ করতেন। তিনি ৩০ বছর মক্কা মোয়াজ্জমায় অতিবাহিত করেন। ৩২২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি কা'বা শরীফের তওয়াফ অবস্থায় ১২ হাজার বার পবিত্র কোরআন খতম করেছেন।

৫০৯ হিজরী সালে এবং ৫৫৭ হিজরীতে যথাক্রমে হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) ও সাইয়েদ আহমদ রেফায়ী (রাঃ) মদীনা শরীফে যিয়ারতকালে তাঁদের ফরিয়াদে জিন্দা নবী রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ডান হাত মোবারক রওযা শরীফ থেকে উপরে উঠে আসে এবং তাঁরা হস্ত মোবারক চুম্বন করেন (বাহজাতুল আসরার, নুজহাতুল খাতির, হুসনুল মাকাসিদ প্রভৃতি গ্রন্থ)।

হযরত মওলানা হাফেজ মোহাম্মদ ইদ্রিস কানদলবী (রঃ) সীরাতুল মোস্তফা গ্রন্থে লিখেছেন– প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "সকল প্রণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে"-এ আয়াতের আদেশ মোতাবেক ক্ষণিকের জন্য মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহপাক তাঁকে জীবিত করেছেন এবং জমিনের প্রতি তাঁর দেহকে হারাম করে দিয়েছেন। অতএব তিনি বর্তমানে সম্পূর্ণ জীবিত অবস্থায় আছেন। তাঁর এ জীবন শহীদদের জীবনাবস্থা থেকে অনেক অনেক উত্তম এবং পরিপূর্ণ।

“মোসলমানী জিন্দিগী” কিতাব থেকে নিম্ন লিখিত উদ্ধৃতি

কুতুবুল এরশাদ, ইমামুত্ তরীকাত হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) “মোসলমানী জিন্দিগী” কিতাবের ৪২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন– ১৯৩৯ সনের ৬ই জুলাই ভোরে যখন আহাম্মদী ছোরফার মোরাকাবায় নিমগ্ন ছিলাম তখন হঠাৎ কাশফের মধ্যে হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অতি সুন্দর পোষাক ও পাগড়ী পরা অবস্থায়, তাঁর আছহাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ সহ নামাজের ইমামতি করতে দেখতে পেলাম; এতে আমার মধ্যে এক ‘খাছ হালত পয়দা হল ও সমস্ত শরীরে খুব জোড়ে জোড়ে সোলতানুল আজকার জারি হল ও চক্ষু হতে অশ্রু গড়াতে লাগল। উক্ত সনেরই ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার দিবাগত রাত্রে স্বপ্নযোগে দর্শনদান করতঃ হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে একটি মসজিদের ছেহেনে বসতে ইঙ্গিত করেন, কিন্তু লজ্জা বশতঃ বসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি আমাকে ধরে তথায় বসিয়ে দিলেন ও গদ্দিনশীন করতঃ বললেন– “লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ”ই আপনার জন্য কাফি। যে কেহ আপনার নিকট যে কোন মাকছুদের জন্য আসুক, আপনি যদি এর দ্বারা তাবিজ দেন, তা হলেই তার মাকছুদ পূর্ণ হবে।” এর পর তিনি তাঁর তর্জনি আঙ্গুলটির দ্বারা আমার কপাল স্পর্শ করলেন।

১৯৫৮ সনের ৬ই নভেম্বর, বুধবার দিনগত রাত্রে যখন আমি স্বপ্নযোগে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাজার শরীফের নিকট গেলাম, তখন তিনি ওঠে এসে অতি মহব্বতের সাথে আমাকে তাঁর বুকের সাথে চেপে ধরলেন ও অনেকক্ষণ যাবত খাছ তাওয়াজ্জোহ্ ও ফায়েজ প্রদান করলেন।

১৯৪৭ সনের ১০ই অক্টোবর স্বপ্নযোগে যখন মদীনা শরীফে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাজার শরীফের উপরস্থ গম্বুজে গেলাম, তখন তিনি আমাকে মহব্বতের সহিত বললেন– “মৌলভী এখানে আস।” হুজুরের পাক পা মেলে বসা ছিলেন। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে অনেকক্ষণ যাবত তাঁর পায়ের তালুতে চুম্বন দিয়া ছিলাম। এতে আমার মধ্যে তাঁর মহব্বতের এমন এক ফায়েজ আসল যাতে আমার প্রাণ জ্বলে যাচ্ছিল।”

কুতুবুল এরশাদ, ইমামুত্ তরীকাত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) এর জীবনী “লুকানো মানিক”-এ উল্লেখিত ঘটনাসমূহ নিম্নে দেয়া হলো–

কুতুবুল এরশাদ লিখেছেন– “আমার প্রথমবার হজ্জের সময় ২৩/১২/১৯৪৬ ইং তারিখ ভোরে যখন মদীনা শরীফে মসজিদে নববীর মিম্বরের নিকট বসে খতমে মোজাদ্দেদ পড়ছিলাম তখন আরবিতে যা ইলহাম হল তার অর্থ ঃ “এটা সে স্থান যেখানে দোয়া কবুল হয়। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রয়েছেন।” এর পর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মাথায়

পাগড়ী, শরীরে সুন্দর পোশাক ও মুখে কালো চাপ দাঁড়ি বিশিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি চক্ষু বন্ধ অবস্থায় মোরাকাবায় রত ছিলেন।

১৯৭৬ ইং সনে আমা কর্তৃক ২য় বার হজ্জ্ব সম্পাদনকালে মক্কাশরীফে অবস্থানের সময় ১২ই ডিসেম্বর, রবিবার কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের পর শায়িত অবস্থায় ঘুমের মধ্যে দেখলাম যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে অতি পরিচিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করলেন, "সূফী সাহেব কেমন আছেন?"

কুতুবুল এরশাদের বিশিষ্ট মুরীদ ও খলিফা ঢাকার বি.ডি.সি'এর ডাইরেক্টর মরহুম মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান সাহেব ১৯৭৩ সনে হজ্জ্ব করতে যাওয়ার পর মক্কায় হরম শরীফে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সঙ্গে জাগ্রত অবস্থায় মোসাফা করেছিলেন।

মুর্শিদ কেবলার ভ্রাতুষ্পুত্র ও খলিফা জগন্নাথ কলেজের প্রফেসর মরহুম মুহাম্মাদ মফিজুর রহমান সাহেব ১৯৭৬ সনে হুজুরের সঙ্গে হজ্জ্ব করতে গিয়ে যখন মসজিদে নববীর রিয়াজুল জান্নাতে বসে সকল সফরসঙ্গীগণের সঙ্গে খতমে কুরআনের মোনাজাতে ক্রন্দনরত ছিলেন, তখন হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সঙ্গে মোসাফা করেছিলেন।

গদ্দিনশীন পীর সাহেব কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃজিঃ) বলেন– "আমি ২৬/১২/১৯৯৬ ইং তারিখে বিছানায় শোয়ার পর দেখতে পেলাম যে, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বশরীরে এসে আমাকে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে বললেন, "কখন (মক্কা ও মদীনা) আসবেন?" আমি উত্তর করলাম, "জানুয়ারী মাসের ৫ বা ৭ তারিখ।" এতে তিনি বললেন, "ঠিক আছে, কোন চিন্তার কারণ নেই।" এটা বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"

গদ্দিনশীন পীর সাহেব বলেন– "০৭/০১/১৯৯৬ তারিখে আমরা মক্কা শরীফ পৌঁছি। সে রাতে আমি স্বপ্নে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমাদের কক্ষে উপস্থিত পেলাম। আলহামদুলিল্লাহ্।"

একবার হজ্জের সময় হযরত গদ্দিনশীন পীর সাহেবের সঙ্গে হুজুর কেবলার খলিফা মৌলভী মাহমুদুল হক সাহেব, খলিফা মৌলভী শমসের আলী সাহেব এবং এ অধম লেখকও মাতাফে বসে বাইতুল্লাহ শরীফের সামনে হাজির ছিলাম। আমরা দেখলাম এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব হযরত পীর সাহেব কেবলাকে তাওয়াফরত অবস্থায় সালাম দিলেন, যাঁর চেহারা-সূরাত দৃষ্টির কোন তুলনা নেই। তিনি পরের চক্করেও সালাম দিয়ে চলে গেলেন। তিনি হলেন আমাদের প্রাণের প্রাণ নবীয়ে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। অনতি দূরে খলিফা কর্নেল মফিজ সাহেব বসা ছিলেন, তিনিও চর্মচক্ষে স্বশরীরে প্রাণের নবীজীকে দেখে ধন্য হলেন।

হুজুর কেবলার খলিফা মৌলভী শমসের আলী সাহেব বলেন– "১১/০১/১৯৯৬ তারিখ রাতে যমযম নিয়ে আসার সময় হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে

আমার ডান পাশে দাঁড়ালেন, তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন– "তুমি এত কষ্ট করছ, আমাকে দাও আমি তোমার সাহায্য করি। তিনি হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সহিত মুসাফাহ্ করলেন এবং দোয়া চাইলেন যে, আমাকে যারা সাহায্য করেছেন ও আমার সমস্ত সঙ্গীগণের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করুন। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন– তারা তোমাকে সাহায্য করে নাই বরং তারা আল্লাহর রাসূলকে সাহায্য করেছেন। এরপর মুচকি হাসি দিয়ে অদৃশ্য হলেন।"

হুজুর কেবলার বিশিষ্ট খলিফা ইঞ্জিনিয়ার এমঃএঃ মতিন (অবঃ চিফ ইঞ্জিনিয়ার বিউবো) ১৯৭৬ইং সনে পবিত্র মিনায় ৩য় দিনের পাথর মারার পর জামরার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে আনন্দ যে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হল। হঠাৎ দেখলেন চেহরা-সুরত, জামা-জুতা সব আরবী লোকের ন্যায় পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হয়ে হযরত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন– "হাজ্জাম মাবরুরা, হাজ্জাম মাবরুরা" অর্থাৎ হজ্জ মকবুল। এরপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এ অধম লেখকও সঙ্গী ছিলাম।

উক্ত খলিফা ইঞ্জিঃ এম.এ. মতিন সাহেব ২০০৫ইং সনে হজ্জ শেষে মদীনা শরীফ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যিয়ারতে গিয়ে এক দিন রওযাপাকে সালাম পেশ করে জান্নাতুল বাকী গেট থেকে বের হয়েই দেখলেন, পলকহীন চোখে প্রাণের নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এবং অধম লেখকের হাতে আতর দিয়ে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব ইঞ্জিঃ মৌলভী মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেব ২০০৯ সনে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। হজ্জ শেষে প্রাণের নবীজীর মহব্বতে হিজরতের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গারে ছূরে যে স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন উহা স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য অতি কষ্টে সুউচ্চ পাহাড়ের পথ অতিক্রম করে সেখানে পৌঁছেন। দল নেতা কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান সাহেব সহ তারা ৫ (পাঁচ) জনে সেখানে উপস্থিত হয়ে মুনাজাতে রত হন। তিনি চক্ষু মুদ্রিত ছিলেন, হঠাৎ চক্ষু খুলে গেল, দেখলেন এক সুপুরুষ যার বয়স ৩৫/৪০ বৎসরের মতো হবে। এ দূর্গম পথে এ রকম চেহারা ছবি, এত সুন্দর অবয়ব দ্বিতীয় কারও নেই, এমনকি হয়ও না, তিনি চক্ষু বন্ধ করেন, পর মুহূর্তেই আবার খুলে তাকে দেখতে পেলেন না। তার অন্তরে নবীজীর মহব্বত পূর্ণভাবে জাগরুক। হযরত পীর সাহেব কেবলা বলেন, তিনিই প্রানের নবী দো'জাহানের সরদার হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আলহামদুলিল্লাহ, চর্মচক্ষে হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যিয়ারত নসিব হলো।

হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক কুতুবুল এরশাদ মুর্শিদ কেবলার সালামের জবাব প্রদান ঃ

ঢাকার গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের ইমাম মাওলানা শামসুল হক সাহেব ১৯৯১ সালে মক্কা শরীফে হজ্জ করার পর মদীনা শরীফে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওজা মোবারকে উপস্থিত হয়ে বললেন– "ইয়া রাসুলাল্লাহ! কুতুবুল এরশাদ সূফী হাবিবুর রহমান সাহেবের তরফ হতে আপনাকে সালাম। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রওযা শরীফ হতে বললেন– 'ওয়া আলাইহিচ্ছালাম!' (তাঁহাকে আমার সালাম পৌঁছাইও)।"

উক্ত মাওলানা শামসুল হক সাহেব, ১৯৯৫ ইং সনে মক্কা শরীফ যান। তৎপর মদীনা শরীফে গিয়ে মসজিদে নববীতে রমজানের শেষ দশদিন ইতেকাফ করাকালীন সময়ে একদিন হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেন, "সূফী হাবিবুর রহমান সাহেবের তরফ হতে আপনাকে সালাম।" এর পর তিনি মোরাকাবায় নিমগ্ন হলে, হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখা দিয়ে বললেন– "সাল্লেম আলাইহে ফাত্তাবেউহু" (অর্থাৎ আমার সালাম তাকে পৌঁছাও। অতঃপর তোমরা সকলে তার অনুসরণ কর)।

ঢাকা গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের প্রাক্তণ শিক্ষক মুর্শিদ কেবলার খলিফা মৌলভী কাজী রুহুল আমিন সাহেব ১৯৯২ সালে পবিত্র হজ্জ পালন করার পর মদীনা শরীফে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওজা মোবারকে গিয়ে তাঁকে হুজুরের ছালাম পৌঁছিয়ে দিলে তিনি রওযা শরীফ হতে উত্তর করলেন– "আলাইহেছ্ ছালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহে, ওয়া বারাকাতুহু" অর্থাৎ তাহার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

হযরত খাজা গরীবে নাওয়াজ আজমীরী চিশ্‌তী (রাঃ) দ্বিতীয় বার হজ্জ সম্পন্ন করে মদীনা শরীফ পৌঁছলেন। রওযা মুবারকে হাজির হয়ে তিনি হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সালাম জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তরফ হতে সুস্পষ্টভাবে সালামের জবাব আসল। কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় "ওয়ালাইকুমুস্‌সালাম ইয়া কুতুবুল মাশায়েখেল হিন্দ" বলে উত্তর দিলেন। তারপর তাঁহাকে লক্ষ্য করে বললেন– "তুমি আমার ধর্মের মঈন অর্থাৎ সাহায্যকারী। মনে-প্রাণে সেই কাজে আত্মনিয়োগ কর। এইবার আমি তোমাকে হিন্দুস্থানের বেলায়েত প্রদান করলাম। হিন্দুস্থান অনাচার-কদাচারে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কলুষিত অবস্থায় নিপতিত রয়েছে; সুতরাং তুমি আমার নির্দেশানুযায়ী হিন্দুস্থানের আজমীরে গমন কর। নিশ্চয় তোমার দ্বারা তথাকার যুগ সঞ্চিত অধর্ম ও অন্ধকাররাশি বিদূরীত হয়ে পবিত্র ইসলাম প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।"

হযরত খাজা সাহেব এইরূপ বাণী শ্রবণ করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন; কিন্তু হিন্দুস্থানের আজমীর কোথায় কোনদিকে, বিশেষতঃ হিন্দুস্থানই বা দুনিয়ার কোন অঞ্চলে অবস্থিত এই সম্পর্কে কোন কিছুই তাঁর না জানার কারণে তিনি কিছুটা

চিন্তান্বিতও হয়ে পড়লেন। চিন্তা করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি রওজা ভূমিতেই নিদ্রাভিভূত হলেন। নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন যে, হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর শিয়রে বসে আছেন এবং তিনি তাঁকে হিন্দুস্থান ও আজমীর শহরের নকশা, অবস্থান এবং পথ-ঘাটসমূহ দেখিয়ে দিচ্ছেন। অধিকন্তু হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হস্তে বেহেশতের বাগিচার একটি সুমিষ্ট আনার অর্পণ করতঃ তাকে দোয়া করে আল্লাহর উপর ভরসা করে আজমীর শরীফ যাত্রার নির্দেশ দেন। এরপর আজমীর শরীফ আসেন এবং এখনও তথায় আরাম করছেন।

অধম লেখকের কাশ্‌ফ ঃ

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ১৯৯৬ইং সনের জানুয়ারি মাসে মুর্শিদ কেবলার সাথে আমার মক্কা শরীফ উমরায় যাওয়ার সুনছিব হয়। তিনি মক্কা শরীফে আমাদেরকে নিয়ে কোরআন শরীফ খতম করলেন। শুক্রবার সকালবেলা উক্ত খতমের মুনাজাতের অনুষ্ঠান হয়েছিল। মুনাজাতের সময় আমার ডান দিকে উপস্থিত পেলাম প্রাণের নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে। কতইনা সুন্দর, মধুর ও নূরানী সেই চেহারা মুবারক। আমাকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন "আমি প্রতি শুক্রবার হেরেম শরীফ জুমা'র নামাযে শরীক হই।" আল্‌হামদুলিল্লাহ্। আনন্দে মন খুবই উৎফুল্ল। অন্তর্জগতে স্থির অনুভূতি ছিল, নামাজে নবীজী আসছেন। বাস্তবেও তাই হলো, জুমার নামাযের এক সময় হঠাৎ দেখলাম "মসজিদুল হারামের ছাদের উপর মারওয়া থেকে সাফার দিকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাচ্ছেন।" এক ব্যক্তি ছাতা ধরে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ছিলেন সৈনিকের লেবাস পরিহিত। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

আশেকানের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য হলো হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জিয়ারত লাভ। এতে প্রেমিক মাত্রই আন্তরিক সান্তনা লাভ করেন। সৌভাগ্য লাভে মানুষের সাধনার কোন শেষ নেই। আল্লাহপাক যাকে এ সৌভাগ্য দান করবেন তিনিই এই নেয়্‌মাত লাভে ধন্য হবেন। তবে সাধারণত অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করলে এবং পরিপূর্ণভাবে সুন্নতের উপর আমল করলে সর্বোপরি তাঁর সঙ্গে অধিকতর মহব্বত হলে জিয়ারত লাভ হয়ে থাকে। স্বরণ রাখুন, আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহ ও প্রাণের নবীজীর সুনজরই মূলতঃ সম্বল। অবশ্য জিয়ারত লাভ না হলে কোন অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া উচিত নয়। হতে পারে আপনার এতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। প্রিয়জনের সন্তুষ্টি ছাড়া প্রকৃত আশেকের আর কিছুই কাম্য হতে পারে না।

এ সম্পর্কে কবির আবেগ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রাখার যোগ্য–

আমি চাই তাঁর মিলন আর সে চায় আমার বিরহ তাই তাঁর ইচ্ছার জন্য আমি আমার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলাম।

আরেফ শিরাজী এভাবে তাঁর আবেগ প্রকাশ করেন ঃ

মিলন ও বিরহ দিয়ে কি হবে, বন্ধুর সন্তুষ্টি কামনা কর। কেননা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তুমি বন্ধুর নিকট তাকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু চাইবে।

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, যদি স্বপ্নে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জেয়ারত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয় কিন্তু পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন না হয় তবে সেই জিয়ারত যথেষ্ট হবে না। স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোনালী যুগেও অনেক লোক প্রকাশ্যে তাঁর দর্শন লাভ করেছে কিন্তু মূলতঃ তারা ছিল তাঁর নিকট থেকে অনেক দূরে। পক্ষান্তরে অনেক লোক জিয়ারত লাভে ধন্য হয়নি অথচ তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে, যেমন- হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)।

আল্লাহপাক আমাদেরকে বার বার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জেয়ারত লাভে ধন্য হওয়ার তওফিক দান করুন। আমিন!

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জিয়ারত লাভের আমল

যে স্বপ্নযোগে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জিয়ারত লাভ করতে পারে, সর্ব বিষয়ে তার মঙ্গল হয়ে থাকে এবং আশা করা যায় যে, তাঁকে খোশ মেজাজ ও সুন্দর আকৃতিতে দেখতে পায় তার বেহেশত নছিব হবে। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

من رأنى فى المنام فقد رأنى فان الشيطان لا يتمثل فى صورتى ٥

"যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে আমাকেই দেখে, কারণ শয়তান কখনও আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।"– বোখারী ও মোসলিম

এই আমলের চেষ্টা করতে হলে মুখে দুর্গন্ধ হয় এমন কোন জিনিস, যথা– তামাক, বিড়ি, কাঁচা রসুন, পিয়াজ খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে এবং সর্ব কাজে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নতের অনুসরণ করতে হবে এবং বিশেষভাবে মিথ্যা বলার অভ্যাস দূর করতে হবে এবং আতর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে।

হযরত বড় পীর সাহেব (রহঃ) তাঁহার "গুনিয়াতুত্তালেবীন" কিতাবে লিখেছেন যে, হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– "যে ব্যক্তি জুম'য়ার রাত্রে দুই রাকাত নফল নামাজ এই নিয়মে পড়ে যে, প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর আয়াতুল কুরসী ০১ (এক) বার ও সূরা এখ্‌লাস ১৫ (পনের) বার এবং নামাজ শেষ করে নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়বে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাকে স্বপ্নে দেখতে পাবে; যদি প্রথম রাত্রে না দেখে তবে পরবর্তী রাত্রি সমূহেও উক্তরূপ আমল করতে

থাকবে তা হলে দ্বিতীয় শুক্রবার আসার পূর্বেই আমাকে দেখবে ও তার পাপ মাফ হয়ে যাবে।” দরূদ শরীফটি নিম্নরূপ–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ٥

এরপর ‘ইয়া নূরো’ এই পবিত্র নাম এক হাজার বার পড়ে মোনাজাত করবে ও স্বীয় মকছুদ প্রার্থনা করবে। তারপর উত্তর শিয়রে ডান কাতে শুয়ে ‘ইয়া নূরো’ পড়তে পড়তে নিদ্রা যাবে।

হজ্জ হতে দেশে প্রত্যাবর্তন

যখন সরদারে দো’আলম, তাজেদারে মদীনা, আকায়ে নাম্দার হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যিয়ারত এবং মসজিদ ও দর্শনীয় স্থানসমূহের যিয়ারত সম্পন্ন করে নিবেন এবং বাড়ী প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা করবেন, তখন মসজিদে নববীতে অথবা মিহরাবে নববীতে কিংবা এর আশে-পাশে যেখানে জায়গা পাবেন সেখানে দুই রাকআত নামায আদায় করবেন। তারপর রওযা মোবারকে উপস্থিত হয়ে সালাম নিবেদন করবেন এবং দ্বীনি ও দুনিয়াবী প্রয়োজনের জন্য, হজ্জ ও যিয়ারত কবুল হওয়ার জন্য এবং নিরাপদে বাড়ী পৌঁছার জন্য দো’আ করবেন এবং বলবেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هٰذَا اٰخِرَ الْعَهْدِ نَبِيِّكَ وَمَسْجِدِهٖ وَحَرَمِهٖ وَيَسِّرْ لِي الْعَوْدَ اِلَيْهِ وَالْعُكُوْفَ لَدَيْهِ وَارْزُقْنِيْ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرُدَّنَا اِلٰى اَهْلِنَا سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ اٰمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

“আল্লাহুম্মা লা তাজআ’ল হা-যা আখিরাল আহদি নাবিয়্যিকা ওয়ামাস্জিদিহি ওয়াহারামিহি ওয়াইয়াসসির লিয়াল আওদা ইলাইহি ওয়ালউকূফা লাদাইহি ওয়ারযুক্বনীল্ আফওয়া ওয়ালআ’ফিয়াতা ফীদদুনয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়ারুদ্দানা ইলা আহলিনা সালিমীনা গানিমীনা আমীনা বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।”

আর এই সময় যতদূর বেদনা ও আন্তরিক কষ্টের প্রকাশ ঘটানো সম্ভব তা ঘটাবেন এবং অশ্রু বিসর্জনের চেষ্টা করবেন। এই সময় অশ্রু নির্গত হওয়া এবং অন্তরে বেদনার প্রভাব পড়া কবূলিয়াতের নিদর্শন। তারপর কাঁদতে কাঁদতে পবিত্র দরবার হতে বিচ্ছেদের জন্য আফসোস করতে করতে রওয়ানা হবেন। আর যতটুকু সাধ্যে কুলায় মদীনার ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে সদ্কা করবেন। এই সফরের দো’আসমূহ পড়তে পড়তে চলবেন– যার বর্ণনা আদাবে সফরের মধ্যে কিতাবের শুরুতে করা হয়েছে। খেঁজুর, যমযমের পানি, আতর, তাসবীহ্, টুপি, জায়নামায, নিরাময়ের মাটি, সাত

কূপের পানি প্রভৃতি তাবাররুক হিসাবে সঙ্গে আনবেন। আর বাতেনীভাবে পবিত্র হজ্জের সাথে সংশি-ষ্ট কার্যক্রমের মহত্ব মর্যাদা, আল্লাহ্র মকবুল বান্দাদের আদর্শ, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ, পরোপকার, সর্বোপরি মহান আল্লাহ্র নৈকট্য ও প্রাণের নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-র মহব্বত নিয়ে দেশে ফিরবেন। হজ্জের বড় সওগাত হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মহব্বত লাভ।

মদীনা মুনাওয়ারা হতে জেদ্দা ও দেশে পৌঁছা ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে বিমান যোগে মানুষ হজ্জ করেন। দেশ থেকে আসার সময় যেভাবে বিমানের সময়সূচির বিষয় সচেতন ছিলেন এখনও সেভাবে সচেতন থাকবেন। বিশেষভাবে বিমানের সময় কিন্তু রাত্র ১২:০১ মিনিট হতে পরের দিনের তারিখ গণনা করা হয়। যদি কোন রকম হিসাবে ভুল করেন তবে সীমাহীন কষ্ট পেতে হবে। তাই যথা সময়ে জেদ্দা পৌঁছাবেন ও টিকেটের তারিখ, সময় দেখে বুঝে সব প্রোগ্রাম করবেন। যদি আপনি বুঝতে না পারেন তবে সঙ্গীদের মধ্যে বুঝদার লোকের পরামর্শ নিবেন।

বাড়ীর নিকটে পৌঁছা ঃ

যখন নিজের শহর অথবা গ্রাম দৃষ্টিগোচর হবে তখন এই দো'য়া পাঠ করবেন–

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ - آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

এবং কোন লোকের মাধ্যমে নিজের আগমনী সংবাদ বাড়ীতে পৌঁছে দিবেন। রাতের বেলা শহরে প্রবেশ করবেন না; বরং সকালে অথবা বিকালে প্রবেশ করবেন এবং শহরে প্রবেশ করে মসজিদে গমনপূর্বক দুই রাকআত নামায আদায় করবেন। তবে শর্ত এই যে, তখন যেন মাকরূহ্ ওয়াক্ত না হয়। যখন গৃহে প্রবেশ করবেন, তখন এই দো'আ পাঠ করবেন–

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا

"তাওবান্ তাওবাল্ লি রাব্বিনা আওবাল্ লা-য়ুগাদিরু আ'লাইনা হাওবান্।"

তারপর গৃহে প্রবেশ করেও দুই রাকআত নামায আদায় করবেন এবং আল্লাহ্পাক যে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এই সফর সম্পূর্ণ করালেন এবং আপনাকে এই বিরাট সৌভাগ্য ও পরম নিয়ামত দ্বারা পুরস্কৃত করেছেন সে জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করবেন।

হাজীগণকে অভ্যর্থনা করা ঃ

হাজী সাহেবগণ যখন হজ্জব্রত পালন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তাদের সাথে সাক্ষাত করবেন, সালাম ও মুসাফাহ্ করবেন। তাদের গৃহে প্রবেশ করার পূর্বেই নিজেদের জন্য দো'আ করাবেন। হাজীগণের দো'আ কবুল হয়ে থাকে। সলফে সালেহীনদের দস্তুর ছিল যে, তাঁরা হাজীগণকে হজ্জে যাওয়ার সময় বেশ কিছু দূর সাথে গিয়ে বিদায় দিতেন এবং প্রত্যাবর্তনের সময় অভ্যর্থনা করে আনতেন; আর তাঁদের মাধ্যমে দো'আ করাতেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ أَنْ يَّسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُوْرٌ لَّهُ رواه احمد «مشكوة»

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– "যখন তোমরা হাজীদের সাথে মোলাকাত করবে, তখন তাদেরকে সালাম করবে, তাদের সাথে করমর্দন করবে এবং তাদের গৃহে প্রবেশ করার পূর্বেই নিজেদের জন্য দো'আ করিয়ে নিবে। কেননা, তাদের গুণাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।"– আহমাদ

মকবুল হজ্জ

মকবুল হজ্জ নছিব হওয়া আল্লাহ্তা'য়ালারই বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ। বিনয়ের সাথে তাঁর কাছে ফরিয়াদ ও তাঁর দুয়ারে পড়ে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোন সাধ্য নেই। সামান্য ভাবে উপলব্ধি করার জন্য সংক্ষিপ্ত কিছু নিদর্শন বর্ণনা করা হলো।

হজ্জ কবুল হওয়ার নিদর্শন ঃ

১। পরম বন্ধু মহান আল্লাহ্ এবং প্রাণের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য অধিক অধিক মহব্বত ও নৈকট্য অনুভূত হওয়াই মকবুল হজ্জের প্রধান নিদর্শন।

২। হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর ইবাদতে আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া, গুনাহের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হওয়া এবং তা থেকে পরহেজ করা।

৩। পূর্বের অবস্থার পরিবর্তন অনুভূত হওয়া।

৪। আখেরাতের প্রতি মন ধাবিত হওয়া। দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হওয়া।

যদি এমন অবস্থা অনুভূত হয়, তাহলে ধারণা করা যায় আল্লাহ্ পাকের করুণার দৃষ্টি আরোপিত হচ্ছে এবং হয়েছে। তাই আল্লাহর এহ্সানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রয়োজন, যাতে এ অবস্থা বিদ্যমান থাকে। সে জন্য গুণাহ বর্জন এবং নেক কাজের প্রতি ধাবমান থাকা বাঞ্ছনীয়।

হজ্জের পরবর্তী অবস্থা ও অনুধাবন ঃ

১। যদি পূর্বের অবস্থার কোন উন্নতি অনুভূত না হয়।

২। যদি ইবাদত-রিয়াজতে মন না বসে, গুণাহের প্রতি মন ধাবিত হয়।

৩। যদি আখেরাতের দিকে মন ধাবিত না হয়, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, আরো পরীক্ষা দিতে হবে। এমতাবস্থায় যা করণীয় তা করতে হবে, নিরাশ হওয়া যাবে না। নিজের কামিয়াবীর জন্য মেহনতের সাথে মুজাহাদায় সচেষ্ট হতে হবে। যেমন– দুনিয়ার সফলতার জন্য বারবার অকৃতকার্য হয়েও পিছপা হই না, তেমনি আখেরাতের সফলতার জন্যও বারবার চেষ্টা করতে হবে, নিরাশ হওয়া মহাপাপ।

হজ্জ একটি অতি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আদায় করার পর শয়তান সাধারণতঃ মানুষের মনে বড়ত্ব ও বুযুর্গীর ভাব জাগিয়ে তোলে, যা তার যাবতীয় আমলকে বরবাদ করে দেয়। তাই কখনও যেন এভাব মনে উদয় না হয়, সে বিষয়ের প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

একজন হাজীর আজীবন কর্তব্য ও দায়িত্ব

আল্লাহ্র যে প্রিয় বান্দার হজ্জ নছিব হয়েছে তিনি যেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে হজ্জ কায়েম রাখেন। হাজী সাহেব হজ্জের পবিত্র স্মৃতি বুকে ধারণ করে অবশিষ্ট জীবন কামেল মুসলমানের গুণাবলী নিয়ে কাটাতে পারেন সে চেষ্টা করবেন এবং পরকালে আল্লাহ্র দরবারে হজ্জ নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন এ কামনা থাকবে।

পবিত্র হজ্জব্রত পালন করার পর মানুষের আমলী জিন্দেগীতে আমূল পরিবর্তন আসা উচিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন– “মকবুল হজ্জের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।” এহেন খোশ খবর শোনার পর একজন হাজী, দ্বীনের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও সন্দেহজনক কোন কাজ করতে, কোন কথা বলতে অথবা কোন অনুমোদনকে স্বীকৃতি দিতে পারেন না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একজন সাধারণ মুমিনের জন্যও এসব করা বা বলা জায়েয নেই।

অতঃপর একজন হাজী সাহেবের জন্য অন্যায় হত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, লেওয়াতাত, চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, মা-বাপের নাফরমানি, ওয়াদা লঙ্ঘন, আমানত খিয়ানত,, মিথ্যা, শঠতা, হিংসা, অহঙ্কার, গীবত, চোগলখুরী, রিয়া, যাত্রা-নাটক-সিনেমা, রাশিচক্র, যাদু-টোনা, ভাগ্য-গণনা, প্রাণীর ছবি অঙ্কন, আত্মসাত, জবর দখল, লটারী, শেরেকী ইত্যাদি কবীরা গুণাহ্ থেকে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য। সমাজে হাজী সাহেবকে হতে হবে একজন আদর্শ মানুষ। নামায, রোযা, ফিতরা, যাকাত, আচার-আচারণ, লেবাছ, লেনদেন ইত্যাদিতে তিনি হবেন সকলের অনুসরণীয়।

অর্থাভাবে অনেকে হজ্জ পালন করতে পারেন না। এই মানষিক বেদনা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান। কিন্তু যারা হজ্জব্রত পালন করতে

পেরেছেন, তাঁরা ভাগ্যবান; সাধারণের দৃষ্টিতে তাঁরা কামেল, পরিপূর্ণ ঈমানদার। দ্বীন ও দ্বীনদার মানুষ তাঁদের থেকে অনেক কিছু আশা করেন।

আল্লাহ্তা'য়ালা সকলকে হজ্জ ও ওমরা কায়েম রাখার তৌফিক দান করুন। আমীন।

"মুর্শিদ আমার"

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُرْشِدًا

"যাকে আল্লাহ্ হেদায়েত করেন সে হেদায়েত প্রাপ্ত হন (কামেল পীর প্রাপ্ত হন) এবং তিনি যাকে প্রথভ্রষ্টতার মধ্যেই রাখতে চান, তার জন্য তুমি কোন বন্ধু মোর্শেদ (পথ প্রদর্শক) পাবে না।"– কোরআন (১৮ঃ১৭)

পরিচয় ঃ

আমার "মুর্শিদ কেব্লা" হলেন কুতুবুল এরশাদ, কুতুবুল আলম, মোজাদ্দেদে জামান, ইমামুতরীকাত্ হযরত মৌলভী, সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)। তিনি ভোলা জেলার চরছেফালী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ আরশেদ আলী সরদার ও মাতার নাম হাজী শরীফজান।

শিক্ষা জীবন ঃ

"মুর্শিদ কেবলা" ১৯৩২ ইং সনে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর বি.টি পাশ করেন। সাথে কোরআন, হাদীস, তাফসির, হযরত বড়পীর (রঃ), ইমাম গাজ্জালী (রঃ) ও আউলিয়ায়ে কেরামের বহু কিতাবাদি অধ্যয়নের সৌভাগ্য লাভ করেন। ক্লাশ সেভেন থেকে বি.এ. পর্যন্ত আরবী ভাষা অধ্যয়নের ফলে আরবী ভাষা বাংলা ভাষার ন্যায়ই তাঁর কাছে সহজ-সরল হয়েছিল।

কর্মজীবন ঃ

হযরত "মুর্শিদ কেবলা" হালাল উপার্জণের জন্য জীবনের পেশা হিসাবে শিক্ষকতাকে বেছে নেন এবং চাকুরীর নির্ধারিত সময়ের পরে মুক্তভাবে কোরআন, হাদীস ও নানা প্রকার ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যায়নের সুযোগ পান। তিনি সরকারী চাকুরী থেকে ১৯৬৭ ইং সনে অবসর গ্রহণ করে কিছুকাল ভোলা কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ও পরে বোরহান উদ্দিন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

আধ্যাত্মিক জীবন ঃ

হযরত "মুর্শিদ কেবলা" আই.এ. পড়ার সময় কুমিল্লার মরহুম হযরত ক্বারী ইব্রাহীম (রঃ) সাহেব এবং বি.এ. পাশ করার পর জৌনপুরের মরহুম হযরত মাওলানা আঃ রব

(রঃ) সাহেবের নিকট মুরীদ হয়েছিলেন। এরপরও মকছুদ হাসিলের জন্য **১৯৩৭ সনের ৭ই অক্টোবর ফুরফুরা শরীফের স্বনামধন্য পীর সাহেব কুতুবুল আকতাব, মোজাদ্দেদে জামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) এর নিকট বায়াত হন**। ফুরফুরার হুজুর কেবলা ও তাঁর শ্রেষ্ঠতম খলিফা হযরত মাওলানা শাহ সূফী নেছার উদ্দীন আহম্মদ (রঃ) উভয়ের নিকট তিনি তরীকার নানা বিষয় তালীম প্রাপ্ত হন এবং উভয়েই জাহেরী ও বাতেনীভাবে তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন। স্মরণীয় বিষয় যে– বায়াত হওয়ার ০৬ (ছয়) মাস পরই ১৯৩৮ ইং সনের ৭ই মার্চ দাদা হুজুর কেবলা তাকে চিশতীয়া, ক্বাদরীয়া, নক্‌শবন্দীয়া ও মুজাদ্দেদীয়া তরীকার খেলাফত প্রদান করেন।

হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ২৭/০১/১৯৩৮ ইং তারিখ স্বপ্নে "মুর্শিদ কেবলা"কে দেখা দিয়ে বলেন– "আপনি আল্লাহু-আল্লাহ্" জিকির করুন। ১৯৩৯ সনের ১৭ ডিসেম্বর হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বপ্নযোগে দর্শনদান করতঃ মুর্শিদ কেবলাকে একটি মসজিদের ছেহেনে বসতে ইঙ্গিত করেন, কিন্তু লজ্জা বশতঃ বসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি তাঁকে ধরে তথায় বসিয়ে দিলেন ও গদ্দিনশীন করতঃ বলেন– "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"-ই আপনার জন্য কাফি। যে কেউ আপনার নিকট যে কোন মকছুদের জন্য আসুক, আপনি যদি এর দ্বারা তাবিজ দেন, তা হলে তার মকছুদ পূর্ণ হবে।" ১৯৪২ সনের ১৪ই মার্চ মরহুম ক্বারী ইব্রাহীম সাহেব (রঃ) ও শর্ষিণার মরহুম পীর হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহম্মদ (রঃ) স্বপ্নযোগে একত্রে দেখা দিয়ে বলেন– "আপনি আল্লাহ্পাক কর্তৃক 'কুতুবুল এরশাদ' পদে উন্নিত হয়েছেন।" ১৯৪৭ ইং সনের ১০ই অক্টোবর স্বপ্নযোগে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "মৌলভী" খেতাব প্রদান করেন। ১৯৫৮ সনের ৬ই নভেম্বর স্বপ্নে দেখা দিয়ে মহব্বতের সাথে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "মুর্শিদ কেবলা"কে বুকের সাথে চেপে ধরলেন ও অনেক্ষণ যাবত খাছ তাওয়াজ্জোহ্ ও ফায়েজ প্রদান করেন।

স্বপ্নে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ও হযরত আজরাঈল (আঃ) ফায়েজ দান করেছেন। এছাড়াও হযরত মূসা (আঃ), হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত বড় পীর সাহেব (রঃ), হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তী (রঃ) এবং আরও বহু আউলীয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক হুজুর কেবলাকে স্বপ্নযোগে মারেফাতের বহু এলেম, হেকমত ও ফায়েজ দান করেছেন। হযরত রাবেয়া বছরী (রঃ), হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (রঃ) ও হযরত ক্বারী ইব্রাহীম সাহেব (রঃ) স্বপ্নযোগে হুজুর কেবলাকে খেলাফাত দান করেছেন।

কুতুবুল এরশাদ ও মোজাদ্দেদ ঃ

আমার মুর্শিদ কেবলা সমসাময়িক যুগের ইমাম ও মোজাদ্দেদ ছিলেন, সেই সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোকপাত করা হলো–

১। কোরআন, হাদীস ও আউলীয়ায়ে কেরামের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ্ প্রেমিকগণ যে পার্থিব জীবনে আল্লাহ্র মাখলুকী তাজাল্লা দর্শনে সক্ষম, সে বিষয়টি পুনর্জীবিত করেছেন।

২। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে হায়াতুন্নবী, ভক্তের ডাকে স্বপ্নে, কাশ্‌ফে ও জাগরণে বাহ্যিকভাবেও সাড়া দেন, তিনি লিখনী ও ওয়াজ নছিহাতের মাধ্যমে প্রায় লুপ্ত উক্ত বিষয়টি পুনর্জীবিত করেছেন।

৩। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার এলেমের উত্তরাধিকারীই প্রকৃত আলেম। এলমে তাসাউফ অর্জন না করে শুধু শরীয়াত শিখে আলেম পদবাচ্য নয়, এটা জোরালোভাবে প্রচার করেন। তাদের সংশোধনের জন্য লিখেছেন– "আলেমের ছদ্মবেশে শয়তানের খলিফা ও মোহাম্মদীয়া তরীকা"।

৪। পবিত্র কোরআনের ২৬ঃ৮৮-৮৯ আয়াতের আলোকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ক্বলবে ছালিম (সুস্থ ক্বলব), অন্তরের পরিশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জন ব্যতীত শুধুমাত্র বাহ্যিক আমল দ্বারা কেউ পরকালে মুক্তি পাবে না। অন্তরের পরিশুদ্ধির জন্য কামেল পীরের তাওয়াজ্জোহ্ একান্ত প্রয়োজন।

৫। "হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বক্ষণই আল্লাহ্র জিকিরে রত থাকতেন"– সহীহ্ বোখারী। কোরআন মজীদের ৪ঃ১০৩ আয়াতে আল্লাহ্পাক নির্দেশ করেন– "নামাজ শেষ হওয়ার পরেও তোমরা দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়, সর্বক্ষণ) আল্লাহ্র জিকির কর।" তাই সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণ আল্লাহ্র জিকিরে রত থাকা ফরজ এবং কেবলমাত্র কামেল পীরের তাওয়াজ্জোহের বরকতেই ক্বলব ও সকল লতিফাসহ সর্বশরীরে জিকির করা সম্ভব, তা প্রমাণ করেছেন।

৬। ঈমানের পরেই নিঃস্বার্থ বিশ্ব-প্রেম ও জীবের দয়াই আল্লাহ্ প্রাপ্তির সহজ পথ, এটা বর্ণনা করেছেন, স্বয়ং চর্চা করেছেন এবং মুরীদগণকে শিক্ষা দিয়েছেন।

৭। তিনি কোরআন ও হাদীসের দলীল দিয়ে বলেন যে, "আল্লাহ্ প্রেম" ও "নবী প্রেমই" ঈমানের মূল।

৮। পবিত্র কোরআনের ২৪ঃ৩০-৩১, ৩৩ঃ৩৩-৩৫, ৫৯ আয়াতের আলোকে ইহা প্রমানিত যে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই সমভাবে পর্দা ফরজ।

৯। মহিলাগণ আমাদের অর্ধসমাজ। ধর্ম-কর্মে স্বামী-স্ত্রী একই পথের পথিক। মুর্শিদ কেবলা পর্দা ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলাদের মুরীদ করতেন ও তালীম-তাওয়াজ্জোহ্ দিতেন।

১০। ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হয় না, উকিলের ছেলে উকিল হয় না, মুসলমানের সন্তান মুসলমান হয় না, পীরের ছেলে পীর হয় না। হ্যাঁ, যদি উক্ত গুণ অর্জণ করেন তবে নিশ্চয়ই উক্ত পদমর্যাদা লাভ করবেন।

১১। মুর্শিদ কেবলা মুসমানিত্বের মাপকাঠি উপস্থাপন করেন ঃ

ক) হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আবেদন করা হলো, মুসলমান কে? উত্তরে তিনি বললেন– "প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"– বুখারী শরীফ।

বুঝা গেল, যার হাতের কার্যের দ্বারা ও জিহ্বার কথার দ্বারা অন্য মুসলমানের ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার ক্ষতি না হয়, সেই প্রকৃত মুসলমান।

খ) কোরআন মজীদের ৩৯ঃ২২-২৩, ৫ঃ৮৩ আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, কোরআন শরীফ পাঠ করলে বা শুনলে এবং আল্লাহ্‌র জিকিরে যার চর্ম কম্পিত না হয় এবং আল্লাহ্‌র ভয় ও মহব্বতে হৃদয় বিগলিত হয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত না হয় সে প্রকৃত মুসলমান নহে।

১২। কোরআন মজীদের ৯ঃ১১৯ ও ৫ঃ৩৫ আয়াতের আলোকে প্রমাণ করেছেন– "কামেল পীরের সঙ্গ লাভ করা এবং মারেফাত হাছিল করার জন্য পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ।" পীরের আবশ্যকতার বিশেষ কারণগুলো নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন–

ক) আল-কোরআনের ২৬ঃ৮৯ আয়াত অনুযায়ী নফছের এছলাহ্ সাধন পূর্বক ক্বলবে-ছালিম (সুস্থ ক্বলব) অর্জণ করা।

খ) আল-কোরআনের ১২ঃ১০৮ ও ১৭ঃ৭২ আয়াত অনুযায়ী বাছিরাত (অন্তর দৃষ্টি) হাছেল করা।

গ) আল্লাহ্-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ক্বলব থেকে শয়তান তাড়ানোর জন্য পীররূপ সেনাপতির অধীনে থেকে শয়তানের সাথে আজীবন যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য।

ঘ) কামেল মুসলমান হওয়ার জন্য পীরের ক্বলব থেকে ঈমানের পুষ্ট বীজ গ্রহণ করা কর্তব্য।

চ) সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণ জিকির করা ফরজ। এর জন্য কামেল পীরের তাওয়াজ্জোহ্ দ্বারা লতিফাতে জিকির জারী করা অবশ্য কর্তব্য।

ছ) অনেক লোকের মৃত্যুর সময় জবান বন্ধ হয়ে যায়, তখন জিহ্বাযোগে জিকির করা যায় না। এছাড়াও সেই কঠিন সময় শয়তান ঈমান নষ্ট করার জন্য ওয়াছওয়াছা দিতে থাকে। পীরের অছিলায় যাদের ক্বলব ও সমস্ত শরীরে জিকির জারী থাকে, তারা কলবযোগে জিকির করতে করতে ঈমানের সাথে পরম বন্ধু আল্লাহ্‌র কাছে চলে যান। আর কলবে জিকির জারী থাকায় শয়তানও ধোঁকা দিতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি নামের মুসলমানকে কামেল মুসলমান হওয়ার জন্য কামেল মোকাম্মেল পীরের নিকট বায়াত হওয়া একান্ত প্রয়োজন (ফরজ)।

এমনিভাবে তার সংস্কার কার্যাদির যথাযথ বর্ণনা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাঁর বিভিন্ন কিতাবাদিতে প্রকাশ করেছেন।

আমার মুর্শিদ কেবলা ১৯৩৮ সনের ৭ই মার্চ খেলাফত লাভ করার পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহর পথে ডেকে ২০০1 ইং সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি রোজ সোমবার আমাদেরকে ইয়াতীম করে তিনি রফিকুল-আ'লা পরম

বন্ধু আল্লাহ্‌র কাছে চলে গেলেন। ছদকায়ে জারীয়া হিসাবে রেখে যান মুহাম্মাদীয়া তরীকা, ঢাকা-ভোলা-রাজশাহীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুরীদগণের মাধ্যমে অনেকগুলো খানকাহ্, বিভিন্ন স্থানে মাহফিল, হালকায়ে জিকির, আল্লাহ তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ ৩০ খানা কিতাব, মাদ্রাসা, মসজিদ বিশেষভাবে ৫৭ জন পুরুষ ও ৩১ জন মহিলাকে খেলাফত দান করে যান।

গদ্দিনশীন পীর সাহেব

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"অধিক মুত্তাকীই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন।"–কোরআন (৪৯ঃ১৩)। মুর্শিদ কেবলা আল্লাহ্‌পাকের পছন্দে ও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘোষণায় তিরোধানের পূর্বে হযরত কুতুবুল এরশাদ মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃআঃ)-কে তাঁর এ সফল জীবনের সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গদ্দিনশীন করে যান। হুজুর কেবলার খেলাফত প্রাপ্ত ৬ জন পুত্রের মধ্যে তিনি হলেন পঞ্চম। তিনি যে যথাযথ গদ্দিনশীন তা নিম্নের আলোচনায়ই স্পষ্ট–

(চয়ন- মুর্শিদ কেবলার লিখিত "যে শুধু আল্লাহকে চায় তার অনুসরণ কর" পৃষ্ঠা- ২ ও ৪)।

আমার মুর্শিদ কেবলা লিখেছেন– **"আমার ছেলে অদুদুর রহমানকে সূফী খেতাব ও গদ্দিনশীন হওয়ার বিবরণ" ঃ**

"মদিনা শরীফে বসবাসরত আমার খলিফা ডাঃ আকরামুল ইসলামের স্ত্রী শামসুন নাহার আমাকে জানান, '১৯৯৯ ইং সনের ২৩শে জানুয়ারী শুক্রবার হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওজাপাক জিয়ারতের জন্য গিয়ে প্রথমে আমার মুর্শিদ কেবলার সালাম নবীজিকে দিলাম। ইহার পর আপনার সাহেবজাদা মৌলভী অদুদুর রহমান ভাইজানের সালাম নবীজিকে দেই এবং অন্যান্য সকল পীরসাহেবজাদা ও সকল পীরভাইদের সালামও দিলাম, তিনি সকলের সালাম গ্রহণ করতঃ বললেন, 'সূফী হাবিবুর রহমান কুতুবুল এরশাদকে এবং বিশেষভাবে তাঁর ছেলে সূফী অদুদুর রহমানকে আমার সালাম পৌঁছাইও।' এইরূপভাবে পর পর তিন শুক্রবারই ঐরূপ সালাম পৌঁছাই এবং নবীজি উত্তরে বলেন– 'সূফী হাবিবুর রহমান কুতুবুল এরশাদকে, বিশেষভাবে তার ছেলে সূফী অদুদুর রহমানকে আমার সালাম পৌঁছাইও।"

০৬/০৬/১৯৯৯ ইং তারিখ দিবাগত সোমবার রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার ছেলে অদুদুর রহমানকে আমিও সূফী খেতাব দিলাম এবং স্বপ্নে আমি এও দেখলাম যে তার নফছে মুতমাইন্না হাসেল হয়েছে।

উক্ত স্বপ্ন অনুযায়ী আমি তাকে সূফী খেতাব দান করলাম এবং আল্লাহপাক তাকে নফসে মুতমাইন্নার দরজায় উন্নীত করেছেন এটা আমি বিশ্বাস করলাম। আমি দোয়া করি যে, অদুদুর রহমান যেন উক্ত দরজায় কায়েম থাকতে পারে। আমিন!”

মদিনা প্রবাসী আমার খলিফা শামসুন নাহার পত্রযোগে তার একটি কাশফের বিষয়ে নিম্নরূপ জানায়– “১১ই রবিউল আউয়াল, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে তাহাজ্জুদের পর জিকির করার সময় কাশফে দেখি, হুজুরপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমার মুর্শিদ কেবলা, হযরত জীবরাঈল (আঃ), হযরত বড় পীর সাহেব ও হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) সবাই রওজাপাকে বসা আছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ইশারা করে বললেন যে, সূফী অদুদুর রহমান সাহেবকে মুহাম্মাদীয়া তরীকার একমাত্র প্রধান ধারক ও বাহক হিসাবে অর্থাৎ গদ্দীনশীন হিসাবে আল্লাহপাক পছন্দ করেছেন। মাওলানা নূর মোহাম্মদ সাহেবকে সূফী অদুদুর রহমান সাহেবের বিশিষ্ট খাদেম ও পরামর্শদাতা হিসাবে আল্লাহপাক গ্রহণ করেছেন। শমসের আলী সাহেবকে মাজারের খাদেম হিসাবেও আল্লাহপাক পছন্দ করেছেন। আমি প্রশ্ন করি হুজুর, মুর্শিদ কেবলার সুযোগ্য আরও অনেক মুরীদান আছেন, ওনাদেরকে তো জানাতে পারতেন! উত্তরে তিনি বলেন যে, দ্বীনের প্রচারকেন্দ্র হিসাবে যেহেতু মদিনা শরীফের গুরুত্ব অপরিসীম, আর যেহেতু তোমরা ব্যতীত তোমার মুর্শিদের আর কোন মুরীদ মদিনা শরীফে নেই, তাই তোমাকে জানাবার জন্য আল্লাহপাক কর্তৃক আমি আদিষ্ট হয়েছি।”

এ ঘটনায় স্পষ্ট হলো যে, পছন্দ করলেন মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা আর ঘোষণা দিলেন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এর চেয়ে আর কি সু-খবর হতে পারে, প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা।

তিনিই (সুফী অদুদুর রহমান ছাহেব) হযরত মুর্শিদ কেবলার প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে মুহাম্মাদীয়া তরীকার খেদমত আনজাম দিয়ে আসছেন। আসুন আমরা মুহাম্মাদীয়া তরীকার ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি লাভে এবং পরম বন্ধু আল্লাহ্ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মহব্বত অর্জন করার সাধনায় অগ্রণী হই।

মুহাম্মদীয়া তরীকার বিবরণ ও সাধনা পদ্ধতি

“লুকানো মানিক” কিতাব হতে সংকলিত (পৃষ্ঠা- ৩৮৮ হতে ৩৯৩)

মুহাম্মদীয়া তরীকার বিবরণ ঃ

আমাদের হযরত মুর্শিদ কেবলা কুতুবুল এরশাদ তথা সমসাময়িক যুগের ইমাম ও মোজাদ্দেদ ছিলেন। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে যে জিকির শিক্ষা দিয়েছেন তা তিনি চিশতীয়া, কাদ্‌রীয়া, নক্‌শবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া

তরীকা চতুষ্টয়ের সংমিশ্রনের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন পূর্বক 'মুহাম্মদীয়া তরীকা' রূপে প্রবর্তন করেছেন। উক্ত মুহাম্মদীয়া তরীকার মকবুলিয়াত ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বহুবিধ সুসংবাদ (স্বপ্ন, কাশ্‌ফ, ইল্‌হাম ও অলৌকিক ঘটনা) পাওয়া গিয়েছে। হযরত মুর্শিদ কেবলা বলেছেন, যারা আমার প্রবর্তিত এই মুহাম্মদীয়া তরীকা গ্রহণ করবেন, তারা যার মাধ্যমেই উক্ত তরীকা গ্রহণ করে থাকেন না কেন, তারা সকলে আমারই মুরীদ। হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) তাঁর ২৬০ নং মাকতুবে "কুতুবুল এরশাদ" তথা তরীকা প্রবর্তনকারী বিশিষ্ট 'ইমাম'-এর বর্ণনায় বলেছেন– "তাঁর (কুতুবুল এরশাদ) হেদায়াতের নূর তাঁর মুরীদগণের মধ্যে বিনা মাধ্যমে হোক বা এক মধ্যস্থতায় কিংবা বহু মধ্যস্থতায় হোক, ঐ পর্যন্ত পরিচালিত থাকবে যে পর্যন্ত তাঁর বিশিষ্ট তরীকা বিকৃতি ও পরিবর্তনের কালিমা দ্বারা কলুষিত না হয় এবং বিদ'আত বা নতুন কার্যাদি সংযোগ করতঃ এটাকে বিনষ্ট করা না হয়। আল্লাহ্‌পাক ফরমিয়েছেন 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক কোন সম্প্রদায়ের প্রতি যা (নিয়ামত) দান করেছেন তা পরিবর্তন করেন না, যে-পর্যন্ত তারা স্বীয় ব্যবহারে তা পরিবর্তন না করে।"– কোরআন (১৩ঃ১১)

মুহাম্মদীয়া তরীকার লতিফা সমূহ ঃ

(ক) মুহাম্মদীয়া তরীকার লতিফাসমূহের মাকাম ও পরিচয় ঃ

১) কলব লতিফা ঃ এর মাকাম (স্থান) বাম দুধের বোঁটার দুই আঙ্গুল নিচে। হযরত আদম (আঃ)-এর কদম মোবারক হতে (অর্থাৎ তাঁর উছিলায়) এতে "তওবা"র ফায়েজ আসে।

২) রুহ লতিফা ঃ এর স্থান ডান দুধের দুই আঙ্গুল নিচে। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও নুহ (আঃ)-দের কদম মোবারক হতে এতে "এনাবাত"র (দুনিয়া হতে মন উঠিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে মন ফেরানোর) ফায়েজ আসে।

৩) ছের লতিফা ঃ এর স্থান বাম দুধের দুই আঙ্গুল উপরে। হযরত মূসা (আঃ)-এর কদম মোবারক হতে এতে "জোহদ"র (অপ্রয়োজনীয় বস্তুর কামনা-বাসনা ত্যাগের) ফায়েজ আসে।

৪) খফি লতিফা ঃ এর স্থান ডান দুধের দুই আঙ্গুল উপরে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর কদম মোবারক হতে এতে "অরা"র (অনর্থক কাজ কর্মের ও কথা হতে) আত্ম-সংযমের ফায়েজ আসে।

৫) আখফা লতিফা ঃ বক্ষস্থলের মধ্যভাগ বুক কড়া বরাবর। হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কদম মোবারক হতে এতে "শোকর" এর ফায়েজ আসে।

৬) নফস লতিফা ঃ কপালের মধ্যভাগ সেজদার স্থানে অবস্থিত। আল্লাহ্‌র রহমতে এতে "তাওয়াক্কুলের" ফায়েজ আসে।

৭) আব, ৮) আতশ, ৯) খাক, ১০) বাদ- এই চারটি লতিফা মাথা হতে পায়ের তালু পর্যন্ত সমস্ত শরীরে অবস্থিত। আবে-"কেনায়েত" (অল্প তুষ্টি), আতশে- "তছলিম" (আত্মসমর্পণ), খাকে- "রেদা" (আল্লাহর বিধান ও তকদীরে সন্তুষ্ট থাকা) এবং বাদে- "ছবর" (ধৈর্য্য)-এর ফায়েজ আসে।

(খ) মুহাম্মদীয়া তরীকার অজিফা ঃ

১) ছওয়াব রেছানী ঃ

(ক) দরূদ শরীফ– ১১ বার, (খ) আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইউম ওয়া আতুবু ইলাইহি- ৩ বার (৩) সূরা এখলাস ১০ বার (ঘ) সূরা ফাতেহা-
৩ বার।

এ সমস্ত পড়ে প্রতিদিন ফজর ও মাগরিব নামায পড়ার পর হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সমস্ত আম্বিয়া, আওলিয়া, নিজের মাতা-পিতা ও সমস্ত মুসলমানগণের আরওয়াহ্ পাকের উপর ছওয়াব রেছানী করবেন, মোনাজাত করে বক্শিয়ে দিবেন।

২) ফজরের নামাজের পরের অজিফা ঃ

ছওয়াব রেছানী করে নিম্ন লিখিত "খতমে মুহাম্মদীয়া" পড়বেন–

(ক) এই দরূদ শরীফ ১০০ বার পড়বেন (কলবে নিয়াত করে)।

"আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ছাইয়িদিল্ মুরছালিনা ওয়া আলা মুহ্ই সুন্নাতিহিশ শাইখি কুতুবুল এরশাদ সূফী হাবিবুর রহমান ইমামুত্ তরীকতি ওয়াল আউলিয়াইল্ কামিলীনা রাদি আল্লাহু তায়ালা আন্হু।"

দরূদ শরীফের নিয়াত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জো আছি, আমার কলব হযরত পীর সাহেব কেবলার অছিলায় হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জো আছে, তাঁর কলব হতে দোয়া, তাওয়াজ্জোহ, মহব্বত, দরূদ শরীফ ও জিয়ারতের ফায়েজ আমার কলবে আসুক, ইয়া আল্লাহ্।"

(খ) এর পর কলব, রুহ, ছের, খফি, আখফা লতিফাসমূহের প্রত্যেকটিতে ১০০ বার করে "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্" মোট ৫০০ বার পড়বেন। এটা পড়ার পূর্বে এইরূপ নিয়ত করবেন– আমি আমার কলব, রুহ, ছের, খফি ও আখফা এই পাঁচ লতিফার দিকে মোতাওয়াজ্জো আছি, আমার উক্ত পাঁচ লতিফা আল্লাহু তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জো আছে, আল্লাহ্তা'য়ালার তরফ হতে উক্ত কলেমার কুওয়াতের ফায়েজ আমার উক্ত পাঁচ লতিফায় আসুক এবং উক্ত ফায়েজ দ্বারা আমার সঙ্গীয় জ্বীন শয়তানকে এবং ইবলিছকে ছিজ্জিনে আবদ্ধ করে রাখুন, ইয়া আল্লাহ্।

(গ) এর পর খতমে মোহাম্মদীয়ার দরূদ শরীফ "নফসে" নিয়ত করে ১০০ বার হতে ৩০০ বার পড়বেন।

(ঘ) এর পর "কলবে" ইছমে জাত 'আল্লাহু আল্লাহ্' জিকির ৩০০ বার হতে ৫০০ বার করবেন।

নিয়াত ঃ "আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জো আছি, আমার কলব হযরত পীর সাহেব কেবলার কলবের উছিলায় আল্লাহু তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জো আছে, তাঁর তরফ হতে 'আল্লাহু আল্লাহ' জিকির ও হাকিকাতে তওবার ফায়েজ আমার কলবে আসুক এবং আমার কলব মহব্বতের সহিত 'আল্লাহু আল্লাহ্' বলুক, ইয়া আল্লাহ্।" এইরূপ নিয়াত করে চক্ষু বন্ধ করে কলব হতে "আল্লাহ" শব্দ উঠাইয়া সামনের দিকে 'হু' বলবেন তৎপর 'আল্লাহ্' কলেমাকে কলবে ছাড়বেন। এইরূপ প্রত্যেক ৩৩ বার জিকির করে পাপ স্মরণ করতঃ অনুতপ্ত হৃদয়ে কেঁদে কেঁদে 'রাব্বানা জালামনা আনফুছানা ওয়া ইল্লাম তাগ ফিরলানা ওয়াতারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাছিরীন।" গুনাহ মাফের এই আয়াত ও দোয়া মনে মনে পড়বেন।

(ঙ) মুরীদ যদি আলেম হন তবে এর পর প্রত্যেহ এক পারা বা সাধ্যানুযায়ী কম-বেশি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবেন।

৩) মাগরিবের নামাজের পরের অজিফা ঃ

(ক) ছওয়াব রেছানী পূর্বের ন্যায় করবেন: (খ) 'আল্লাহু আল্লাহ্' জিকির (জলি বা খফি) ১০০ বার করবেন; (গ) কলেমা তৈয়্যেবার নফি এছবাত জিকির ১০০ হতে ৩০০ বার করবেন।

নিয়াত ঃ "আমি আমার ছয় লতিফার তরফ মোতাওয়াজ্জো আছি। আমার ছয় লতিফা হযরত পীর সাহেব কেবলার ছয় লতিফার উছিলায় আল্লাহ্পাকের দিকে মোতাওয়াজ্জো আছে, তাঁর তরফ হতে নফি এছবাত জিকিরের ফায়েজ চিশতীয়া, কাদরীয়া, নকশবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া ও মোহাম্মদীয়া তরীকার নিছবাত অনুযায়ী আমার ছয় লতিফাতে আসুক, ইয়া আল্লাহ্।" উক্তরূপ নিয়ত করে নামাজের বৈঠকের ন্যায় উপবেশনপূর্বক চক্ষুদ্বয়কে বন্ধ করতঃ জিহ্বাকে তালুর সাথে সংলগ্ন করে ও নিঃশ্বাসকে নাভীস্থলে বন্ধ করতঃ জিহ্বার দ্বারা করবেন। নাভী হতে 'লা' শব্দকে খেয়ালের দ্বারা বের করে আখফার (বুক কড়ার) উপর দিয়ে নফস (কপাল) পর্যন্ত পৌঁছাবেন। তৎপর নফস হতে 'ইলাহা' শব্দকে খফির উপর দিয়ে রুহ পর্যন্ত পৌঁছাবেন। অবশেষে 'ইল্লাল্লাহ্' শব্দকে রুহ হতে কলবের উপর এইরূপ আঘাত করবেন যেন 'ইল্লাল্লাহের' 'হে' শব্দ ছের লতিফা পর্যন্ত পৌঁছে। প্রকাশ থাকে যে, কারও যদি শ্বাস বন্ধ করে জিকির করতে অসুবিধা হয় বা শারিরীক ক্ষতির আশংকা থাকে, তা হলে শ্বাস বন্ধ না করেও এই জিকির করতে পারবেন। এইরূপে বিজোড় সংখ্যা বা ৩৩ বার এই জিকির করার পর একবার 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' বলবেন।

৪) এশার নামাজের পরের অজিফা ঃ

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়ি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম" এই দরূদ শরীফ ১০০ বার হতে ৫০০ বার পর্যন্ত পড়বেন।

৫) পাছ-আনফাছ জিকির ঃ

খেয়ালের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে জিকির করাকে পাছ-আনফাছ জিকির বলে।

(ক) "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমার পাছ-আনফাছ ঃ শ্বাস ত্যাগ কালে খেয়ালের দ্বারা বললেন– "লা-ইলাহা' এবং শ্বাস গ্রহণকালে খেয়ালের দ্বারা "ইল্লাল্লাহ' বলবেন; এই জিকির জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করতে হয় না। চলতে ফিরতে সর্বক্ষণ এই জিকির করবেন।

(খ) এছমে জাত "আল্লাহু আল্লাহ্" জিকিরের পাছ-আনফাছ ঃ নিঃশ্বাস ত্যাগকালে খেয়ালের দ্বারা 'আল্লাহু' এবং শ্বাস গ্রহণকালে খেয়ালের দ্বারা 'আল্লাহ্' বলবেন। চলতে ফিরতে এমনকি প্রশ্রাব-পায়খানার সময়ও এই জিকির করবেন।

দশ লতিফার জিকির ঃ

দশ লতিফাতে ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে জিকিরের নিয়ত ও পদ্ধতি ঃ

(ক) কলব লতিফা ঃ এর নিয়াত ও জিকিরের পদ্ধতি পূর্বে বর্ণিত ফজরের অজিফার ২(ঘ)-এ বর্ণিত আছে।

(খ) রুহ লতিফা ঃ নিয়ত– "আমি আমার রুহ লতিফার দিকে মোতাওয়াজ্জো আছি, আমার রুহ হযরত পীর সাহেব কেবলার রুহ-এর উছিলায় আল্লাহু তায়ালারা দিকে মোতাওয়াজ্জো আছে। তাঁর তরফ হতে 'আল্লাহু আল্লাহ্' জিকির ও এনাবাতের ফায়েজ আমার রুহুতে আসুক ও আমার রুহ মহব্বতের সাথে 'আল্লাহু আল্লাহ্' বলুক, ইয়া আল্লাহ্!" এরূপ নিয়ত করে পূর্বে বর্ণিত কলবে জিকির করার ন্যায় এই "রুহ" লতিফায় "আল্লাহু আল্লাহ্" জিকির ৩০০ বার হতে ৫০০ বার করবেন।

(গ) ছের লতিফা ঃ নিয়ত পূর্বের ন্যায় করবেন, কেবল 'রুহ' এর স্থলে 'ছের' এবং 'এনাবাতের' স্থলে 'জোহদের ফায়েজ আমার ছেরে আসুক' বলবেন। তারপর "ছের" লতিফায় "আল্লাহু-আল্লাহ্" জিকির ৩০০ বার হতে ৫০০ বার করবেন।

(ঘ) খফি লতিফা ঃ নিয়ত পূর্বের ন্যায় করবেন, শুধু 'রুহ' এর স্থলে 'খফি' এবং 'এনাবাতের' স্থলে 'অড়ার ফায়েজ আমার খফিতে আসুক' বলবেন। তারপর "খফি" লতিফায় "আল্লাহু-আল্লাহ্" জিকির ৩০০ বার হতে ৫০০ বার করবেন।

(ঙ) আখফা লতিফা ঃ নিয়ত পূর্বের ন্যায় করবেন 'রুহ' এর স্থলে 'আখফা' এবং 'এনাবাতের' স্থলে 'শোকরের ফায়েজ আমার আখফাতে আসুক' বলবেন। তারপর "আখফা" লতিফায় "আল্লাহু-আল্লাহ্" জিকির ৩০০ বার হতে ৫০০ বার করবেন।

(চ) নফস লতিফা ঃ নিয়ত পূর্বের ন্যায় করবেন। 'রুহ' এর স্থলে 'নফস' এবং 'এনাবাতের' স্থলে 'তাওয়াক্কুলের ফায়েজ আমার নফসে আসুক' বলবেন। তারপর "নফস্" লতিফায় "আল্লাহু-আল্লাহ্" জিকির ৩০০ বার হতে ৫০০ বার করবেন।

(ছ) আব লতিফা ঃ নিয়ত পূর্বের ন্যায় করবেন। 'রুহ' এর স্থলে 'আব' এবং 'এনাবাতের' স্থলে 'কেনায়েতের ফায়েজ আমার সর্বশরীরের আবে আসুক' বলবেন। তারপর "আব" লতিফায় "আল্লাহু-আল্লাহ্" জিকির ৩০০ বার হতে ৫০০ বার করবেন।

(জ) আঁতশ লতিফা ঃ নিয়ত পূর্বের ন্যায় করবেন। কেবল 'রুহ' এর স্থলে 'আতশ' এবং 'এনাবাতের' স্থলে 'তসলিমের ফায়েজ আমার সর্ব শরীরের আতশে আসুক' বলবেন। তারপর "আঁতশ" লতিফায় "আল্লাহু-আল্লাহ্" জিকির ৩০০ বার হতে ৫০০ বার করবেন।

(ঝ) খাক্ লতিফা ঃ নিয়ত পূর্বের ন্যায় করবেন। কেবল 'রুহ' এর স্থলে 'খাক' এবং 'এনাবাতের' স্থলে 'রেদার ফায়েজ আমার সর্ব শরীরের খাকে আসুক' বলবেন। তারপর "খাক" লতিফায় "আল্লাহু-আল্লাহ্" জিকির ৩০০ বার হতে ৫০০ বার করবেন।

(ঞ) বাদ লতিফা ঃ নিয়াত পূর্বের ন্যায় করবেন, 'রুহ' এর স্থলে 'বাদ' এবং 'এনাবাতের' স্থলে 'ছবরের ফায়েজ আমার সর্ব শরীরের বাদে আসুক' বলবেন। তারপর "বাদ" লতিফায় "আল্লাহু-আল্লাহ্" জিকির ৩০০ বার হতে ৫০০ বার করবেন।

দশ লতিফার জিকির জারি হলে একত্রে "ছয় লতিফা" ও "সুলতানুল আজকার" অর্থাৎ জিকিরের বাদশাহ্ এ ছবক আদায় করবেন। এটা শরীরস্থ মাটি, পানি, অগ্নি, বায়ু এমনকি শরীরের অণু-পরামাণু পর্যন্ত আল্লাহ্র জিকির করে থাকে। নফি এছবাত ও সুলতানুল আজকার চিরজীবন করতে হবে। এরপর মুহাম্মাদীয়া তরীকার ২৪ দায়েরা বেলায়েতে ছোগরার ২০টি মোরাকাবা, বেলায়েতে কোবরা, কামালাতে নবুওয়াত, রেছালাত, হাকিকাতে ঈছাবী, মূছাবী, ইব্রাহীমী, হাকিকাতে মুহাম্মাদী, আহমাদী, হাকিকাতে কাবা, কোরআন, ছালাত, ছওম, মোকামে সিরাজুম্মুনিরা, মাকামে মাহমুদা, নেছবাত, কোরআন শরীফের ১১৪টি সূরার ১১৪টি মোরাকাবা এবং সর্বশেষ আমরণ "ওয়াসিল মায়াল্লাহ্" এর মোরাকাবা করতে হবে।

সর্বসমেত মুহাম্মাদীয়া তরীকার ২২৩টি ছবক রয়েছে। এসকল ছবকগুলো আদায় করে কামেল পীরের তাওয়াজ্জোহের মাধ্যমে পরম বন্ধু মহান আল্লাহ্, নবী রাসূলগণ, আওলীয়ায়ে কেরামগণের সাথে নেছবাত (আধ্যাতিক সম্পর্ক) ও মহব্বত কায়েম করুন। পরম বন্ধু আল্লাহ্তা'য়ালার কাছে ঈমান ও তাঁর মহব্বতের সাথে হাজির হওয়ার তওফিক লাভের চেষ্টা করুন। (এ সকল বিষয় বিস্তারিত জানান জন্য পড়ুন আমার মুর্শিদ কেবলার লিখিত কিতাব– মোসলমানী জিন্দীগী ও আল্লাহ্ প্রাপ্তির সোজা পথ)।

বিদায় হজ্জে রাসূলূল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম) এর বাণী

উদ্বৃতি ঃ বিশ্ব-রহমত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

বিদায় হজ্জ উপলক্ষে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মিনা ও আরাফাত প্রান্তরে যে বাণীগুলি ঘোষণা করেছিলেন তাহা বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থ হইতে লইয়া এই স্থানে একত্রে সন্নিবেশিত করা হইল ঃ

দশম হিজরীর জিলকদ্ মাসের ২৫শে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁহার স্ত্রীগণকে ও প্রায় ২ লক্ষ শিষ্যবৃন্দকে লইয়া হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে যাত্রা করিলেন। একত্ব ও সাম্যের কী মহান দৃশ্য। আজ ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র, বাদশা-গোলামে কোন প্রভেদ নাই। সকলেই একখন্ড সাদা চাদর ও একখানা সাদা তহবন্দ পরিধান করিয়াছে। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হইতে আরম্ভ করিয়া একটি দরিদ্রতম ক্রীতদাস পর্যন্ত, সকলের আজ এই একই পরিচ্ছদ। সকলেই নগ্নপদ, নগ্নমস্তক, সকলের মুখে একই 'লাব্বায়েক' ধ্বনি। জিলহজ্জের পাঁচ তারিখে মক্কাতে পৌঁছিয়া কাবা ঘরকে দেখামাত্রই হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলিলেন– "হে আল্লাহ্! এই ঘরকে চির কল্যাণময় কর এবং যাহারাই এখানে হজ্জ করিতে আসিবে তাহাদের সুখ-শান্তি ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করিও।"

অতঃপর মুসলিম জনসমুদ্র "লাব্বায়েক"–"উপস্থিত, হে প্রভু! উপস্থিত", ধ্বনিতে আকাশ, বাতাস মুখরিত করিয়া জিলহজ্জ মাসের ৯ই তারিখে সূর্য্য উদয়ের কিছুক্ষণ পরে আরাফাতের ময়দানে হাজির হইলেন। 'নামিরাহ্ নামক স্থানে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জন্য একটি তাবু খাটানো হইয়াছিল; তথায় তিনি অবস্থান করিলেন এবং দ্বিপ্রহরের কিছুক্ষণ পরে কোছওয়া নামক উষ্ট্রির পিঠে চড়িয়া আরাফাতের ময়দানের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া মিম্বারে দাঁড়াইয়া তিনি বিশাল জনসমুদ্রের সম্মুখে নিম্নলিখিত বাণী ঘোষণা করিলেন ঃ

"হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ! আমি আজ যে কথা তোমাদিগকে বলিব, তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিও এবং আজীবন মনে রাখিও; হয়ত তোমাদের সঙ্গে একত্রে হজ্জ করার সুযোগ আমার জীবনে আর ঘটিবে না,–'এলেম' উঠিয়া যাওয়ার পূর্বে আমার নিকট হইতে শিখিয়া লও।"

প্রত্যেক মুসলমানের রক্তবিন্দু, ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদাকে ঐরূপ মহান ও পবিত্র মনে করিয়া চলিবে, যেরূপ অদ্যকার এই হজ্জ দিবসকে, এই হজ্জের মাসকে ও মক্কা শরীফের হেরেমকে তোমরা মহান ও পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাক। এইগুলির পবিত্রতার হানি করা যেরূপ হারাম ও মহাপাপ, কোন মুসলমানের প্রাণের, ধনের ও সম্মানের ক্ষতি সাধন করাও সেইরূপ হারাম ও মহাপাপ।

হে মুসলিমগণ! বর্বর যুগের সমস্ত ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার, বে-ইনসাফী, বেপর্দেগী, জিনা-ব্যাভিচার, লুটতরাজ, অত্যাচার, শোষণ, সুদখোরী, ঘুসখোরী, পরের

দোষ চর্চা বা গিবত, বেহায়াপনা, মদ্যপান, নাচ-গান, বাদ্য, জুয়া, কুকুর পালা, ছবি তোলা, নাপাক থাকা, মানুষ হইয়া মানুষকে পূজা করা, মুর্তি বা দেব-দেবীর পূজা করা, নিজ সন্তানকে নিজে নষ্ট করা, পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি করা, মিথ্যা মকদ্দমা, মিথ্যা সাক্ষী, মিথ্যা মকদ্দমার সহায়তা করা, একজনের অপরাধে আর একজনকে শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি সর্বপ্রকার অনাচার ও অন্ধবিশ্বাস আমার পদতলে দলিত-মথিত অর্থাৎ রহিত ও বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিলাম। তোমরা ঐগুলি চিরতরে বর্জন করিয়া ইসলামের খাঁটি আলোকে পথ চলিতে শিখ। আমার স্বগোত্রের প্রাপ্য সমস্ত সুদ ও শোণিতের দাবী সর্বপ্রথম রহিত ও বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিলাম।

নারী জাতির ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিও। সাবধান! নারী জাতিকে উৎপীড়ন, খেলনা ও ভোগবিলাসের বস্তু বানাইও না। যদিও স্বামী আল্লাহ্‌র আইনে স্ত্রীর উপর অধিনায়ক এবং স্বামীর মর্তবা স্ত্রীর কাছে অনেক বড়, তবুও নারীর উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের উপরও নারীর তদ্রূপ অধিকার আছে। নারীর প্রতি অত্যাচার বা অবিচার করিও না। মনে রাখিও তোমরা আল্লাহ্‌র আমানত স্বরূপ তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ এবং আল্লাহ্‌র কালাম উচ্চারণ দ্বারাই তোমরা নারীর দেহের উপর দাম্পত্য-স্বত্ব লাভ করিয়াছ। নিশ্চয় জানিও তোমাদের হক তাহাদের উপর এই যে, তাহারা যেন তোমাদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও তোমাদের শয্যায় আসিতে না দেয়; তাহারা যেন পূর্ণভাবে তাহাদের সতীত্বকে রক্ষা করে। যদি তাহারা ইহার অন্যথা করে, তবে তোমরা তাহাদিগকে একাকী তোমাদের বিছানায় পরিত্যাগ করিতে পার অথবা তাহাদিগকে এতটুকু প্রহার করিতে পার যাহাতে তাহাদের শরীরে দাগ না পড়ে। আর তাহারা তাহাদের কতর্ব্য পালন করিলে, তোমাদের নিকট তাহারা রীতিমত খোরাক ও পোষাক পাওয়ার অধিকারিনী। ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিবে যে এই অবলাদিগকে একমাত্র বল্ তোমরাই, তাহারা নিজেদের সত্বাকে বিলীন করিয়া দিয়া তোমাদের অধিনস্থ হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তাহার পরিবারের সহিত ব্যবহারে উত্তম।

হালাল পেশায় এবং শ্রম করায় দোষ নাই। আশরাফ্-আত্‌রাফে ভেদাভেদ নাই। মানুষ বংশগত, বর্ণগত, দেশগত বা ভাষাগতভাবে কেউ কাহারো চেয়ে ছোট নয় বা বড় নয়। প্রত্যেক মুসলমানই প্রত্যেক মুসলমানের ভাই এবং আল্লাহ্‌পাকের চোখে সকলেই সমান। একমাত্র তাক্‌ওয়া ও চরিত্রগুণেই মানুষ বড় বা ছোট হয়।

সাবধান! কোন মানুষের উপর অত্যাচার করিও না। অত্যাচার করিও না! অত্যাচার করিও না! হুশিয়ার! কাহারো অসম্মাতিতে তাহার সামান্য মালও গ্রহণ করিও না। সর্বপ্রকার মলিনতা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিও। চিরদিন সত্যাশ্রয়ী হইও। কখনও শেরেক করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা বলিও না এবং অন্যায়ভাবে নরহত্যা করিও না।

হে মুসলিম জাতি হুশিয়ার! খবরদার! মুসলিম নেতার আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিও না, শৃঙ্খলা কখনও ভঙ্গ করিও না। যদি কোন নাক-কান কাটা হাবশী গোলামও তোমাদের আমীর নির্বাচিত বা নিযুক্ত হয় এবং সে যদি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে তোমাদিগকে পরিচালিত করে, তবে অবনত মস্তকে তাহার আদেশ মানিয়া চলিও; কিন্তু সাবধান! আল্লাহ্‌র কিতাবের বিরুদ্ধে আদেশ করিলে তখন আর সে নেতা থাকিবে না এবং তার আদেশও পালন করা যাইবে না।

আর তোমাদের দাস-দাসী, নিঃসহায় নিরাশ্রয় দাস-দাসী। তাহাদের সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করিও, তাহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিও না, তাদের মনে ব্যথা দিও না। তোমরা যাহা খাইবে এবং পড়িবে তাহাদিগকেও তাহাই খাওয়াইবে এবং পড়াইবে। ভুলিও না তাহারাও তোমাদের মতই মানুষ; আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে ধনী করিয়াছেন আর তাহাদিগকে গরীব করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকেও তাহাদের মত করিতে পারিতেন।

মনে রাখিও একদিন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হইতে হইবে এবং সেদিন কড়ায়-ক্রান্তিতে সারা জীবনের আমলের হিসাব সেই মহাবাদশার দরবারে দিতে হইবে ও সব বিষয়ের জবাবদিহি করিতে হইবে।

হে আমার উম্মতগণ! রীতিমত পাঁচ ওয়াক্তের নামায, রমজানের রোজা ও জাকাত আদায় করিও। এতদ্ব্যতীত হালাল, হারাম ও জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে যে সুন্দর ব্যবস্থা রাখিয়া গেলাম, তাহা চিরজীবন মানিয়া চলিও, উহার অন্যথা করিও না কারণ ইহাইেত নিহিত রহিয়াছে তোমাদের নাজাত ও বেহেশতে প্রবেশাধিকারের সনদ।

বংশের গৌরব করিও না এবং নিজ বংশকে হেয় মনে করিয়া অপর কোন বংশের নামে আত্মপরিচয় দিও না, কারণ ইহাতে আল্লাহ্‌র অভিশাপ নামিয়া আসে এবং ইহার দ্বারা নিজের মাকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার অপবাদ করা হয়,–ইহা মহাপাপ।

সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না। ধর্মের ব্যাপারে এই অতিরিক্ততার ফলেই তোমাদের পূর্ববর্তী বহুজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সর্ব ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম।

নিশ্চয় জানিও আমার পর আর কোন নবী আসিবে না, আমিই শেষ নবী, কুরআন শরীফই আল্লাহ্‌র শেষ কিতাব এবং আমার আনীত এই ইসলাম ধর্মই সর্বাঙ্গীন সুন্দর, সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ ও সর্বশেষ ধর্ম।

বন্ধুগণ! নিশ্চয় জানিও আমি যাহা তোমাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি তাহা যে পর্যন্ত তোমরা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকিবে, সে পর্যন্ত তোমাদের পথভ্রষ্টতা, পতন বা ধ্বংশ কিছুতেই কখনও আনিতে পারিবে না। সেই গচ্ছিত সম্পদ হইতেছে আল্লাহ্‌র কিতাব আমার সুন্নত বা জীবনাদর্শ।

যাহারা উপস্থিত আছ তাহারা অনুপস্থিত লোকদের নিকট আমার এই বাণী পৌঁছাইয়া দিও; হয়ত উপস্থিত ব্যক্তিগণের কতেক অপেক্ষা অনুপস্থিতদের কতেক লোক ইহার দ্বারা অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হইবে। ”

হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মুখমন্ডল ক্রমেই অধিকতর জ্যোতির্দীপ্ত হইয়য়া উঠিতে লাগিল। উর্ধ্ব আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনি আবেগভরে বলিতে লাগিলেন– “হে আল্লাহ্! হে আমার প্রভু! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছাইয়া দিতে পারিলাম? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিলাম? লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে নিনাদিত হইল, “নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!” হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কাতর কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন– “প্রভু হে শ্রবণ কর, সাক্ষী থাক, ইহারা বলিতেছে, আমার কর্তব্য আমি পালন করিয়াছি।” ভাবের আতিশয্যে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নীরব হইয়া রহিলেন। স্বর্গীয় জ্যোতিতে তাঁহার মুখমন্ডল উজ্জল হইয়া উঠিল। এই সময় আল্লাহ্পাক এই বাণী অবতীর্ণ করিলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

“আজ আমি তোমাদের ধর্মকে সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতসমূহ সমাপ্ত করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সত্য ধর্ম (জীবন-বিধান) বলিয়া মনোনীত করিলাম।”– কুরআন (৫ঃ৩)

হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আসহাব (রাঃ)-গণের দৈনিক কার্যের রুটিন

[উদ্বৃতি ঃ বিশ্ব রহমত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)]

হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর আসহাব (রাঃ)-গণের দৈনন্দিন জীবনের একটি নিখুত চিত্র আল্লাহ্পাক সূরা মোজাম্মেলে দিয়েছেন। উক্ত সূরা ও অন্যান্য সূরার মাধ্যমে নির্দেশ পেয়ে তাঁরা প্রত্যহ যে ১১টি কাজ করতেন তার একটি রুটিন নিম্নে প্রদত্ত হল। কামেল মুসলমান হওয়ার জন্য প্রত্যেকেরই তা সম্পাদন করা একান্ত কতর্ব্য।

আসহাব (রাঃ)-গণের উক্ত ১১টি কাজ

১। প্রত্যহ শেষরাত্রে উঠে তাঁরা তাহাজ্জোদ নামায ও কুরআন শরীফ এতটুকু পড়তেন যা সহজসাধ্য হয়, স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে এবং নিজেদের উপর কঠোরতা না চাপায়।

২। এরপর ফজরের নামায জামাতে আদায় করে তাঁরা জিকির-ফিকির মোরাকাবা-মোশাহিদায় লিপ্ত থাকতেন ও এশরাক পড়ে তৎপর হুজরা বা মসজিদ হতে বাইরে আসতেন।

৩। এরপর তাঁরা নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য দিনের বেলায় জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন হালাল পেশা অবলম্বন পূর্বক হালাল রুজি উপার্জন করার ফরজটিও আদায় করতেন, কিন্তু উক্ত কাজ করার সময়ও তাঁরা আল্লাহ্‌র জিকির (স্মরণ) হতে গাফেল থাকতেন না। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটু নিদ্রা যেতেন। মকতুবাত ১ম খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৪। পার্থিব ও আখেরাতের সর্বপ্রকার মাকসুদ হাসিলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-তদবীর করে ফলাফলের জন্য তাঁরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতেন।

৫। কেউ কটু কথা বা অসদ্ব্যবহার দ্বারা তাদের মনে কষ্ট দিলে তাঁরা প্রথম সদ্ব্যবহার দ্বারা তার সংশোধনের চেষ্টা করতেন, এতে সংশোধিত না হলে হেদায়েতের জন্য তাঁরা তাকে আল্লাহ্‌র হাতে ন্যস্ত করতেন।

৬। ধর্ম যুদ্ধের দরকার হলে তাঁরা কাফেরদের সাথে জেহাদ করতেন; কিন্তু পাশবিক স্তর হতে উন্নীত হয়ে আল্লাহ্‌র ছিফাত দ্বারা চরিত্র গঠন পূর্বক প্রকৃত মানবের স্তরে পৌঁছিয়া আল্লাহ্‌র খলিফার আসনে সমাসীন হওয়ার জন্য শয়তান ও তার বাহন নফছে আম্মারার সঙ্গে তাঁরা আজীবন সর্বক্ষণ জেহাদে-আকবরে লিপ্ত থাকতেন।

৭। পাঁচ ওয়াক্তের নামায তাঁরা জামাতের সাথে আদায় করতেন এবং নামাযে তাঁদের মে'রাজ লাভ হতো বলে এতে তাঁরা এইরূপ শান্তি পেতেন যা সসাগরা পৃথিবীর বাদশাহীতেও দিতে পারে না।

৮। তাঁদের মধ্যস্থ ধনীরা প্রতি বৎসর জাকাত দিতেন ও জীবনে একবার ফরজ হজ্জ্ব আদায় করতেন।

৯। ধনী-গরীব সকলেই জীব-সেবা অর্থাৎ গরীব-মিসকিনকে সাধ্যমত দান-খয়রাত, খানা-পিনা ও রুগীর সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি সৎকাজ করে তা পরকালের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌র ব্যাংকে জমা রাখতেন।

১০। তাঁরা সকলেই তাবলিগে খাস এবং হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কামেল ওয়ারিস আলেমগণ তাবলিগে আম (জনসাধারণের নিকট তাবলিগ) করতেন।

১১। সকল প্রকার উক্ত সৎকাজ করেও তাঁরা কখনও আত্মগরিমা করতেন না। বরং স্বীয় ভুল-ত্রুটির জন্য কাঁন্না-কাটি করে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতেন ও তাঁদের নগন্য এবাদত বন্দেগী কবুল হওয়ার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করতেন।

খাওয়ার ফরজ ও ওয়াজিবের বিবরণ

উদ্ধৃতি ঃ ইবাদত ও আমালিয়াত (সারমর্ম)

খাওয়ার মধ্যে ফরজ ০৬ (ছয়) টি। যথা–

১। আল্লাহ্পাকের ইবাদত করার নিয়তে জীবন বাঁচানোর জন্য খাওয়া। – কোরআন (২০ঃ৮১)

২। হারাম না হালাল খাদ্য তা জেনে হালাল খাদ্য খাওয়া।– কোরআন (২০ঃ৮১)

৩। যে প্রকারের খাদ্যই হউকনা কেন তা ছবর ও সন্তোষের সাথে খাওয়া।– কোরআন (৪৩ঃ৩২)

৪। খাওয়ার সময় আল্লাহ্পাকের করুণা উপলব্ধি করার জন্য চিন্তা করা।– কোরআন (৭ঃ৬৯)

৫। অতিরিক্ত খেয়ে এবং খাদ্যদ্রব্য অপচয় করে এসরাফ না করা।– কোরআন (৭ঃ৩১)

৬। খাওয়ার পর বাক্যের দ্বারা ও কার্যের দ্বারা আল্লাহ্পাকের নিয়ামতের শোকর করা।– কোরআন (২ঃ১৭২)

খাওয়ার মধ্যে ওয়াজিব ০১ (এক) টি। যথা–

১। খাওয়ার সামগ্রী সামনে আনা হলে এর মহত্ব স্মরণ করে নিজকে এর অনুপযুক্ত মনে করা।

আল্লাহ্ ০৮ (আট) টি অভ্যাস বড়ই ঘৃণা করেন

১। ধনীর কৃপণতা, ২। দরিদ্রের অহঙ্কার, ৩। রমণীর লজ্জাহীনতা, ৪। বৃদ্ধের ব্যভিচার ও সংসারাসক্তি, ৫। যুবকের অলসতা, ৬। রাজা-বাদশার অত্যাচার, ৭। সাধুর অহঙ্কার, ৮। নামাযীর লোক দেখানো নামায।

০৯ (নয়) প্রকার লোকের দোয়া কবুল হয়

১। মা-বাবার দোয়া, ২। মোসাফিরের দোয়া, ৩। অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া, ৪। হাজীর দোয়া (যে পর্যন্ত না ঘরে ফিরে আসে), ৫। জেহাদকারীর দোয়া, ৬। রোগীর দোয়া, ৭। সুবিচারক বাদশাহ্ ও হাকিমের দোয়া, ৮। রোজাদারের ইফতারের সময়ের দোয়া, ৯। এক ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে অন্য ভাইয়ের দোয়া।

দোয়া কবুল হওয়ার সময়

১। বৃষ্টি পরার সময়ের দোয়া, ২। আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া, ৩। শুক্রবারের দোয়া, ৪। তাহাজ্জুদ নামাযের সময়ের দোয়া।

লেখক পরিচিতি

নুর মোহাম্মদ শেখ বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার অন্তর্গত খালকুলিয়া গ্রামে ১৯৪৭ ইং সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম ক্বারী আবদুল গণি সাহেব এবং মাতা জহোরা খাতুন। তিনি মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জীবনে অধিকাংশ ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি শর্ষিণা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১৯৬৯ সালে এম.এম. (হাদীস) প্রথম বিভাগে পাশ করেন। এরপর বরিশাল বি.এম. কলেজ হতে বি.এ. (অনার্স)-এ ১৩তম স্থান এবং এম.এ. ডিগ্রীতে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ২০০৩ সালে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে বর্তমানে দেশের স্বনামধন্য রিয়েল এষ্টেট কোম্পানী দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ-এ কর্মরত আছেন।

চাকুরীর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মসজিদের খেদমত, রেডিও বাংলাদেশ (বাংলাদেশ বেতার)-এ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনে বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং আবুজর গিফারী কলেজেও (ঢাকা) কিছুদিন অধ্যাপনায় রত ছিলেন।

তরীকত জীবন

নুর মোহাম্মদ শেখ এর তৃতীয় শ্রেণী হতে মুনাজাত ছিল "আল্লাহ্ আমাকে ফুরফুরা মিলিয়ে দিও"। আল্লাহ্ মেহেরবান এ মুনাজাত কবুল করেছেন। ফুরফুরা শরীফের কুতুবুল আকতাব মোজাদ্দেদে জামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) এর খলিফা বাগেরহাট জেলার আমতলীর হযরত মাওলানা শাহ্সূফী আবদুল লতিফ সাহেব (রহঃ) ১৯৬৫ সালে নিজেই অধীর আগ্রহে বলেন– "আমি চাই তুমি আমার কাছে বয়াত হও"। তিনি পীর সাহেব কেবলার এ আদেশ পালন করেন। হুজুর হাতে হাত ধরে বয়াত করান। কিন্তু তাঁর নিকট থেকে সে রকম ছবক আদায়ের সুযোগ পান নাই। ১৯৭০ সালে হযরত পীর সাহেব জান্নাতবাসী হন।

পীরহারা ইয়াতীম হয়ে পাগলের মত হক্কানী পীরের সন্ধান করতে থাকেন। মহান আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী সন্ধান পেলেন কুতুবুল এরশাদ, কুতুবুল আলম, মোজাদ্দেদে জামান, মুহাম্মদীয়া তরীকার ইমাম হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)'র। প্রথম তাঁর সাথে স্বপ্নে দেখা হয়। পরে ১৯৭০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ভোলায় দারুল হাবিব খানকা শরীফে বয়াত হন। হযরত মুর্শিদ কেবলার নেক নজর ও তাওয়াজ্জোহ্র বরকতে চিশ্তীয়া, ক্বাদরিয়া, নক্শবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া ও মুহাম্মদীয়া তরীকার ছবক শেষ করেন এবং কোরআন শরীফের ১১৪ সূরার ছবক আদায় করেন।

হযরত কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) ১৩/০৪/১৯৭৪ ইং সনে লিখিত খিলাফত দান করেন এবং ০৩/০৭/২০১০ ইং তারিখে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বুকের সঙ্গে বুক মিলিয়ে

চেহারার সাথে চেহারা মিলিয়ে অনেকক্ষণ তাওয়াজ্জোহ্ দান করে বলেন– "ইহাই হাকিকী খেলাফত"। তাঁর মনে আল্লাহ উদয় করিয়ে দেন ইহাই "বাতেনী খেলাফত"। আমতলীর মরহুম হযরত পীর সাহেব কেবলা (রঃ) ইন্তেকালের পরে গত ০৬/০৭/১৯৭৪ইং তারিখে তাকে স্বপ্নযোগে খেলাফত দান করেন। উল্লেখ্য যে, হযরত কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) হতে খেলাফত প্রাপ্তির পর আমতলীর মরহুম পীর সাহেব কেবলা (রঃ) স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন– "আমিও তোমাকে খেলাফত দিলাম।"

হযরত কুতুবুল এরশাদের তিরোধানের পর গদ্দিনশীন পীর সাহেব কেবলা কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃ আঃ) এর খেদমতেও বয়াত হন। তাঁর দোয়া ও নজরের বরকতে অদ্যাবধি সাধ্যমত সেল্‌সেলার খেদমত আনজাম দিয়ে আসছেন।

লেখকের নিজ গ্রাম- খালকুলিয়ায় (বাগেরহাটে) মরহুম কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর নির্দেশে ও শুভাগমনে ১৯৭১ সাল হতে জিকির হালকা, মাসিক প্রোগ্রাম, বাৎসরিক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কুতুবুল এরশাদের রুহানী নজর, গদ্দিনশীন পীর সাহেব কেবলার প্রচেষ্টা এবং তার পীর ভাইদের সার্বিক যত্নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাগেরহাটে "দারুল হাবিব খানকা শরীফ"। তার মুনাজাত "মুর্শিদদ্বয়ের খাছ দোয়ার বরকতে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ এই খানকা শরীফ কায়েম রাখুন"। আমিন। তার স্ত্রী রওশন আরা আখি, চার মেয়ে- আছমা, ছালমা, হাফছা ও সাইয়্যেদা এবং দুই ছেলে- এ.কে.এম. আব্দুল্লাহ্ ও এ.বি.এম. ছিদ্দিকুল্লাহ্ এবং স্বজন ও বন্ধুদের জন্য দোয়া প্রার্থী। তিনি দোয়ার আবেদন করেছেন, যেন ঈমানের সাথে ভবনদী পার হয়ে পরম বন্ধু আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছতে পারেন। আমীন!

বিনীত
প্রকাশিকা

কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী

আমার মুর্শিদ (রাঃ) এর সকল গ্রন্থগুলির মৌলিক বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র আশেক বান্দাদের কাছে একটিমাত্র সর্বকালীন বার্তা পৌঁছে দেয়া, যা হচ্ছে– "আল্লাহ্-প্রেমের মাধ্যমে আল্লাহ্-প্রাপ্তি"। কুরআন ও হাদিস মন্থন করে এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যথাযথ অনুসরণপূর্বক এর জাহেরী ও বাতেনী সত্যতা উপলব্ধির মাধ্যমে তিনি এ পথ আবিষ্কার করেছেন। বাল্যকাল হতেই তাঁর সর্বপ্রকার কর্মকান্ড একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই নিবেদিত ছিল এবং তিনি তাঁর গ্রন্থগুলির মাধ্যমে কুরআন-হাদিসের মগজ বা সারমর্ম বিশ্বমানবকে উপহার দিয়েছেন। তিনি নিম্ন লিখিত ৩১ খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন–

নং	গ্রন্থের নাম	নং	গ্রন্থের নাম
০১	মোসলমানী জিন্দেগী (১ম খন্ড)	০২	মোসলমানী জিন্দেগী (২য় খন্ড)
০৩	হাকীকাত খনি	০৪	আল্লাহ্ প্রাপ্তির সোজাপথ
০৫	মারেফাত তত্ত্ব	০৬	বিশ্ব-রহমত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)
০৭	ইসলাম ও বিদয়াত	০৮	ইবাদাত ও আমালিয়াত
০৯	মুহাম্মদীয়া তরীকা, অছিয়তনামা ও আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী	১০	মুসলমানী জীবন
১১	ফেরেশতাদের তাসবীহ্ ও মোহাম্মদীয়া তরীকা	১২	মুসলমান না হইয়া মরিওনা
১৩	আলেমের ছদ্মবেশে শয়তানের খলিফা ও মোহাম্মদীয়া তরীকা	১৪	আশার বাণী
১৫	তকদির ও তদবির	১৬	আশেক ও মাশুকের মিলন (মুহাম্মদীয়া তরীকা)
১৭	পৃথিবীতে আল্লাহ দর্শন	১৮	আল্লাহ্‌র দিকে ডাক দিয়ে যাই
১৯	আল্লাহ্ ও তাহার খলিফা	২০	মোমিন হও আবার কর্তৃত্ব কর
২১	আদর্শ কুরআন পাঠ শিক্ষা	২২	হজ্জ দর্পন
২৩	সত্যপরায়ণদের সঙ্গ লাভ কর	২৪	সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার প্রেমের নির্দশন
২৫	যে শুধু আল্লাহকে চায়, তাহার অনুসরণ কর	২৬	সংবিধান
২৭	হাইয়াতুন্নবী	২৮	দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন
২৯	আল্লাহকে পাওয়ার সংক্ষিপ্ত আমল	৩০	আলেমের ছদ্মবেশে শয়তান
৩১	মুসলমানিত্বের মাপকাঠি		

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। "পবিত্র কুরআনুল কারীম"

২। "মেশকাত শরীফ"

৩। "হজ্জ দর্পন"- কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)

৪। "বিশ্ব রহমত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)" - কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)

৫। "আল্লাহ্ প্রাপ্তির সোজা পথ"- কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)

৬। "ইবাদাত ও আমালিয়াত"- কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)

৭। "লুকানো মানিক"- কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) এর আধ্যাত্মিক জীবন-চরিত

৮। "ভোলার পীর সূফী হাবিবুর রহমান সাহেবের উমরা সম্পাদন" - কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান

৯। "এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন"- ইমাম গাযযালী (রহঃ)

১০। "দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম" - ইসলামিক ফাউন্ডেশন

১১। "হজ্জ ও মাসায়েল"- হযরত মাওলানা আলহাজ্জ্ব আল-ক্বারী সাঈদ আহমদ, মুফতী-ই-আযম

১২। "হজ্জ উমরাহ্ ও যিয়ারতে মদীনা"- আলহাজ্জ্ব অধ্যক্ষ মাওলানা শামছুল হক

১৩। "ছবির সাহায্যে হজ্জ, ও উমরাহ্ ও যিয়ারত"- আলহাজ্জ্ব হাফেজ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ জাকারিয়া

১৪। "নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)"- অধ্যক্ষ হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলিল

১৫। নেয়ামুল কোরআন।